চলচ্চিত্রযাত্রা

তারেক মাসুদ

তারেক মাসুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন মাদ্রাসায় শুরু হলেও শেষাবধি তিনি হয়েছিলেন দেশবরেণ্য চলচ্চিত্রকার। তিনি বলেছিলেন, 'চলচ্চিত্রকার না হলে লেখক হওয়ার চেষ্টা করতাম।' তার মানে লেখালেখির প্রতি একটা টান তাঁর বরাবরই ছিল। গত ২৫ বছরে তিনি চলচ্চিত্রকেন্দ্রিক যেসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন তাতে চলচ্চিত্র ভাবনা, দেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের সংকট ও সম্ভাবনা এবং চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট তাঁর নানামুখী অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে; সঙ্গে রয়েছে তাঁর আত্মস্মৃতি। এই বই চলচ্চিত্রকর্মী তো বটেই, সব ধরনের পাঠককে আগ্রহী করে তুলবে।

তারেক মাসুদ

জন্ম ফরিদপুরে, ১৯৫৬ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়জীবন থেকেই তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সঙ্গে। চলচ্চিত্রকার হিসেবে ১৯৮২ সালে তাঁর উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *আদম সুরত*-এর মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত তাঁর প্রামাণ্যচিত্র *মুক্তির গান* তাঁকে এনে দেয় দেশজোড়া খ্যাতি। এরপর তিনি নির্মাণ করেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *মুক্তির কথা* (১৯৯৯); *নারীর কথা* (২০০০) ও *নরসুন্দর* (২০০৮)। তাঁর কাহিনিচিত্র *মাটির ময়না* (২০০২) কান চলচ্চিত্র উৎসবে অর্জন করে 'ক্রিটিকস প্রাইজ'। অস্কার চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণকারী এটিই প্রথম বাংলাদেশি চলচ্চিত্র। ২০১১ সালের ১৩ আগস্ট তাঁর নির্মীয়মাণ চলচ্চিত্র *কাগজের ফুল*-এর শুটিংয়ের কাজে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন; নিহত হন তাঁর ইউনিটের চলচ্চিত্রগ্রাহক গণমাধ্যমের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মিশুক মুনীরও। তারেক মাসুদ শর্ট ফিল্ম ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, দেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম পুরোধা।

প্রচ্ছদ : ঢালী আল মামুন

চলচ্চিত্রযাত্রা

তারেক মাসুদ

প্রথমা প্রকাশন

চলচ্চিত্রযাত্রা
গ্রন্থস্বত্ব © ক্যাথরিন মাসুদ
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১৮, ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ঢালী আল মামুন
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২৭৫ টাকা

Chalachchittrajatra
by Tareque Masud
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8110081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info
Price : Taka 275 Only

ISBN 978 984 33 3886 0

ভূমিকা

গত পাঁচ বছরের প্রতিবারই একুশে বইমেলার মাস কয়েক আগে থেকেই সিনেমার ওপর নিজের লেখাগুলো নিয়ে একটা সংকলন করার উদ্যোগ নিত তারেক। যেহেতু বছরের পর বছর সিনেমা নিয়ে সে বিস্তৃতভাবে লিখেছে, এবং যেহেতু পাণ্ডুলিপিগুলো অবিন্যস্ত আর পুরোনো লেখাগুলোর সফটকপি প্রায় প্রাচীন বাতিল ফন্টের, তাই কাজটা ছিল শ্রমসাপেক্ষ। সাধারণত তার একজন সহকারীর ঘাড়ে দায়িত্ব পড়ত ট্রাংক, আলমারি আর কম্পিউটারের পুরোনো হার্ড-ড্রাইভগুলো খুঁজে দেখার। এভাবে বেশ ভালোই অগ্রগতি হয়েছিল; এবং তার মৃত্যুর আগে আগে খোয়া না যাওয়া পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে একটা বড় আকারের ফাইলও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তারেকের ল্যাপটপের একটা ফোল্ডারে ওর লেখাগুলো ভাষা ও বিষয় অনুযায়ী সাজানো ছিল। যা হোক, তারেকের আয়ুসীমায় বইটি আর বের করা যায়নি। নানা ব্যস্ততা আর আগে থেকে ঠিক করে রাখা কাজের চাপে ফেব্রুয়ারি-ডেডলাইন সব সময়ই পার হয়ে যেত। ফাইল আর ফোল্ডারগুলো পরের বছরে সমাপ্য কাজ হিসেবে পড়ে থাকত।

তারেকের এই ইচ্ছার কারণেই ২০১১ সালের আগস্টের দুর্ঘটনার পর থেকে ওর লেখাগুলো নিয়ে বই প্রকাশ করা আমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমার আশা, কেবল তারেকের নিবন্ধগুলোই নয়, আস্তে আস্তে ওর চিত্রনাট্য, গান, সাক্ষাৎকার এবং ওকে নিয়ে অন্যদের লেখাগুলোও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। তারেকের লিখিত কাজগুলো, যেগুলো আগস্টের দুর্ভাগ্যজনক দিনটির কারণে বিয়োগান্তভাবে থমকে যায়, সেগুলো সংকলিত ও সম্পাদনা করে পাঠকসাধারণের জন্য সুলভ করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার সূচনা হিসেবে ধরা যেতে পারে এই প্রাথমিক সংকলনকে।

মূল কাজটা তারেক অনেক বিস্তৃত পরিসরে করে গেলেও

*চলচ্চিত্রযাত্রা*কে আলোর মুখ দেখাতে মাস কয়েক যাবৎ অনেক মানুষের সম্মিলিত আয়াসের দরকার পড়েছিল। যাঁরা এ কাজে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা এটা করেছেন একজন মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান জানানোর তাগিদ থেকে, যে মানুষটা আরও অনেককে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়ে গেছে। প্রথমত, আমি ধন্যবাদ দেব প্রসূন রহমানকে, যিনি সবার আগে এ প্রকল্পে যোগ দেন এবং এটা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অক্লান্তভাবে খেটে গেছেন। লেখাগুলো বাছাই, বিন্যাস ও প্রাথমিক সম্পাদনার প্রতিটি ধাপেই তিনি সাহায্য করেছেন। সহৃদয় প্রচেষ্টার জন্য আমি আরও ধন্যবাদ দেব একদল তরুণকে, যাদের অনেকেই আমাদের প্রযোজনার কাজে তারেকের সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। লেখাগুলো পুনর্মুদ্রণের আয়াসসাধ্য কাজটা যাঁরা করেছেন, তাঁরা হলেন : সাজ্জাদ রাব্বি, শাহাদাত হোসেন, সোহেল রহমান, তায়েব মাসুদ ও মাহমুদ হাসান। *প্রথম আলো*র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফকেও ধন্যবাদ, যিনি তারেকের জন্য একটা কিছু করার তাগিদ থেকে আপন উদ্যোগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রথমার পক্ষ থেকে বইটি সম্পাদনা করার জন্য আখতার হুসেন, এ কে এম জাকারিয়া ও জাফর আহমদ রাশেদকে এবং অনুবাদক হিসেবে কাজ করার জন্য তানিম হুমায়ুনকেও ধন্যবাদ। বইটির প্রচ্ছদ করে দেওয়ার জন্য শেষ ধন্যবাদটা দিই আমাদের প্রিয় বন্ধু এবং দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া সতীর্থ ঢালী আল মামুনকে।

চার খণ্ডে সমাপ্য তারেকের রচনাগুলোর প্রথম ভাগ *চলচ্চিত্রযাত্রা*র কাজ শেষ করতে পেরে গর্ব ও দুঃখের এক মিলিত অনুভূতি হচ্ছে। গর্ব এ কারণে যে গত কয়েক মাসের মানসিক যাতনার ভেতরও আমরা একটা দল হিসেবে কাজ করতে পেরেছি এবং সফলভাবে বইটি প্রকাশ করতে পেরেছি। আর কাজটা যে এভাবে করতে হচ্ছে সেটাই দুঃখের, যখন তারেক আমাদের পাশে নেই।

২

এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোকে তাদের বিষয় বা ভাবানুযায়ী বিন্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারেকের লেখালেখির বেশির ভাগই ঘটেছে নানা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে। সেসব উপলক্ষের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিকভাবে অন্যান্য বিষয় ও দৃষ্টান্তের অবতারণ করতে হয়েছে তাকে। এও লক্ষ করা যাবে যে, এই গ্রন্থভুক্ত কোনো কোনো নিবন্ধ বা প্রবন্ধে একই বিষয়ের

পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সামান্য হেরফের করে। সে ক্ষেত্রে সম্পাদনা করার সংগত সুযোগ থাকলেও আমরা সেটা করিনি তারেকের লেখাগুলোর অবিকৃত ভাষ্য উপস্থাপন করার তাগিদ থেকে। বুঝতে হবে, তারেকের লেখায় কোনো প্রসঙ্গের যে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, সেটা ঘটেছে বিষয়টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরার আন্তর তাগিদ থেকেই। তবে সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা কোনো কোনো রচনার কিছু বাহুল্য তারিখ বা কর্মসূচির ব্যাপারে খানিকটা সম্পাদনা করা হয়েছে। এ বইয়ে সংকলিত কোনো কোনো লেখার রচনাকাল দেওয়া গেল না।

ক্যাথরিন মাসুদ
২৮ জানুয়ারি ২০১২

সূচিপত্র

যেভাবে 'আদম সুরত'	১১
'মুক্তির গান'-এর গল্প	১৮
লিয়ার লেভিন : আমাদের মুক্তির সারথি	২৩
বিশ্বসভায় 'মাটির ময়না'	২৬
অন্তর্যাত্রা, বহির্যাত্রা : সিনেমা যখন সহযাত্রী	৪২
চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ৪০ বছর : গলা সাধা বনাম কান সাধা	৪৭
সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতি	৫১
তবে আমিও 'কুয়াশা' ছিলাম	৫৪
স্মৃতিতে অম্লান আলমগীর কবির	৫৮
'কর্ণফুলীর কান্না' : কাঠমান্ডু ও কাণ্ডজ্ঞান	৬৮
রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : সত্যজিৎ রায় এবং নারী	৭২
বিশ্ব চলচ্চিত্র : ভাষা ও মাধ্যমগত বিকাশের রেখাচিত্র	৮৯
সমকালীন চলচ্চিত্রের সংকট	৯৫
সত্যজিৎ ও রবীন্দ্রনাথ	১০১
মুক্তিযুদ্ধের ওপর বিদেশি নির্মাতাদের চলচ্চিত্র	১০৫
আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার	১০৮
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ	১১১
টেলিভিশন চ্যানেলের চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ : একটি পর্যালোচনা	১১৭
ডিজিটাল মাধ্যম ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র	১২৪
মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রের মুক্তিযুদ্ধ	১৩১

দুই বাংলার চলচ্চিত্র আদান-প্রদান ১৩৬
ভারত-বাংলাদেশ চলচ্চিত্র বিনিময় ১৪০
জাতির স্মৃতি সংরক্ষণের প্রশ্ন এবং জাতীয় চলচ্চিত্র আর্কাইভসের ২০ বছর ১৪৬
আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের চলচ্চিত্র ১৫৪
স্বপ্নের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রের স্বপ্ন ১৫৯
মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র : ব্যতিক্রম ও বিতর্ক ১৬৫
চলচ্চিত্রের চোখ : বাংলাদেশকে নতুন করে দেখার জন্য ১৬৯
রুপালি পর্দায় আশার রুপালি রেখা ১৭৩
আলোকচিত্র ৮১

যেভাবে 'আদম সুরত'

ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনার জন্য ১৯৮২ সালে আমি ভারতের পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে আবেদন করেছিলাম এবং স্কলারশিপও হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন ইউনিভার্সিটি থেকে সবে বেরোচ্ছি। মার্চের ২৪ তারিখে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর ভারতবিরোধী মনোভাব দেখানোর জন্য ভারতের সব স্কলারশিপ বাতিল করে দেন। ফলে আমার স্কলারশিপটাও চলে গেল। ওটাকে কীভাবে ফেরত আনা যায় সে জন্য চেষ্টা শুরু করি। এরশাদের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা নাট্যকার সাঈদ আহমেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁকে দিয়ে আমার স্কলারশিপটি ফিরিয়ে আনার পর পুনায় গিয়ে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পরিচালক কৃষ্ণমূর্তির কাছ থেকে 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেট আনলাম যে তারা আমাকে নেবে। কিন্তু এই ছোটাছুটিতে দেরি হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে তত দিনে সেশন শুরু হয়ে যায়। ফলে আমার আর যাওয়া হলো না। রাগে-দুঃখে তখন আমি পারিবারিকভাবেই অর্থ জোগাড় করে ফিল্মের ওপর পড়াশোনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করি।

এদিকে শিল্পী এস এম সুলতান তখন আমাদের মতো যুবকদের কাছে কিংবদন্তি। তার ওপর আহমদ ছফার একটি লেখা সুলতানের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। আমরা তখন বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কয়েকজন মিলে সুলতানের ওপর প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করার কথা ভাবছিলাম। যেমন—সাজেদুল আউয়াল, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু। আমরা যারা চলচ্চিত্রের বিকল্প ধারা নিয়ে ভাবছিলাম, তাদের কাছে মনে হয়েছিল, সুলতানের ওপর ছবি করাটা খুবই জরুরি। চিত্রগ্রাহক আনোয়ার হোসেন

সুলতানের প্রতি আমার এই আগ্রহের বিষয়টি জানতেন। আমি তখন বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভসের ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স শেষ করেছি। আনোয়ার ভাই আমাদের ক্যামেরার শিক্ষক ছিলেন। তিনি সব সময় উৎসাহ দিতেন ছবি বানানোর জন্য। আমি তাঁর জিগাতলার বাসায় গিয়ে পড়াশোনার জন্য আমার বিদেশে চলে যাওয়ার কথা জানালাম। তখন উনি বললেন, 'আজকের কাগজ দেখেছ?' আমি বললাম, 'না।' উনি আবার বললেন, '*ইত্তেফাক* খুলে দেখো। ব্যাক পেজে বড় করে নিউজ—শিল্পী সুলতান হাসপাতালে, ভীষণ অসুস্থ। মনে আছে, তুমি বলেছিলে সুলতানের ওপর ডকুমেন্টারি করবে। তুমি যদি এখন পড়তে বাইরে চলে যাও, ফিরে এসে দেখবে শিল্পী নেই। তোমার মনের মধ্যে কিন্তু একটা বিরাট আফসোস থেকে যাবে।' আমি আনোয়ার ভাইকে বললাম, 'আমি বাইরে যাওয়ার যাবতীয় কাজ সেরে ফেলেছি, আমি চলে যাব।' তারপর জিগাতলা বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। কাকতালীয়ভাবে বাসটি সেদিন আসতে অনেক সময় নিয়েছিল। বাসটা এত দেরি না করলে হয়তো মাথার মধ্যে এই উল্টো বুদ্ধিটা আসত না। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, বিদেশে যাব না, ওই টাকা দিয়েই সুলতানের ওপর ছবি বানানো শুরু করে দেব।

আমেরিকায় ফিল্ম নিয়ে পড়তে যাওয়ার জন্য যে অর্থ জোগাড় করেছিলাম, সেটা দিয়েই ছবির কাজ শুরু করে দিলাম। আমার মনে হয়েছিল, সুলতানকে নিয়ে ছবিটা বানালে একদিকে যেমন একজন বড় মাপের মানুষের ডকুমেন্টেশন হবে, ঠিক তেমনি ছবি বানাতে গিয়ে ছবি বানানোর শিক্ষাটাও হবে, স্বশিক্ষিত হওয়া যাবে। আমার উপলব্ধিতে বারবার মনে হয়েছিল, শিল্পী সুলতানের জীবনের প্রামাণ্যকরণ অনেক বেশি জরুরি।

তবে আমার অনভিজ্ঞতা ও অল্প বয়সের অপরিপক্কতার জন্য আমি যে শিক্ষাটা পেলাম, তা হচ্ছে ইচ্ছা ও চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবজগৎ অনেক ভিন্ন। আমি জোগাড় করতে পেরেছিলাম দেড় থেকে দুই লাখ টাকা। ভেবেছিলাম, ছবিটি সম্পন্ন করতে ওই অর্থই যথেষ্ট। কিন্তু যা করতে চেয়েছিলাম, তাতে ওই অর্থ দিয়ে তার সিকি ভাগও হয়নি। ফলে রীতিমতো ফেঁসে গেলাম। যেখানেই পেয়েছি ধার-দেনা করেছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশায় ছুটে বেড়িয়েছি। কারিগরি সাহায্য হিসেবে আমি ডিএফপি (ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম অ্যান্ড পাবলিকেশনস) থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। সেখানকার পরিচিত লোকজন ধরে কখনো কখনো ক্যামেরা ফ্রি পেয়েছি, এডিটিং করতে পেরেছি। কিন্তু এস এম

সুলতানের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জীবনকে সেলুলয়েডে ধরতে হলে শুধু এ ধরনের কারিগরি সমর্থনই যথেষ্ট নয়, অর্থও লাগে। যেমন, ছবির শুটিং করার জন্য পাকিস্তানে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ল। '৮৩ সালে আমি বাংলাদেশ বিমানের দুটো টিকিট ফ্রি পেয়েছিলাম। কিন্তু টিকিট ছাড়াও তো আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অনেক টাকা লাগে, সেটা আমাকে জোগাড় করতে হয়েছে। সেই সময় আমাদের বিখ্যাত চিত্রাগ্রহক আনোয়ার হোসেন ১০ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। মূলত তাঁরই ক্যামেরাম্যান হিসেবে ছবিতে কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু ওই সময়ে তিনি ইউনেসকোর স্টিল ফটোগ্রাফির একটা অ্যাসাইনমেন্টে আফ্রিকায় চলে গেলেন। ফলে সহকারী চিত্রগ্রাহক হিসেবে যাঁর কাজ করার কথা ছিল, সেই মিশুক মুনীর মূল দায়িত্ব পালন করলেন। শুটিং করতে গিয়ে যেটা দেখলাম, অর্থাৎ যে কষ্টকর ও বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে শুটিং করেছি, সেখানে আনোয়ার ভাইয়ের মতো একজন বায়োজ্যেষ্ঠ মানুষের পক্ষে কাজটি করা খুব সহজ হতো না। কারণ, আমার ও মিশুকের জন্য একরকম সাপ, ব্যাঙ, মুরগির বিষ্ঠা, পচা ক্যানভাস ইত্যাদির মধ্যে রাত যাপন করা হয়তো কোনো ব্যাপার ছিল না; কিন্তু আনোয়ার ভাইয়ের জন্য তা খুবই কষ্টকর হয়ে যেত। তা ছাড়া এস এম সুলতানের দুই ঘণ্টার ফুটেজের জন্য হয়তো তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে হয়েছে দিনের পর দিন। কারণ, ওনার সঙ্গে ঘুরতে হতো ওনার মতো করে। আমরা সব সময় ওনার শুটিং করলে উনি বিরক্ত হতেন। উনি বলতেন, 'ছবি থেকে জীবন অনেক বড়।' হয়তো বলতেন, 'চলুন, আমরা বিজয় সরকারের বাড়ি ঘুরে আসি।' আমরা বললাম, 'ক্যামেরাটা নিয়ে যাই।' উনি বললেন, 'রাখুন না ক্যামেরা, যন্ত্রটন্ত্র থাকুক। আপনার ক্যামেরা দিয়েই কাজ হবে। কিন্তু বিজয় সরকারের বাড়িতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হবে, সেটা আর উপলব্ধি করতে পারবেন না।' এ রকম করে একধরনের বাউলাঙ্গের চলচ্চিত্র নির্মাণে আমরা জড়িয়ে গিয়েছিলাম। সম্ভবত সেটা ওই বয়সেরই ধর্ম ছিল। ছবি শেষ করতে হবে—ওটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। সুলতানের মতো অসাধারণ এক ব্যক্তির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বিভিন্ন লোক-উৎসবে যাচ্ছি এবং বাংলাদেশকে তাঁর চোখ দিয়ে দেখছি, নতুন করে আবিষ্কার করছি—এটা এতই আনন্দের এবং এর মধ্যে এতই প্রাপ্তি ছিল যে, ছবি বানানোটা অনেকটা উপজাতের মতো ছিল। আমরা সুলতানেরই আশকারায়, উসকানিতে প্রচুর অর্থ, সময় ও ফুটেজ ব্যয় করেছি। বিভিন্ন লোকজ উৎসব, যেমন—কুমিল্লার পাগলার মেলা থেকে শুরু করে চট্টগ্রামের মাইজভান্ডারি, তারপর কুষ্টিয়া থেকে শুরু করে ময়মনসিংহের

বিভিন্ন উৎসব, ফরিদপুরের নৌকাবাইচ, ধামরাইয়ের রথযাত্রা—যেখানেই শুনতাম লোকসংস্কৃতির কোনো যজ্ঞ চলছে, সেখানেই ক্যামেরা নিয়ে হাজির হয়ে যেতাম।

ছবিটির একটা কাঠামো চিন্তা করে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। সুলতান তো গণমাধ্যম বা ক্যামেরার সামনে আসতে রাজি হতেন না। তবে শেষ পর্যন্ত যে শর্তে রাজি হলেন তা হচ্ছে, তিনি যেন ছবির প্রধান বিষয়বস্তু না হন। তিনি বললেন, 'আমি বরং নিমিত্ত, আমাকে উপলক্ষ করে আপনারা বাংলার কৃষকের ওপর ছবি বানান। আমি আপনাদের সঙ্গে ক্যাটালিস্ট হিসেবে থাকব।' তাঁর এই নির্দেশনা আমাদের জন্য এ রকম পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়, আমরা সুলতানের সঙ্গে ঘুরব এবং তাঁর সঙ্গে গ্রামীণ বাংলাকে দেখব। ফলে যেখানেই যাচ্ছি, সেটাই আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। যদিও চূড়ান্ত পর্যায়ে ছবিটায় তত বেশি লোকসংস্কৃতির বিষয়গুলো রাখা হয়নি। সম্পাদনার টেবিলে আমরা সব ব্যবহার করিনি, তাহলে ছবিটি অনেক বড় হতো, অনেক বড় বাজেটের হতো। এ ছবির উপস্থাপনায় আমাদের প্রাথমিক ধারণা ছিল—সুলতানের সকাল, দুপুর, রাত আর বাংলার সংস্কৃতি এবং কৃষি। আরেকটি সিদ্ধান্ত গোড়াতে ছিল; ছবিটি জীবনীমূলক হবে না। অর্থাৎ শিল্পীর একক জীবনবৃত্তান্ত বলার জন্য ছবি নির্মাণ নয়। তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন-জীবনই আমাদের মূল বিষয়। সে কারণে ছবিটির টাইটেলের আগেই তাঁর জীবন পরিচিতির পাট চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি যখন ছবিটি শুরু করি, তখন নাগরিক সমাজে সুলতান কিংবদন্তির মতো। তাঁর অতীত, এমনকি বর্তমান জীবন নিয়ে অতিমানবীয় গল্পের শেষ নেই। তিনি শাড়ি পরে, নূপুর পায়ে থাকেন। তিনি গোখরা সাপের সঙ্গে ঘুমান, বাঘকে বশ করতে পারেন ইত্যাদি। এই মিথের মিথ্যা এড়িয়ে, বর্ণাঢ্য অতিপ্রাকৃতিক ভাবমূর্তি ছাড়িয়ে শিল্পীর বাস্তব জীবন ও শিল্প অন্বেষণের সিরিয়াস দিকটার প্রতিই নজর দিতে চেয়েছি। আরেকটি বিষয় ছবির শুটিং শুরু করার আগেই পরিষ্কার ছিল, শিল্পী হিসেবে সুলতানের তুল্যমূল্য বিচার আমার লক্ষ্য ছিল না, বরং ধারণা পর্যায়ে যদি কোনো কিছু কাজ করে থাকে তা হলো, একজন শিল্পীকে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা কীভাবে পরিবর্তিত করে তুলতে পারে, ছবিটি হবে তারই একটি সমীক্ষা। আধুনিক চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর সব খ্যাতি, যশ ও পশ্চিমা লাইফস্টাইল—সবকিছু পেছনে ফেলে তিনি যখন তাঁর গ্রামে, তাঁর শৈশবে ফিরে এসে কৃষকদের সঙ্গে মিশে যান, দীর্ঘদিনের এই সম্পর্ক কৃষকসমাজ কীভাবে তাঁর শিল্পাদর্শ ও জীবনাদর্শকে প্রভাবিত করেছে, সেটা তুলে ধরা ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। ছবি

আঁকার ক্ষেত্রে বিবর্তনের যে বিশ্লেষণ ছবিতে আছে, সেটা মূলত তাঁর পরিক্রমণশীল অভিজ্ঞতার নিরিখেই এসেছে।

পাঠককে মাথায় রাখতে হবে, ছবিটি আমি সাত বছর ধরে নির্মাণ করেছি। এটি এক অর্থে আমার জন্য শাপে বর হয়েছে—কোনো নির্দিষ্ট স্ক্রিপ্ট নিয়ে হয়তো কাজটি শুরু করিনি। যে সময়ে কাজটির শুরু, তখন অভিজ্ঞতা, বয়স—অনেক ক্ষেত্রেই আমি কাঁচা ও অপরিণত।

চিত্রনাট্যের কোনো আঁটসাঁট ছকে শুটিং না করায় সম্পাদনার শেষ মুহূর্তে সৃজনশীল স্বাধীনতার সুযোগ পেয়েছি। তাই *আদম সুরত*-এর চিত্রনাট্যকে 'চিত্রনাট্য' না বলে 'নাট্যহীন চিত্র' বলতে চাই। মনে পড়ে অন্য দু-একজন, যাঁরা সুলতানকে নিয়ে ছবি বানানোর কথা ভাবছিলেন, তাঁদের প্রায় কাহিনিচিত্রের মতো কাঠামো বা একরকম চিত্রনাট্য ছিল। আমি যখন ছবি শুরু করি, তখন চিত্রনাট্য তো দূরের কথা, কোনো খসড়া ধারাভাষ্য বা সুস্পষ্ট রূপরেখাও ছিল না। এটা খামখেয়ালি বা আলসেমির কারণে নয়, বস্তুত সচেতন ভাবনা থেকেই। ক্যামেরা ইউনিট নিয়ে অনেক দিন ধরে শিল্পীকে অনুসরণ করব, তাঁর সঙ্গে বসবাস করব, তাঁর সঙ্গে গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়াব, তাঁর নৈমিত্তিক জীবন তুলে ধরব—এ রকম নির্মাণের সঙ্গে সঞ্চিত অর্থ ও আয়ত্তাধীন প্রযুক্তির সম্পর্কটা ছিল সাংঘর্ষিক। এ ধরনের পর্যবেক্ষণধর্মী প্রামাণ্যচিত্রের জন্য দরকার প্রচুর অর্থ ও সাউন্ড সিংক ক্যামেরা। বলা বাহুল্য, দুটোর একটিও আমাদের ছিল না। শুটিং শুরু করার পরে জেনেছি, দেশে লাইভ সাউন্ড ক্যামেরা নেই। আসলে সুলতানকে নিয়ে ছবির প্রজেক্ট আজকের টেপলেস ডিজিটাল ক্যামেরা প্রযুক্তির যুগে করা উচিত ছিল। এখন স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগে, মনের আশ মিটিয়ে দিনরাত বিরতিহীন শুট করছি, কোনো ফিল্ম রান-আউট হওয়া তো দূরের কথা, টেপের পয়সাও খরচ হচ্ছে না!

যদিও কোনো ধরাবাঁধা চিত্রনাট্য ছিল না, কিন্তু গাইডলাইন ছিল। চূড়ান্ত ছবিতে ভোর থেকে রাতের যে ধারাবাহিক কাঠামো রয়েছে, গোড়াতেই তা লেখা ছিল। সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা-রাতের ধারাক্রমটা অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম। ছবিতে কী থাকবে আর কী থাকবে না, তার একটা বিস্তারিত তালিকাও ছিল। যেমন, বিশেষজ্ঞ বা চিত্রসমালোচক অথবা সুলতানের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বা চিত্রশিল্পীদের সাক্ষাৎকার থাকবে না। আদি পরিকল্পনা ছিল, ধারাভাষ্য একদমই থাকবে না। সাউন্ড সিংক ক্যামেরার অভাবে যখন সুলতানের পর্যাপ্ত সাক্ষাৎকার নিতে ব্যর্থ হলাম, তখন আত্মকথনের

শরণাপন্ন হলাম। সম্পাদনা পর্যায়ে এসে অবশ্য সীমিত ধারাভাষ্য ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিই।

দীর্ঘ সময় ধরে কাজ চলার কারণে এর নির্মাণপ্রক্রিয়া অনেক বেশি ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদি হতে লাগল। ফলে আমার ঋণ বাড়তে লাগল। আমার মনে আছে, ঢাকা শহরের বেশ কিছু এলাকা তখন আমি এড়িয়ে চলতাম। কারণ, ওই সব এলাকাতেই আমার পাওনাদাররা ছিল।

আমি '৮২ সালে সুলতানের ওপর ছবির শুটিং শুরু করার পর মোরশেদুল ইসলাম *আগামী* ও তানভীর মোকাম্মেল *হুলিয়ার* কাজ শুরু করলেন এবং যথাসময়ে সুন্দরভাবে নির্মাণকাজ শেষ হয়ে এগুলোর প্রদর্শনও চলতে লাগল। *আগামী* ১৯৮৪ এবং *হুলিয়া* ১৯৮৫ সালে মুক্তি পেল। কিন্তু আমার ছবি তো শেষ হচ্ছিল না। আমার ছবির কাজ শুরুর পাঁচ বছরের মাথায় আমাকে সবাই ঠাট্টাতামাশা করতে লাগল। তখন আমার খুব খারাপ অবস্থা। রাতে কোথায় ঘুমাব, দিনে কোথায় খাব, তার কোনো ঠিক নেই। অনেকেই বলাবলি শুরু করে দিল, এ ছবি কোনো দিন শেষ হবে না। সুলতান ভাই নিজেও মাঝেমধ্যে ঠাট্টা করতেন। আবার অনেকেই ঠাট্টা করে এমন কথাও বলতেন, 'এস এম সুলতানের মৃত্যুর জন্য পরিচালক অপেক্ষা করছেন।' আরেকটি বিষয়, তখন বহির্বিশ্বে 'সিনেমা-ভেরিতে' নামের একটি আন্দোলন বেশ তুঙ্গে। এর বৈশিষ্ট্য ছিল, দ্রুত শুটিং শেষ করা এবং অনেকটা রাফ অবস্থাতেই ছবিটা দেখানো। আমিও তখন বন্ধুমহলে তামাশা করে বলতাম, আমি নতুন একটা আন্দোলনের জন্ম দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে, 'সিনেমা-দেরিতে'। তবে ছবিটা বানাতে গিয়ে আমি যতই বাস্তবতাবর্জিত কাজ করি না কেন, সুলতানের মতো এমন এক আলোকপ্রাপ্ত মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকা ও চলার ফলে আমার যে আত্মোন্নয়ন ঘটেছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। শুধু গ্রামবাংলা নয়, শিল্প সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে কিছু ধারণা আমার মধ্যে বিকশিত হয়েছে। নিজের মধ্যে একধরনের স্থৈর্য এসেছে, আত্মবিশ্বাস জন্মেছে এবং একটুতেই ভেঙে না পড়ার শক্তি জন্মেছে। তা ছাড়া শিল্পী সুলতানের সংস্পর্শে আসায় আমার মধ্যে খুব দ্রুত চলচ্চিত্রকার হওয়া এবং নাম বা যশের পেছনে দৌড়ানোর যে মানসিকতা, সেটা থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। আমি এখনো পেশাদার চলচ্চিত্রকার নই। প্রতিবছরই একটার পর একটা ছবি আমি বানাই না, বরং আমার উপলব্ধিতে যে বিষয়টি নাড়া দেয়, সেটির ওপর সময় নিয়ে শুদ্ধভাবে চলচ্চিত্রটি নির্মাণের চেষ্টা করি। একজন স্বাধীন চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে এই

যে একধরনের মনমানসিকতা তৈরি হয়েছে, সেটাকে আমি তুলনামূলকভাবে খুবই ইতিবাচক বলে মনে করি।

সবশেষে বলা প্রয়োজন, সম্ভাব্য সব অঙ্গ-ভঙ্গিমায় মানুষের দেহসৌষ্ঠবের সংবেদনশীল ও শক্তিময় চিত্রায়ণের মধ্যেই সুলতানের নিজস্বতা নিহিত। তাঁর অবয়বগুলো সুকঠিন কষ্টিপাথরে খোদাই করা। প্রায় উলঙ্গ কৃষকের গ্রন্থিল পেশি তাদের দেহ-মনের দৃঢ়তাকেই বিধৃত করে। এ যেন তাদের আত্মশক্তির বহিঃপ্রকাশ। মায়াবী তুলির স্পর্শে সুলতান তাঁর সমস্যাপ্রবণ ফিগারেটিভ ছবিকে এক অপার্থিব মাত্রায় রূপান্তরিত করেন। তাঁর ছবির এই স্বাপ্নিক মহিমা উপেক্ষা করার উপায় নেই।

‘মুক্তির গান’-এর গল্প

মানুষ লাইন ধরে একটি ছবি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। এমন দৃশ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কল্পনাতীত। তবে এমন ঘটনা ঘটেছিল ১৯৯৫ সালে। আমাদের নির্মিত ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক ছবি *মুক্তির গান* দেখার জন্য। একটি ছবি যে প্রক্রিয়ায় নির্মিত হয়, ঠিক তার বিপরীত প্রক্রিয়ায় নির্মিত হয়েছিল *মুক্তির গান* ছবিটি। অর্থাৎ একটি ছবি নির্মিত হয় মূলত প্রথমে ভাবনায়, এরপর ভাবনা অনুযায়ী চিত্রনাট্য এবং পরবর্তী সময়ে শুটিং। অথচ *মুক্তির গান* ছবিটি নির্মিত হয়েছে শুটিং করা ফুটেজ থেকে। ১৯৭১ সালে তরুণ মার্কিন নির্মাতা ও চিত্রগ্রাহক লিয়ার লেভিন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে ছয় সপ্তাহ থেকে যে শুটিং করেন, সেই ফুটেজের পরিমাণ প্রায় ২০ ঘণ্টা। সেগুলো পড়ে ছিল তাঁর বাড়ির বেইসমেন্টে। ১৯৯০ সালে আমরা সেগুলোর সন্ধান পাই। সেগুলো দেখে ভাবনা আসে ছবি নির্মাণের। এরপর টানা পাঁচ বছর চলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১৯৭১ সালের ফুটেজ সংগ্রহের জন্য ছুটে চলা।

১৯৭১ সালে শরণার্থী শিবিরে এসে মার্কিন চিত্রগ্রাহক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা লিয়ার লেভিন ৬ সপ্তাহে যে শুটিং করেছিলেন, তা আমরা দেখতে পাই ১৯৯০ সালে। ওই ফুটেজ দেখেই আমাদের মনে হয়েছিল, এই ফুটেজকে ভিত্তি করে এর সঙ্গে সারা বিশ্বে আমাদের ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের যেসব ফুটেজ রয়েছে, আমরা সেগুলো সংগ্রহ করব। এ ধারণা থেকেই আমরা একটা ছবির কাঠামো ভাবলাম। লিয়ার লেভিনের ফুটেজ ছিল শরণার্থী শিবিরের ফুটেজ। একদল শিল্পী মুক্তাঞ্চলে, বিশেষ করে শরণার্থী শিবিরে গান করছেন। একদিন ওই শিল্পীর দল মুক্তাঞ্চলে যাওয়ার সুযোগও পেয়েছিল। আমরা এই ফুটেজ

যখন পেলাম, তখন আমাদের ভাবনা হলো, এই যে ১০-১২ জন শিল্পী, যাঁদের ট্রাকে ঘুরতে দেখা যায়, প্রথমে আমরা তাঁদের খুঁজে বের করব। তাঁদের খুঁজে বের করে সাক্ষাৎকার নেব। তাঁদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আমরা ১৯৭১ সালের কর্মকাণ্ড দেখাব। আমরা এই ভাবনা থেকে তাঁদের খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলাম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, কেউ আছেন বাংলাদেশে, কেউ লন্ডনে, কেউ আমেরিকায়। এই দলের দলনেতা লিড ভোকালিস্ট মাহমুদুর রহমান বেণু, যিনি আমার চাচাতো ভাই, তিনি তখন লন্ডনে। তারেক আলী নিউজার্সি, যুক্তরাষ্ট্রে। দেবু ভট্টাচার্য কানাডায়। লতা চৌধুরী কলকাতায়। শাহীন সামাদ, ড. নায়লা খান, লুবনা মারিয়াম, বিপুল ভট্টাচার্যসহ অনেকেই বাংলাদেশে। তাঁদের সবার সাক্ষাৎকার নেব। এর মধ্যে আমি ভাবলাম, তাঁদের একটা প্রশ্ন করব আর তা হলো, 'আপনারা মুক্তিযুদ্ধে যে ভূমিকা রেখেছেন, আজ সেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনাদের অনুভূতিটা কী?' সেই স্বাধীন করা দেশটার কী হলো? এ ধরনের প্রশ্ন করব। এতে অনেক আবেগ চলে আসবে। সেই সময় বাংলাদেশের যে বাস্তবতা, সেটাও উঠে আসবে। *মুক্তির গান* ছবি তৈরি করব—এভাবেই প্রথম ভাবনাটা ছিল। পরে যখন তাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করলাম, তখন তাঁদের মধ্যে যে বিষয়টি লক্ষ করলাম তা হলো, তাঁদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন, মুক্তিযুদ্ধের যে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা তাকে ছাপিয়ে ওই সময়ে তাঁদের মানসিক যে তিক্ততা, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হতাশা, তা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আমরা তখন সেটা পরিত্যাগ করলাম। তখন আমরা আবার নতুন ভাবনায় এগোতে থাকলাম। আমরা ভাবলাম, এই ফুটেজকে কেন্দ্র করে এমন একটি ছবি বানাতে চাই, তরুণ প্রজন্ম যা দেখে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আগ্রহী হবে। আমরা ওই ফুটেজে দেখলাম কিছু গান আছে অসম্পূর্ণ। তখন আমরা ভাবলাম, গানগুলোকে রেকর্ড করব। যেহেতু বেণু ভাই ছিলেন ওই দলের দলনেতা, তাঁরা কী গান গাইতেন, তা আমার মুখস্থ ছিল। যার জন্য আমরা তাঁদের দিয়ে ১১টি গান রেকর্ড করালাম। গান রেকর্ড করে ছবিটি মিউজিক্যাল কাঠামোয় নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলাম। এর সঙ্গে 'রোড মুভি' ধরনের অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাব—এভাবে ছবিটি বানাব। আর এটা এমনভাবে সম্পাদনা করব, যেন দেখে প্রামাণ্যচিত্র মনে না হয়। মনে হবে, এটা কাহিনিচিত্র। যদিও মূলত এটা প্রামাণ্যচিত্র। এটা কীভাবে সম্ভব? পড়ে গেলাম আরেক ভাবনায়। আমি ও ক্যাথরিন এবং আমাদের সহকর্মীরা ভেবে বের করলাম একটি পথ। আর সেই পথটি হলো, আমরা ধারাবর্ণনা ব্যবহার না করে মনোলগ অর্থাৎ একটি চরিত্রের আত্মকথন

ব্যবহার করব। তারেক আলী যে চরিত্র, সে যেন ডায়েরির মতো করে বলছে। এভাবে আমরা ধারাবর্ণনা লিখলাম। এরপর একটা চিত্রনাট্য তৈরি করলাম।

লিয়ার লেভিনের শুটিং করা ২০ ঘণ্টার ফুটেজের মধ্যে ১৫ ঘণ্টাই ছিল শরণার্থী শিবিরের। সেখান থেকে আমরা শিল্পী দলের ফুটেজ ব্যবহার করেছি। আর যুদ্ধবিগ্রহের ফুটেজ ব্যবহার করেছি বিভিন্ন দেশ থেকে কিনে, যার মধ্যে আছে ভারত থেকে *নাইন মান্থস টু ফ্রিডম*, *ডেটলাইন বাংলাদেশ*সহ বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্রের ফুটেজ। ব্রিটিশ টেলিভিশনের আইটিএনসহ বেশ কয়েকটি চ্যানেলের ফুটেজ কিনে ব্যবহার করেছি। এসব থেকে সমন্বয় এবং কিছু শুটিং করে সম্পাদনার টেবিলে *মুক্তির গান* পুনর্নির্মাণ করেছি। লিয়ার *জয় বাংলা* নামে যে ছবিটি বানিয়েছিলেন, একই ফুটেজ থেকে আমরা একদম বিপরীত কিছু নির্মাণ করলাম। তাঁরটা খারাপ আর আমারটা ভালো, এটা বলব না। তিনি বানিয়েছিলেন মার্কিন দর্শকদের জন্য। তাঁর ছবিতে গান বাদ দিয়েছিলেন। আর আমারটায় মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধকে পুনর্জাগরিত করার চেষ্টা করেছি। তরুণ প্রজন্মকে পুনর্জাগরিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে করেছি।

আমরা প্রথমে চিন্তা করেছিলাম, ছবিটি শুরু করব রিফিউজি ক্যাম্পের ফুটেজ দিয়ে। এর নেপথ্যে অ্যালেন গিনসবার্গের 'যশোর রোড' গানটি ব্যবহার করব। আমি যখন তাঁর কবিতাটি অনুবাদ করে সুর দিলাম, তখন আমার ভালো লাগেনি। এভাবে শুরু না করার একটা কারণ হলো, এটি ভালো না লাগা। অন্য একটি কারণ হলো, আমাদের হঠাৎ করেই অসাধারণ একটা জিনিস পেয়ে যাওয়া। সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের অরিজিনাল নেগেটিভ পেয়ে যাওয়া। তখন আমরা আমাদের ভাবনা পরিবর্তন করে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা ছবি শুরু করব বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ দিয়ে। আমাদের ফুটেজ দেখতেই প্রতি আধা ঘণ্টায় ৫০০ পাউন্ড খরচ হয়ে যেত। যে কাজটি ক্যাথরিন ধৈর্য সহকারে করেছে। আমরা দুই সপ্তাহ এভাবে ফুটেজ দেখে ছবিটির জন্য চূড়ান্ত ফুটেজ নির্বাচন করি; যে ফুটেজ কিনতে হয়েছে প্রতি সেকেন্ড ২৪ ডলার দামে। এসব ফুটেজ সংগ্রহ করে আমাদের ছবিটি শেষ করতে সাড়ে চার বছর সময় লেগেছে। ছবি নির্মাণের অধিকাংশ সময় কিন্তু আমাদের লেগেছে ফুটেজ সংগ্রহে। ভুট্টোর সনদ ছিঁড়ে ফেলা—এ ফুটেজ আমরা ইউনাইটেড নেশন থেকে কৌশলে বের করেছি, যা একপ্রকার চুরি করাই বলা যায়। অর্থাৎ দেখার জন্য নিয়ে এসে ডুপ্লিকেট কপি করে ফেরত দিয়েছি। আমরা এটা করেছি, কারণ আমরা জানতে পেরেছি, ওদের ফুটেজ

বিক্রির কোনো অনুমতি নেই। তখন ভেবেছি, আমরা যদি ফুটেজের জন্য দরখাস্ত দিই, তাহলে পাব না। আর এই ফুটেজ ছাড়া ছবিটি অনেকাংশে পূর্ণতা পাবে না। এর জন্য এটা করেছি। যার জন্য আমরা সৎ কাজে বাধ্য হয়েই অসৎ-প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলাম। এ রকম অনেক নাটকীয় ইতিহাস আছে এ ছবি নির্মাণের পেছনে।

আমরা লিয়ার লেভিনের ফুটেজে পেয়েছিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের পোর্ট্রেট। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, ওরা মেশিনগান, বন্দুক পাশে রেখে বসে আছে। তাদের কী বিষণ্ন চেহারা! কাউকে কাউকে দেখে মনে হচ্ছে স্বপ্নে বিভোর। দেশের কথা ভাবছে অথবা স্বাধীন দেশের চিত্রটি কল্পনা করছে। এমন ছবিতে তো আমি পোর্ট্রেট ব্যবহার করতে পারব না। তখন আমরা ভাবলাম, একটা রেডিওর শট ব্যবহার করব, যা দিয়ে বোঝাব যে রেডিওতে ওরা যুদ্ধের সংবাদ অথবা কিছু একটা শুনছে। তখন আমরা বাংলাদেশের ক্যামেরাম্যান বেবি ইসলামকে ফ্যাক্স করে জানালাম, একচালা টিনের ঘরে একটা রেডিও রেখে তিনটি শট শুট করে দেন। রেডিওতে কী দেওয়া যায়? তখন ভাবলাম, সে সময় সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'সংবাদ পরিক্রমা'। তখন আমরা ছুটতে শুরু করলাম আকাশবাণীর কাছে। আমরা হয়তো সেখানে পাব। তখন আমি দেবদুলালের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম কলকাতায়। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমি তো অবসর নিয়েছি। আমি খোঁজ নিয়ে জানাব। তুমি দুদিন পর ফোন করো।' আমি দুদিন পর ফোন করলাম। তিনি জানালেন, আকাশবাণী ১০ বছর পর্যন্ত রাখে। এরপর জায়গা হয় না বলে ফেলে দেয়। আমি শুনে হতাশ। তখন তিনি নিজ উদ্যোগেই আমাকে বললেন, 'এটি লিখতেন প্রণবেশ সেন। উনি তো হাতে লিখতেন। নিজের সংগ্রহের জন্য দু-একটা স্ক্রিপ্ট হয়তো রাখতে পারেন। ওটা যদি উদ্ধার হয়, তাহলে আমি পড়ে দেব নতুন করে।' তখন আমি আমার সহকর্মী জুনায়েদ হালিমকে প্রণবেশ সেনের কাছে পাঠালাম। দেবদুলালদা আমাকে বলেছিলেন, প্রণবেশ সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো নয়। কারণ, তাঁর লেখা 'সংবাদ পরিক্রমা' পড়ে দেবদুলাল পেলেন পদ্মশ্রী, আর তিনি কোনো স্বীকৃতি পাননি। আবার বঙ্গবন্ধুও এ জন্য দেবদুলালকে সম্মানিত করেছিলেন। অথচ প্রণবেশ কিছুই পাননি। যার জন্য দেবদুলালের প্রতি তাঁর অভিমান। আমার সহকর্মী যখন প্রণবেশ সেনের কাছে গেল, তখন তিনি শুনে তো অবাক! এ খবর এত দিন পর! তখন তিনি জানান, আট বছর আগে বাসা বদলানোর সময় আটটি স্ক্রিপ্ট খুঁজে পান। তিনি সেখান থেকে কয়েকটি স্ক্রিপ্ট আগ্রহ

সহকারে দেন। স্ক্রিপ্টটি সংগ্রহ করে দেবদুলালকে দিয়ে পড়িয়ে সেই অংশ রেডিওর সোর্স হিসেবে ব্যবহার করেছি মুক্তিযোদ্ধাদের পোর্ট্রেট।

এ ছবির 'দেশেরও লাগিয়ে পরদেশি হইনু' গানটি আসলে ছিল কীর্তন, যেটি স্বপনদা গেয়েছিলেন 'দ্যাশেরও লাগিয়া পরদেশি হইনু'। এটা আমি প্রাসঙ্গিক করতে 'দ্যাশেরও লাগিয়া পরদেশি হইনু' লিখে রেকর্ড করেছি। গানটি লিয়ার এত সুন্দর শুটিং করেছেন, যেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। শিল্পীরা ট্রাকের ওপর গান করছে, তালি দিচ্ছে। ভিজ্যুয়ালটি অসাধারণ। কিন্তু কীর্তনটা নিয়ে কী করা যায়? এটা তো বিষয়ের সঙ্গে যায় না। যার জন্য প্রাসঙ্গিক কথা লিখে ওই সুরে ব্যবহার উপযোগী করেছি, যে গানটি দিয়ে আমি বোঝাতে চেয়েছি দেশ স্বাধীনতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। আসলে শিল্পীরা তো ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় ফেরেনি, তারা ফিরেছে ফেব্রুয়ারিতে। আমি সৃজনশীল স্বাধীনতা নিয়ে দেখছি, তারা গান গেয়ে জয়ের বেশে বাংলাদেশে ফিরছে। আমি দেখিয়েছি, ১৬ ডিসেম্বরে সাধারণ মানুষ ভারতীয় সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে। আর মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার শিল্পীরা তা দেখে ট্রাকের ওপর থেকে হাসছে। আসলে ওটা ছিল কল্যাণী ক্যাম্পে রিফিউজি বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের হাসাহাসি করার দৃশ্য। এ ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই, আর তা হলো, বাস্তবের চেয়ে সত্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো দৃশ্যটি বাস্তবে ঘটেনি। বাস্তবে ওরা শিশুদের সঙ্গে হাসাহাসি করেছে। এটা বাস্তবে না ঘটলেও মুক্তিযুদ্ধে এটা ঐতিহাসিক সত্য। আমি বাঁধাধরা নিয়মে না থেকে সৃজনশীল স্বাধীনতা নিয়ে এমন অনেক কিছু করেছি ছবিটিতে।

আমরা ছবিটি গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে দেখিয়েছি। আজও ডিসেম্বর ও মার্চ মাস এলেই তা দেখানো হয়। প্রতিটি প্রজন্ম আসছে, তারা *মুক্তির গান* দেখে মুক্তিযুদ্ধকে চিনছে। এ জন্য আমাদের একটা তৃপ্তিবোধ রয়েছে। আমি মনে করি, ২০০৮-এর নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ যে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জাগ্রত আছে, তার প্রমাণ মিলেছে। এ প্রজন্ম যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে নিজেকে সচেতন বলে প্রমাণ করল। এ ক্ষেত্রে আজ সামান্য হলেও *মুক্তির গান*-এর অবদান রয়েছে। এটা আমাদের যেমন বড় পাওয়া, একই সঙ্গে আমার অতৃপ্তির দিক হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের ফুটেজ শুধু *মুক্তির গান* ছবিতেই নয়, এমন ফুটেজ অসংখ্য ছবিতে রয়েছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ দলিল এখনো আমরা পাইনি। *মুক্তির গান* ছবিতে যা নেই, আমরা *মুক্তির কথা* দিয়ে তার পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

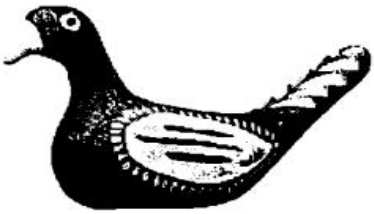

লিয়ার লেভিন : আমাদের মুক্তির সারথি

তৎকালীন স্নায়ুযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু আমাদের বিষয় ছিল না, এ যুদ্ধে লিপ্ত দুই শিবিরের কারণে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম একটি বৈশ্বিক মাত্রা পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ আমাদের দুর্ভাগ্য বাড়িয়ে তোলে। এই দেশ দুটি প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তান সরকারকে সামরিক সহযোগিতা করে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত আমাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবীতে এ জন্য মাত্র নয় মাসেই মুক্তিসংগ্রাম কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর গতি পায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসজুড়েই আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল আমাদের দিকে। একটি দিনও বাদ যায়নি যেদিন যুদ্ধের কথা শিরোনামে ছিল না। গণমাধ্যমের এমন ভূমিকা মানুষকে প্রভাবিত করে। গোটা দুনিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থনের জোয়ার তৈরি হয়। জনসমর্থনের সবচেয়ে বড় নজির মেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অথচ এই রাষ্ট্রটি ছিল পাকিস্তানি গণহত্যার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। আমার সব সময় মনে হয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ জন্য কোনো রাষ্ট্র বা সরকারের তোয়াক্কা কেউ কখনো করে না।

যুক্তরাষ্ট্রে কেনেডি থেকে শুরু করে সব ডেমোক্র্যাট সদস্য পাকিস্তানের আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। কংগ্রেসে তাঁরা প্রতিবাদমুখর থাকেন। এসবের বাইরেও সাধারণ মানুষ, সাংস্কৃতিক মহল, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকেরা ছিলেন আরও সোচ্চার। সিডনি শনবার্গের মতো সাংবাদিক, অ্যালেন গিন্‌সবার্গের মতো কবি—সবাই মুক্তিকামী বাঙালির সাথি হয়েছেন। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' মার্কিন জনগণের সংহতির

অনুপম দৃষ্টান্ত। দুনিয়ার কোথাও বাংলাদেশের ডাকে এত সংগঠিতভাবে কেউ সাড়া দেয়নি।

এবার আমার ক্ষেত্র, অর্থাৎ চলচ্চিত্রমাধ্যমের প্রসঙ্গে আসি। সিবিএস, এনবিসির মতো চ্যানেলগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যাপকভাবে বাংলাদেশকে কাভার করেছে। এগুলো ছিল নিউজ রিল। এসব চ্যানেলে প্রতিদিনই দুই থেকে পাঁচ মিনিটের ফিচার ধরনের প্রতিবেদন প্রচারিত হতো। লিয়ার লেভিন এসব প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পেশায় তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞাপননির্মাতা। ব্যক্তি-উদ্যোগে পুরোপুরি পেশাদার চলচ্চিত্র ইউনিট নিয়ে তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছেন। অক্টোবর মাসে তিনি কলকাতায় আসেন এবং মাত্র ছয় সপ্তাহ সেখানে থেকে শুটিং করতে পেরেছিলেন। সীমাহীন প্রতিকূলতায় বাঁধা ছিল তাঁর ওই সময়টুকু। একজন মার্কিন নাগরিক হওয়ায় তাঁকে চিহ্নিত করা হয় সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে। ভারত ও বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার তাঁকে 'সিআইএর চর' মনে করে। শরণার্থী শিবিরের বাইরে তাই লিয়ারের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত ছিল। আবেগী, উদ্যোগী লিয়ার এত বিধিনিষেধ মানতে পারেননি। এ জন্য তাঁকে শাস্তিও পেতে হয়। শিবিরের বাইরে শুটিং করায় এক দিন ও এক রাত হাজতেও কাটাতে হয় তাঁকে। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ পুরোদমে শুরুর আগেই সরাসরি ভারত সরকারের নির্দেশে লিয়ারকে ভারত ছাড়তে হয়।

১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। দলে দলে মুক্তির ছেলেরা ঢাকায় প্রবেশ করে। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে লিয়ারের এই বিজয়ী মিছিলে থাকার কথা ছিল, অথচ তিনি থাকতে পারেননি। তাঁর স্বপ্নের ছবিটা শেষ হয় না। একাত্তরে না, বাহাত্তরেও না। তার পরও আর হয় না। বাংলাদেশের কেউই লিয়ারের কোনো খোঁজ নেয় না। যে সাংস্কৃতিক দলের কর্মকাণ্ড লিয়ার ক্যামেরায় ধারণ করেছেন, তারাও লিয়ারকে ভুলে যায়।

১৯৭১ সালে নিজের ছবির জন্য ৫০ হাজার ডলার খরচ করেও লিয়ার কেন কাজটি শেষ করতে পারেননি, সেটা এখন প্রশ্ন হতে পারে। আমি নিজেও চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত আছি। লিয়ারের সঙ্গে আমি বহুবার এ নিয়ে কথা বলেছি। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে অনেক সরকারি প্রতিবন্ধকতা ছিল, কিন্তু সেটাই সব নয়। লিয়ার একজন বিজ্ঞাপননির্মাতা। একই সঙ্গে তিনি অসাধারণ সিনেমাটোগ্রাফার। কিন্তু ছবির জন্য চিত্রনাট্য লেখার সাহস তিনি করে উঠতে পারেননি। অর্থের বিনিময়ে একজনকে চিত্রনাট্যের দায়িত্ব দেওয়া হয় কিন্তু রিচার্ড নামের এই চিত্রনাট্যকার একটি লাইনও লেখেননি। সাংস্কৃতিক

দলটির সঙ্গে লিয়ারের পরিচয় হয় আকস্মিকভাবে। লিয়ার এ দলের সঙ্গে থেকে ছবি তোলার কাজ করতে থাকেন। লিয়ার লেভিন ছবিটি তৈরি করতে যাচ্ছিলেন মার্কিন দর্শকদের জন্য। এর জন্য বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে সাংস্কৃতিক দলটি যে বাংলা গানগুলো পরিবেশন করেছিল, তা খুব জুতসই ছিল না। এ কারণে তার নির্মিত *জয় বাংলায়* গানের ব্যবহার আমরা দেখি না। ঝামেলা আরও ছিল—নয় মাসে যুদ্ধ শেষ হবে, তা কেউ ভাবেনি। আর যুদ্ধ শেষ হতেই দৃশ্যপট বদলে যায়। আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে বাংলাদেশ গুরুত্ব হারাতে থাকে। ফলে নয় মাস বাংলাদেশের ব্যাপারে ইতিবাচক থেকেও ডিসেম্বরের পর অধিকাংশ মার্কিন জনগণ এই দেশটিকে ভুলে যায়। লিয়ার তাঁর ছবির জন্য পরিবেশক খুঁজতে থাকেন, কিন্তু মেলে না।

লিয়ারের *জয় বাংলায়* যুদ্ধের দৃশ্য নেই, রাজনীতি নেই, আছে শুধু সৃষ্টিশীল ইমেজ। একে তুলনা করা যায় রবার্ট ফ্লাহার্টির ধ্রুপদি প্রামাণ্যচিত্র *লুইজিয়ানা স্টোরির* সঙ্গে। বাংলাদেশের জন্মলগ্নকে ধারণ করতে না পারা ছিল লিয়ারের জন্য বড় ব্যর্থতা। সৃষ্টিশীল কোনো ছবি তিনি এরপর আর বানাতে পারেননি। বিজ্ঞাপনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অনেক টাকা রোজগার করেছেন, হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ও সফল ১০ জন বিজ্ঞাপননির্মাতার একজন; অথচ স্বপ্নের ছবিটি থেকে গেছে অসমাপ্ত।

মুক্তির গান নির্মাণের জন্য আমি আর ক্যাথরিন তাঁর বাসায় গিয়ে দেখেছিলাম, কী মমতায় তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ফুটেজগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছেন। ২৫ বছর পর *মুক্তির গান*-এর মাধ্যমে হয়তো লিয়ারের অসম্পূর্ণতাকে আমরা পূরণ করেছি। যে প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, তাদের কাছে লিয়ার লেভিনের এ ফুটেজের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হাজির হয়েছে। যেহেতু মাধ্যমটা ফিল্ম, সেহেতু আমরা না করলেও আমার বিশ্বাস, *মুক্তির গান* ৫০ থেকে ১০০ বছর পর হলেও নির্মিত হতো।

শুধু লিয়ার লেভিনের তোলা ফুটেজ নয়, *মুক্তির গান*-এর জন্য আমরা যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, কানাডা, ফ্রান্স, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। সেগুলো দেখে মনে হয়েছে, লিয়ারের কাজের সামনে লাখো ঘণ্টার ফুটেজও কিছু না। তাঁর ফুটেজ ও তাঁর সহযোগিতায় *মুক্তির গান*-এর অস্থিমজ্জা দাঁড়িয়েছে।

লিয়ার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সক্রিয় বন্ধু। তাঁর ক্যামেরা মুক্তিযুদ্ধের আত্মাকে স্পর্শ করেছে। কোনো প্রামাণ্যকার নয়, মুক্তিযুদ্ধ মহাকাব্যের মহাকবি লিয়ার লেভিন।

বিশ্বসভায় 'মাটির ময়না'

মাটির ময়না নিয়ে কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়, সেটি সত্যিই অন্য যেসব উৎসবে আমি এর আগে অংশগ্রহণ করেছি, সেগুলোর তুলনায় অত্যন্ত অন্য মাত্রার এবং অন্য পর্যায়ের; যার সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র পূর্বধারণা ছিল না। আসলে কান উৎসবে ছবিটি নির্বাচিত হওয়া, ডিরেক্টরস ফোর্টনাইটের উদ্বোধনী ছবি হিসেবে মনোনীত হওয়া, এটা খুবই বড় ধরনের একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দ এবং একই সঙ্গে অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার ছিল আমাদের জন্য। ২০০২ সালের ১৬ মে থেকে অনুষ্ঠিত কান উৎসবে আমরা অংশগ্রহণ করি। উৎসবের প্রথম দিকের দুটো বিষয় না বললেই নয়। একটি হলো, কান উৎসবের জৌলুশ, তার বৈভব এতটাই বিশাল ও বিপুল যে, *মাটির ময়নায়* শিশু আনু যেমন অভিভূত বিস্ময়ে নৌকাবাইচ প্রত্যক্ষ করে, তেমনি বাংলাদেশের একজন নির্মাতা হিসেবে কানে গিয়ে আমার অবস্থা আনুর ওই অবস্থার সঙ্গেই তুলনীয়। একটা বিশাল বর্ণময়, অত্যন্ত প্রাণবন্ত কোনো উৎসবে একটি শিশুর যে বিস্ময়বিহ্বল অবস্থা হতে পারে, আমার বেলায় মনে হয় তা-ই হয়েছিল।

অন্য বিষয়টি হলো, এই বিস্ময়বিহ্বলতার ঘোর কাটতে দেরি হলো না আমাদের। এ রকম একটা বিশাল প্রাপ্তি শুধু আমার জন্য নয় বা আমার ছবির জন্যই নয়, এটা পুরো জাতির জন্যই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই বিজয়, এই আনন্দ আমরা উপভোগ করতে পারিনি। কারণ, আমরা যখন কানে পৌঁছাই, এর মধ্যেই ছবিটি দেশে নিষিদ্ধ হয় সেন্সর বোর্ডের কল্যাণে। অত্যন্ত বেদনাহত মন নিয়ে এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা উৎসবের দিনগুলো কাটিয়েছি নিজ দেশে ছবিটির

দুর্ভাগ্যের কারণে। একটা মিশ্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি আমরা। যা হোক, তার পরও আমাদের এই শোকের মধ্যে অবশেষে একটা শক্তি এসে যোগ হলো যখন উৎসব শেষে *মাটির ময়না* একটা গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেল। এটা আমাদের অনেক শক্তি-সাহস জুগিয়েছে। যখন দেশে ফিরে আসি, আমার আত্মপ্রত্যয় ছিল, ছবিটি যে অবিচারের মুখোমুখি হয়েছে, এই পুরস্কারের ফলে তার একটা প্রতিকার ঘটবে। পুরস্কার প্রাপ্তির পর সাংবাদিক আর সাধারণ মানুষ যেভাবে ছবিটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তা এর নিষিদ্ধ হওয়ার লেবেলটি তুলে ফেলতে সাহায্য করেছে।

উৎসবের হাজার রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে আমার কাছে একটা বড় প্রাপ্তি এই যে, শুধু আমি আর ক্যাথরিন *মাটির ময়না* নিয়ে কানে যাইনি। আমি খুবই আনন্দিত যে *মাটির ময়না*র একটা বড় দলকে আমি কান উৎসবে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। সেটা অবশ্য কান উৎসবের কল্যাণে এবং ফরাসি সরকারের বদান্যতায়। জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, রোকেয়া প্রাচী, ছবির চিত্রগ্রাহক সুধীর পালসানে এবং ছবির সঙ্গে যুক্ত ছিল এমন কিছু তরুণ-তরুণী, যেমন, দীনা হোসেন ও রোজ আনামসহ আরও অনেকে ছিল আমাদের দলে। চরম আনন্দ ও দুঃখের মধ্য দিয়ে আমরা কান উৎসবটি অতিবাহিত করেছি। কান উৎসবের একটা খুবই বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক আমার চোখে পড়েছে—এটি যতটা না উৎসব, যত না দেখা হয় চলচ্চিত্র, তার চেয়েও বেশি এটা একটা বাজার। এটা আসলে একটা ভবের বাজার, কেনাবেচার এক বিরাট জায়গা। এই উৎসব সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি, অনেক মিথ, বই-গল্প পড়েছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ করার পর লক্ষ করলাম, এর উল্লেখযোগ্য একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই উৎসবে সাধারণ মানুষ ছবি দেখতে পারে না। যত টাকাই হোক না কেন, টাকা দিয়ে কোনো টিকিট পাওয়া যায় না। পৃথিবীর নানা দিক থেকে আসা চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু ছবি দেখার সুযোগ পান। এ ছাড়া ভূমধ্যসাগরের তীরে এই অপূর্ব সুন্দর শহরটির ৭০ হাজার অধিবাসীর প্রায় সবাই উৎসবের সময় শহর ছেড়ে চলে যায়। কারণ, উৎসবকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী থেকে আসা চলচ্চিত্রের পেশাদার লোকজন, যেমন—প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক, কলাকুশলী, টেলিভিশনকর্মী, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার মিলে প্রায় ৩০-৪০ হাজার লোক শহরটিকে বলতে গেলে দখল করে ফেলে। আমরা যেবার গিয়েছিলাম, সেবার তো শুধু সাংবাদিকই ছিল সাড়ে চার হাজার। তো, এই চলচ্চিত্র-আগ্রাসীদের শত গুণ চড়া দামে দুই সপ্তাহের জন্য বাড়ি ভাড়া দিয়ে স্থানীয় লোকজন এলাকা ছেড়ে চলে যায় উৎসবের সময়,

আর সারা পৃথিবীর হাজার হাজার চলচ্চিত্র পেশাদার জড়ো হয়, কেনাবেচা করে—এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার! এই উৎসবের রয়েছে একটা গ্ল্যামারের দিক এবং একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্রের একটা তুমুল প্রতিযোগিতা আর এর বাণিজ্যের দিক। সব মিলিয়ে এটা একটা অনন্য উৎসব। উৎসবের সাংবাদিকদের সামলানো, নিজের ইউনিটের দেখাশোনা করা এবং খোদ উৎসবটিকে বুঝে উঠতে গিয়ে আমাদের, বিশেষ করে আমার প্রচুর সময় চলে গেছে। এর ফলে সেই অর্থে উৎসবে তেমন একটা ছবি দেখা হয়নি আমার। তার পরও আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে কান চলচ্চিত্র উৎসব, এর ডিরেক্টরস ফোর্টনাইটে *মাটির ময়না*কে নিয়ে যাওয়া এবং একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া।

এ প্রসঙ্গে দু-একটা বিষয় না বললেই নয়। অত্যন্ত অন্যায়ভাবে একটা চমৎকার সুযোগ থেকে আমাদের ছবিটিকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নির্মাতার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্রের একটি প্রতিযোগিতা বিভাগ ছিল এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য অবশ্যই যোগ্য ছিল *মাটির ময়না*। কিন্তু এর আগে আমি দুটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলাম—*মুক্তির গান* ও *মুক্তির কথা*। তো সেগুলোকে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিবেচনা করার অজুহাতে আমাদের ওই প্রতিযোগিতা থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়। তবে বিষয়টি প্রমাণ করা এবং প্রয়োজনীয় আপিল জানানোর জন্য যে দেশের ছবি, সে দেশের সরকার ও দূতাবাসের ভূমিকা থাকা দরকার ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ছবিটি তখন দেশে নিষিদ্ধ হওয়ায় কোনো সরকারি সহযোগিতা বা উদ্যোগ আমরা পাইনি। আমরা কান চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার ও ইতিবাচক সমালোচনা পেয়েছি। আমি জোর গলায় বলতে পারি, ওই বছর কানে আর কোনো ছবি অতটা পায়নি। লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকার পিটার র‍্যাডশর সমালোচনা, *লা মদঁ টেলেরামার* প্রচ্ছদ কাহিনি এ রকম অনেক ইতিবাচক সমালোচনা ও প্রচারের কারণে তখন *মাটির ময়না*কে নিয়ে একটা রব উঠে গিয়েছিল। এর ফলেই ফ্রান্সজুড়ে ৪৪টি সিনেমা হলে দীর্ঘ চার মাস ধরে প্রদর্শিত হয়েছে ছবিটি। সেখানকার সব সংগীতের দোকানে এর গানের সিডি বিক্রি হয়েছে। এসবই ঘটেছে কান চলচ্চিত্র উৎসবে আমাদের সাফল্যের কারণে। কান চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হওয়ার দুদিন আগেই আমরা সবাই মিলে দক্ষিণ ফ্রান্সের আভিন্যঁতে চলে যাই। সেখানে আমাদের এক বন্ধুর প্রায় তিন বা চার শ বছরের পুরোনো এক প্রাসাদোপম বাড়ি আছে। কান-ক্লান্ত আমরা সবাই মিলে অনেকটা বিশ্রামের জন্যই সেখানে বেড়াতে যাই। যেহেতু আমাদের সর্বোচ্চ

প্রত্যাশা ছিল গোল্ডেন ক্যামেরা বা প্রথম কাহিনিচিত্রের পুরস্কার, কিন্তু কৌশলে আমাদের ওই প্রতিযোগিতা থেকেই বঞ্চিত করা হয়। তাই উৎসবের শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে থাকাটা আমাদের তেমন জরুরি মনে হয়নি। তার চেয়ে সেই চমৎকার গ্রামে ছুটি কাটাচ্ছিলাম। আমার মনে আছে, ঠিক বিকেল তিনটায় আমাদের পরিবেশক এম কে টুর প্রেস অ্যাটাশে মনিকা দেনাতি ফোনে জানতে চাইল, 'তোমরা কোথায়? প্যারিসে?' আমি বললাম, 'না, আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সে।' সে বলল, 'তোমরা কতক্ষণে কান উৎসবে পৌঁছাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' যদিও তার কণ্ঠের উত্তেজনায় আমার মনে হচ্ছিল, ভীষণ একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে। কিন্তু কী, তা সে বলছিল না। তারপর একসময় সে আর চেপে রাখতে না পেরে অনেকটা ফেটে পড়ার মতোই বলে উঠল, 'আমরা একটা পুরস্কার পেয়েছি!' কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, পুরস্কার কী করে পাই! কারণ, আমরা যা আশা করতে পারছিলাম, সর্বনিম্ন যেটা হতে পারত, সেই প্রতিযোগিতা থেকে তো আমাদের বঞ্চিতই করা হলো। তখন সে আবার বলল, 'আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পুরস্কার পেয়েছি—এফআইপিআরইএসসিআই, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিকস প্রাইজ।' এবং আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, সে আরও বলেছিল, '...এই পুরস্কার পাওয়ার ফলে তোমরা যেমন বিশ্ব প্রচারমাধ্যমের মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসবে, তেমনি তোমাদের দেশের প্রচারমাধ্যমেরও মনোযোগ কাড়তে পারবে...।' কেননা, সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও সমালোচকদের যে আন্তর্জাতিক সংগঠন তাদের পুরস্কার এটা এবং এটা একটা বড় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। সে আরও বলেছিল, 'ছবিটা যে তোমার দেশে নিষিদ্ধ হয়ে আছে, সেই অবস্থার অবসানে এ পুরস্কার প্রচণ্ডভাবে সহযোগিতা করবে।' সে জানাল, পুরস্কার বিতরণী ছয়টায়, সাংবাদিকেরা অপেক্ষায় আছে এবং আমাকে ছয়টার আগেই পৌঁছতে হবে। কিন্তু এটা ছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার। এমনিতেই অন্তত তিন ঘণ্টার পথ, তার ওপর এখন রয়েছে উৎসবের ভিড়—তার মানে শহরে পৌঁছাবার পরও লাগবে আরও বাড়তি এক ঘণ্টা। তো আমি ভাবলাম, তাহলে আর হচ্ছে না। কিন্তু সে তবুও চেষ্টা করতে, একটা ঝুঁকি নিতে বলল। এদিকে আমরা যে বন্ধুদের বাড়িতে গিয়েছিলাম—সিলভান ও গেতান, তারা আবার *মাটির ময়নার* ইউনিটে কাজ করেছিল। তারা বলল, 'অসম্ভব! এটা কোনোভাবেই মিস করা যায় না।' অবশেষে আমরা যে গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম, সেটা বাদ দিয়ে তাদের ফোর হুইলার গাড়ি নিয়ে যখন রওনা দিলাম, তখন আমাদের হাতে আছে মাত্র

আড়াই ঘণ্টা। ওরা পাগলের মতো হাইওয়ে দিয়ে গাড়িটি উড়িয়ে নিয়ে চলল এবং অনুষ্ঠান শুরুর ঠিক ১০ মিনিট আগে আমি, ক্যাথরিন ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়সহ পুরস্কার বিতরণী সভায় গিয়ে পৌঁছালাম। আমি পুরস্কার গ্রহণ করলাম। এটা খুবই অপ্রত্যাশিত এবং অনেক বড় একটা স্মৃতি আমার জন্য। রেডিও, টিভি ও *ভ্যারাইটি টেলেরামা* ইত্যাদি পত্রিকায় ব্যাপক ইতিবাচক সমালোচনা, উৎসবে উদ্বোধনী ছবি হিসেবে নির্বাচন—শুধু তা-ই নয়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইতালীয় ও ফরাসি ঘোষণার পাশাপাশি রোকেয়া প্রাচীর কণ্ঠে বাংলায় ঘোষণা—সবকিছু মিলিয়ে আমরা আত্মহারা ছিলাম। কিন্তু পুরস্কার—সামান্যও প্রত্যাশা ছিল না। অপ্রত্যাশিতভাবে যখন এমন একটা পুরস্কার পেলাম—এটা ছিল সাংঘাতিক! আমার মনে আছে, আমরা রাতেই ফিরে এসেছিলাম। ওখানে সবাই অপেক্ষা করছিল। আমরা ফিরে গিয়ে একসঙ্গে ওই রাতেই পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি উদ্‌যাপন করলাম।

কানে আমার আরেকটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিখ্যাত ইরানি চলচ্চিত্রকার আব্বাস কিয়েরোস্তামির সঙ্গে দেখা হলো, একসঙ্গে বসে তাঁর *টেন* ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার দেখলাম এবং তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ কথোপকথন হলো, যা পরবর্তী সময়ে দেশ-বিদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তখন একটা বিষয় আমার খুব খারাপ লাগছিল—এই যে আব্বাস কিয়েরোস্তামির *টেন* ছবিটি, যেটি আমার মতে অত্যন্ত সংস্কারবাদী এবং একটি নারীবাদী ছবি, যেটি ইরানি শরিয়াহ আইন তো বটেই, এমনকি তাদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে; কিন্তু তার পরও ছবিটি কানে প্রদর্শিত হচ্ছে বলে ইরানি দূতাবাসের প্রতিনিধিরা গর্বিতভাবে উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। আর আমাদের ছবিটি সেই অর্থে র‍্যাডিকেল কোনো ছবিই নয়, তার ওপর এটি উৎসবের উদ্বোধনী ছবির মর্যাদা লাভ করেছে এবং আন্তর্জাতিক সমালোচক পুরস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারও পেয়েছে, অথচ সেই ছবিটি দুঃখজনকভাবে সেই মুহূর্তে আমার নিজের দেশে নিষিদ্ধ। তো একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আমি ছবিটি দেখছিলাম এবং আমার খুবই খারাপ লাগছিল।

এরপর আমরা মারাকেশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যাই। এই উৎসব সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মারাকেশ মরক্কোর অত্যন্ত প্রাচীন এক নগর। ইসলামি ঐতিহ্য, বিশেষ করে ইসলামি স্থাপত্য এবং সেই সব পুরোনো মাদ্রাসার জন্য বিখ্যাত, যেগুলো সত্যিকার অর্থেই জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রভূমি ছিল। তাদের স্থানীয় ভাষায় বলে 'মেদরাসা'। এগুলো দেখতেই হাজার হাজার পর্যটক ওই দেশে যান। মারাকেশ আন্তর্জাতিক

চলচ্চিত্র উৎসব মরক্কোর বাদশাহ ষষ্ঠ মোহাম্মদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হয়। আমার কাছে এই উৎসবে আমন্ত্রণের একটা বিশেষ মূল্য ছিল। কারণ, আমার ছবিটা কিছুটা হলেও ইসলাম ও মাদ্রাসা নিয়ে, আর উৎসবটি হচ্ছে একটি মুসলিম দেশে, একজন মুসলমান বাদশাহের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায়—এই বাদশাহ আবার 'আমিরুল মোমেনিন' হিসেবে বিবেচিত। তো ইসলামবিরোধী ছবি হিসেবে যেটি এ দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে, সেটি মরক্কোর মুসলমান সমাজ কীভাবে নেয়, তা দেখার একটা ঔৎসুক্য কাজ করছিল আমার মনে। উৎসবে গিয়ে তো আমাদের চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার অবস্থা। সে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা! কানকে যেন উঠিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে, যেন কানেরই অন্য একটা সংস্করণ! এর জৌলুশ, চাকচিক্য-আয়োজন এতই চমৎকার ও সুসজ্জিত-সুবিন্যস্ত, যা বলে বোঝাতে পারব না। কোটি কোটি ডলারের আয়োজন! হলিউডের স্পিলবার্গ থেকে শুরু করে কস্তা গাভরাসের মতো র‍্যাডিকেল নির্মাতা, ক্যাথরিন দানিয়ুবের মতো অভিনেত্রী, আমির খানসহ বড় বড় চলচ্চিত্র মহারথিদের আগমন ঘটেছিল সেখানে। বিখ্যাত অভিনেত্রী জ্যঁ মরো ছিলেন জুরি বোর্ডের সভাপতি। সে দেশের সবচেয়ে প্রবীণ ইসলামি চিন্তাবিদ যিনি, তিনি ছিলেন জুরি বোর্ডের সদস্য। সব মিলিয়ে এক বিশাল অবস্থা! আর উৎসবে যেসব আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, বিশেষ করে উদ্বোধনী ও সমাপনী পর্বে—এককথায় অনন্যসাধারণ। সেই মধ্যযুগীয় এক ভগ্ন প্রাসাদসংলগ্ন এলাকায় উন্মুক্ত আকাশের নিচে গ্রিক অ্যাম্ফিথিয়েটারের আদলে নির্মিত বিশাল এবং রঙের সুনিপুণ সমন্বয়ে সজ্জিত চমৎকার মঞ্চ, আর তার পেছনে আকাশছোঁয়া বিরাট আকারের পর্দা, হাজার হাজার দর্শক, যার বেশির ভাগই চলচ্চিত্রের ভিভিআইপিভুক্ত রথি-মহারথি। এলাকাজুড়ে অপূর্ব লাইটিং। অতিথিদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থার কথা আর কী বলব—পথের দুই পাশে বিরাট বিরাট মশাল জ্বলছে, বিশাল বিশাল আরবীয় ঐতিহ্যে তাঁবু তৈরি করা হয়েছে সেখানে, আরবীয় ও আফ্রিকান রংবাহারি পোশাকে সজ্জিত রমণীরা নৃত্যের তালে তালে অতিথিদের স্বাগত ও অভিনন্দন জানাচ্ছে। যেতে যেতে আমার মনে হলো, যেন মধ্যযুগের ওপর নির্মিতব্য কোনো বিশাল হলিউডি ছবির সেটে ঢুকছি কিংবা সত্যি সত্যি যেন মধ্যযুগেই প্রবেশ করছি। আর নৈশভোজ ছিল একটার চেয়ে আরেকটা আরও বিস্ময়কর! আমার বিশেষভাবে মনে আছে, রাজকীয় নৈশভোজের কথা। সেখানে অতিথিদের মধ্যে যখন বাদশাহ ষষ্ঠ মোহাম্মদের আগমন ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় ব্যান্ড বেজে উঠল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আমরা আশা

করেছিলাম, ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় সংগীত বাজানো হবে, কিন্তু সবাইকে অভিভূত করে দিয়ে বেজে উঠলো বিটলসের গান। এর মধ্য দিয়ে এই তরুণ রাজার কিছুটা হিপ্পি প্রভাব এবং শিল্প-সংস্কৃতি তথা তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদী মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ পায়। সব মিলিয়ে উৎসবের যে ১০টি দিন আমরা সেখানে ছিলাম, ভাবলে মনে হয় যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো একটা সময়ে ভ্রমণ করে এলাম। সেখানে *মাটির ময়নার* দুটো প্রদর্শনী হয় ব্যাপক আয়োজনে, দর্শকদের যথেষ্ট সাড়া পাই আমরা—তাদের আরবি প্রশ্নগুলো ইংরেজি করে দেওয়া হয় আমাদের কাছে, আমরা উত্তর দিই। স্থানীয় পত্রিকাগুলোয় 'তায়েরে ত্বিন' মূল শিরোনামে প্রচুর লেখা ছাপা হয়। 'তায়ের' মানে হচ্ছে পাখি, 'ত্বিন' মানে হচ্ছে মাটি। ছবিটি দর্শকপ্রিয়তা এবং যতটা সম্মান পেয়েছে, আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে এমন একটা মুসলমান দেশে এই ছবি নিয়ে, আমরাও এর চেয়ে তেমন বেশি কিছু আশা করিনি। তো উৎসবের শেষ দিন সারা দিন ঘুরেফিরে ক্লান্ত আমরা বিকেলে হোটেলে ফিরেই খবর পেলাম আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে, আধা ঘণ্টার মধ্যে আনুষ্ঠানিক পোশাকে আমাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির হতে হবে। তখনই বুঝতে পারছিলাম, একটা বিশেষ কিছু ঘটেছে। কিন্তু কী, তা বুঝতে পারছিলাম না। তো আমরা সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম, অনেকগুলো ভালো ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে *মাটির ময়না* শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের জন্য পুরস্কার পেয়েছে। আমাদের একটা নিজস্ব ধারণা সব সময় ছিল, ছবিটির সবচেয়ে বড় শক্তি ও যোগ্যতা হয়তো এর চিত্রনাট্য। তাই পুরস্কারটি পেয়ে আমার কাছে খুবই ভালো লাগল এবং বিশেষভাবে আপ্লুত হয়েছিলাম। আরেকটি বিষয় হলো, গত দেড় বছরে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণের সুবাদে পৃথিবীর নানা প্রান্তের বিখ্যাত চলচ্চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটেছে। তবে এমন ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছে এই উৎসবের সুবাদে। তাঁদের মধ্যে আছেন প্যালেস্টাইনের নির্মাতা সুলাইমান, শাদের পরিচালক হারুন, কানে পরিচিত মৌরিতানিয়ার আবদুর রহমান সিসাকু এবং আফ্রিকার বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার কোস্তাগারাসের মতো বিশাল চলচ্চিত্রকার, যিনি অবশ্য এখন আর ছবি তৈরি করেন না। এ রকম অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে এক দারুণ মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেটেছে আমাদের মারাকেশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

তবে এর মধ্যেও একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। ওই উৎসবে আমাদের ডিজিটাল ক্যামেরায় প্রায় আড়াই শ ছবি তুলেছিলাম, কিন্তু উৎসবের

ব্যস্ততায় সেগুলো আমরা কম্পিউটারে ডাউনলোড করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, ফ্রান্সে গিয়ে করব। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের! কাসাব্লাঙ্কায় আমাদের ফ্লাইট থেকে ক্যামেরাটি চুরি হয়ে যায়। এই দুঃখ আমি কোনো দিন ভুলব না। এই উৎসবের কত অপূর্ব সব ছবি আমরা তুলেছিলাম, সব চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। শুধু তিনটি ছবি বেঁচে আছে। যেহেতু পুরস্কার পাওয়ার পর বাংলাদেশের পত্রপত্রিকার জন্য ছবি পাঠাতে হয়েছিল, তাই জ্যঁ মরো ও আমির খানের কাছ থেকে পুরস্কার নেওয়ার তিনটি ছবি তখন ডাউনলোড করা হয়েছিল।

এরপর আমরা যাই এডিনবার্গ চলচ্চিত্র উৎসবে। যুক্তরাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটো চলচ্চিত্র উৎসব হয়, যার একটি হচ্ছে এটি, আর অন্যটি হলো লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসব। এর মধ্যে আমাদের ছবির পরিবেশক এডিনবার্গে *মাটির ময়না* পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। এটি একাধারে অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ ও কুলীন উৎসব, বেচাকেনার বাজার অর্থাৎ ছবির বিভিন্ন দেশে পরিবেশক পাওয়ার জন্য উৎসবটি সম্ভাবনাময়। এ ছাড়া লন্ডনে ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ ধরনের নানা কৌশলগত বিবেচনা থেকে তাঁরা *মাটির ময়নার* জন্য এডিনবার্গ উৎসবটিকে বেছে নেন। ইংরেজ দর্শকদের কাছে ছবিটি কীভাবে গৃহীত হতে পারে, তার একটি ধারণা পাওয়া ছিল সেখানে আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। বিশাল বাণিজ্যিক সিনেমা হলে দুটি প্রদর্শনী হয়। প্রতিবার ছবি শেষে এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে দর্শকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকে। দর্শকেরা বিরক্ত না হয়ে বরং আগ্রহের সঙ্গে এ ছবি নিয়ে আলোচনায় যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন, তাতে করে আমরা বেশ আশান্বিত হই। এই উৎসবের কারণেই যুক্তরাজ্যজুড়ে *মাটির ময়না* সম্পর্কে একধরনের ইতিবাচক গুঞ্জন তৈরি হয়।

আমাদের সমসাময়িক যেসব ছবি কান ও মারাকেশে দেখানো হয়, সেগুলোরও কিছু কিছু দেখার সুযোগ হয়। সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করি, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে, বিশেষত ব্রিটিশ প্রচারমাধ্যমে আমাদের বেশ কিছু সাক্ষাৎকার ছাপা হয়।

এরপর যাই মন্ট্রিয়ল বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসবে। ছবির সংখ্যা, বিভাগ, অংশগ্রহণকারী অঞ্চল প্রভৃতির বিচারে এটি পৃথিবীর বৃহত্তম চলচ্চিত্র উৎসবগুলোর একটি। সেখানে *মাটির ময়না* এবং সেই সঙ্গে আমরা আমন্ত্রিত হয়ে যাই। এর আগেই অন্য আরেকটি উৎসবে গিয়ে আমরা জানতে পেরেছিলাম, এই উৎসবের পরপরই ফরাসি ছবিটি কানাডায় বাণিজ্যিকভাবে

মুক্তি পেতে যাচ্ছে। সুতরাং, এই প্রথমবার আমাদের উৎসব-অভিজ্ঞতায় অন্য একটি মাত্রা যোগ হয় এবং আমরাও একটু বাড়তি কদর উপভোগ করি। অর্থাৎ উৎসবের আতিথেয়তা ছাড়াও আমাদের স্থানীয় পরিবেশক 'কে ফিল্মস'-এর আতিথেয়তাও আমরা পাই। কে ফিল্মসের কর্ণধার অমায়িক ভদ্রলোক ল্যুই দুসো সে দেশের ভালো ছবির জন্য বিখ্যাত। তিনি সেবারের কান উৎসব থেকে মাত্র দুটি ছবিই কেনেন। একটি *মাটির ময়না*, অন্যটি চার্লস চ্যাপলিনের *গ্রেট ডিক্টেটর*। দুটো ছবিই তিনি একসঙ্গে মুক্তি দেন। তত দিনে ইরাক যুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করেছে—এমন সময় এ ছবি দুটি প্রদর্শনের জন্য তিনি পরবর্তী সময়ে আলোচিত ও প্রশংসিত হন।

একটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা হয় সেখানে। *মাটির ময়নার* পরিচালক হিসেবে শুধু আমিই সুযোগটি পেয়েছিলাম। এটা হলো 'ব্রেকফাস্ট টক' নামে প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী উৎসবে অংশগ্রহণকারী সব চলচ্চিত্র সাংবাদিকের সঙ্গে এক দীর্ঘ আলোচনা, যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, আমাদের বন্ধুবর তানভীর মোকাম্মেল নির্মিত *লালসালু*ও সেখানে আমন্ত্রিত ছিল। ফলে আমি, ক্যাথরিন আর তানভীর মিলে বেশ চমৎকার সময় কাটাই উৎসবে। ফরাসিভাষী অঞ্চল হওয়ায় আমাদের ছবিটি ফরাসি সাবটাইটেলসহ প্রদর্শিত হয়। সেখানে দুটো প্রদর্শনী হয় এবং দুটোই হাউসফুল। একটি প্রদর্শনী ছিল রোববার নয়টায়। এদিকে মন্ট্রিয়ল হলো ক্যাথলিক-প্রধান শহর। তাই আমরা ভাবলাম, এই শোতে তেমন দর্শক সমাগম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, এটিও হাউসফুল। আমি তখন ভাবলাম, বোধ হয় এখানে আমাদের ছবির ব্যাপক প্রচার হয়েছে। কিন্তু পরে শুনলাম আসল ঘটনা। ছবি কিংবা ছবির প্রচার মূল ঘটনা নয়, এখানকার উৎসবের দর্শকেরাই জগদ্বিখ্যাত। সিনেমাপাগল দর্শকের শহর এটি। তাদের যত কাজই থাকুক না কেন, গুরুত্বপূর্ণ কোনো ছবির প্রদর্শনী থাকলে সেটা যে সময়ই হোক, তারা সেটা দেখবেই। আসলে কিছু কিছু শহর আছে, যার দর্শকেরা সিনেমার জন্য অনেক বেশি তৈরি এবং আগ্রহী। এটা আমি এডিনবার্গেও লক্ষ করেছি। সেটা তো আন্তর্জাতিক উৎসবেরই জায়গা। সেপ্টেম্বরের দিকে সেখানে প্রায় দুই মাস ধরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব, আন্তর্জাতিক বইমেলাসহ আরও নানা সাংস্কৃতিক উৎসবে একটার পর একটা, কখনো বা একই সমান্তরালে চলতে থাকে। ফলে একটা বিকশিত দর্শক-শ্রোতা-পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে সেখানে।

এরপর প্রায় সমসাময়িক সময়ে অনুষ্ঠিত হয় 'পাম স্প্রিংস চলচ্চিত্র উৎসব'। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে দুই-আড়াই ঘণ্টার পথ। দূরে পাহাড়ি মরুভূমির বুকে, বলতে গেলে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা অত্যন্ত সবুজ এক শহর এটি। হলিউডের কেউকেটা সব চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্বরাই শহরটি গড়ে তুলেছেন। তাঁরাই প্রতিবছর এই উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। চলচ্চিত্র উৎসবের রাজা হিসেবে খ্যাত অস্কারের মাস দেড়েক আগে এটি অনুষ্ঠিত হয়। একে মূলত অস্কারের ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্ম বিভাগে মনোনয়নের জন্য নির্বাচিত ছবিগুলোর ড্রেস রিহার্সেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ওই ছবিগুলো থেকে বাছাই করা ছবিগুলোই এখানে সুযোগ পায় এবং এদের অস্কারভাগ্যের হিসাব-নিকাশ ও নানা ধরনের লবিং ইত্যাদি ঘটে থাকে এই উৎসবে। এবার অস্কারের জন্য রেকর্ডসংখ্যক ৫৪টি বিদেশি ভাষার ছবি এই বিভাগে মনোনয়নের জন্য প্রতিযোগিতা করে। এর আগে এই সংখ্যা ছিল ৩৫। তো এবারের উৎসবে ৫৪টির মধ্যে ৪০টি ছবি আমন্ত্রিত হয়। আমাদের *মাটির ময়না* বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত ছবি হিসেবে সেখানে আমন্ত্রণ পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, ছবিটি সেন্সর ছাড়পত্র পেয়ে তিন সপ্তাহ মধুমিতা সিনেমা হলে প্রদর্শিত হওয়া সত্ত্বেও এই উৎসবে সেটি সেখানকার দূতাবাসের কোনো পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা কোনো সহযোগিতা পায়নি। অনেকটা কাকতালীয়ভাবে দেখা গেল, সেখানকার দূতাবাসের কনস্যুলেট জেনারেলের স্ত্রী আমার ২০ থেকে ২৫ বছরের পুরোনো বন্ধু। তবু তাঁদের কোনো আগ্রহ দেখিনি। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত তাদের ছবি *দেবদাস*-এর জন্য প্রতিদিনই ডিনার ও বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। লাখ লাখ ডলার খরচ করছে নিজেদের ছবির লবিংয়ে। অথচ আমাদের দূতাবাস একটা সাধারণ ডিনারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সেখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার, তুলে ধরার, হলিউডের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করার সহজ সুযোগটুকু কাজে লাগানোর কোনো আগ্রহ বোধ করেনি। আমি নিজের কর্তব্য মনে করে দূতাবাসে গিয়ে কনস্যুলেট জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম, কিন্তু নানা অজুহাতে আমাকে এড়িয়ে যাওয়া হলো। অথচ ভদ্রলোক টেলিফোনে প্রতিবারই আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বলছেন, এ ছবি নিয়ে তিনি খুব গর্বিত ইত্যাদি। সব মিলিয়ে আমার জন্য এটা একটা ট্র্যাজিক কমেডি। জানি না ভদ্রলোক তাঁর চাকরি চলে যাবে বা এ ধরনের কোনো ভয়ে ছিলেন কি না! তবে সেই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম, আমলাতন্ত্রের ব্যাপ্তিটা কত বিরাট। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা এতিমের মতো ছিলাম এই

উৎসবে। যা-ই হোক, এখানেই *মাটির ময়নার* মার্কিন প্রিমিয়ার হলো। প্রদর্শনীর পর অনেক আলোচনা-প্রশংসা পেলাম। কিন্তু একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা হলো এখানে। প্রদর্শনীর ঘণ্টা খানেক পর আমরা একটা শপিং মলে গিয়েছি। এক মধ্যবয়স্ক মহিলা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, তিনি ছবি দেখে এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন যে ছবি শেষ হওয়ামাত্র তিনি হল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাই আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে থাকতে পারেননি। তিনি তাঁর মনের কথাটি এখন বলতে চান। তিনি বললেন, 'সত্যি বলতে কি বাংলাদেশের মতো দেশে প্রচলিত মাদ্রাসা অথবা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি না বলে খুবই লজ্জিত।' এই যে নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে অকপট স্বীকারোক্তি, সেটা আমাকে স্পর্শ করল। *মাটির ময়না* প্রসঙ্গে সবচেয়ে মূল্যবান ও গভীর প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর এই মন্তব্য।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। আমরা তখন কান থেকে অভিনঁ্য হয়ে প্যারিসে ফিরে এসেছি। হোটেলে ঢোকার জন্য মালপত্র নামাচ্ছি গাড়ি থেকে। এমন সময় এক ফরাসি তরুণ আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জানাল, সে দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় সিনে ম্যাগাজিন *টেলেরামায়* আমার ছবি দেখে সে চিনতে পেরেছে যে আমি *মাটির ময়নার* পরিচালক এবং সৌভাগ্যবশত আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার খুবই ভালো লাগছে। এভাবে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমার সময় নেওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সে ছবিটি সম্পর্কে মাত্র একটা কথা বলতে চাইল। সে যা বলল, তার অর্থ সুন্দর দেশ, সুন্দর মানুষ। আমার সবচেয়ে অবাক লাগল এটা ভেবে, যখন কেউ এভাবে প্রশংসা করে, তখন সাধারণত বলে, সুন্দর ছবি বা এমন কিছু। কিন্তু ছেলেটি যে বলল, সুন্দর দেশ, সুন্দর মানুষ—এটা বরং অর্থপূর্ণ প্রশংসা মনে হয়েছে আমার কাছে। এমন মন্তব্যের কারণে আমি পরিষ্কারভাবে এ রকম একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম, আমি যেন আমার দেশের সাংস্কৃতিক দূতাবাস হিসেবে কাজ করছি। আমার ছবির কারণে শুধু ছবিটি নয়, আমার দেশও প্রশংসিত হচ্ছে। এ ছবিতে সেই অর্থে সুন্দর নায়ক-নায়িকা নেই, বরং আছে গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র এবং তাদেরই অভিনীত। কিন্তু সাধারণ মানুষের যে আন্তসৌন্দর্য, সেটি ফুটে উঠেছে, ধরা পড়েছে এই ছেলেটির চোখে। এ কারণেই তার মন্তব্যটি আমাকে খুবই স্পর্শ করেছে। এমনকি আমি অনেক পত্রিকার সাক্ষাৎকারেও বলেছি, 'অনেক পুরস্কারের চেয়ে এই মন্তব্যটির মূল্য আমার কাছে কোনো অংশেই কম নয়।'

ছবিটি অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডেলেড, সুইজারল্যান্ডের ফ্রিবুর্গ, স্পেনের সিটগেজসহ ইতালি ও কায়রো চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত ও প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের অভাবে এবং কখনো অন্য উৎসবের সঙ্গে একই সময় পড়ে যাওয়ায় আমরা সেগুলোয় যেতে পারিনি। এরপর মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টের অভিজ্ঞতার কথা বলি। এটি সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক উৎসবের চেয়ে মূল্যবান। কারণ, সমসাময়িক বিশ্বের শিল্পোত্তীর্ণ ছবিগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করা ছবিগুলোই সেখানে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়। *মাটির ময়না* মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট ও লিংকন সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে প্রদর্শিত হয়। তত দিনে ইরাক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, সে দিনটি ছিল অত্যন্ত নাজুক। কারণ, সেদিন মার্কিন ট্যাংকের বহর বাগদাদে ঢুকছে। ২৩-২৫টি ছবি ছিল উৎসবে এবং আমাদের ছবিটি ছিল উৎসবের শেষ দিনে। যেহেতু নিউইয়র্ক আমার দ্বিতীয় নিবাস এবং ইতিমধ্যে হলিউডের বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা *ভ্যারাইটি* খুবই প্রশংসা করে সমালোচনা ছেপেছে এবং উৎসবের সময় *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ সেই বিখ্যাত সমালোচনাটি ছাপা হয়, যেখানে এলভিস মিশেলের মতো প্রখ্যাত প্রভাবশালী সমালোচক ঘোষণা করেন, 'এ বছর তো বটেই, অন্য আর যে কোনো বছরেরই এটা অন্যতম সুন্দর ছবি।' ভদ্রলোক একজন আফ্রিকান আমেরিকান। একজন সাদা চামড়ার আমেরিকানের জায়গায় তিনি কীভাবে ছবিটি দেখেছেন, ঔৎসুক্যের বিষয়। তো সব মিলিয়ে ছবিটি বহুল আলোচিত হয় এবং এর দুটো প্রদর্শনীতেই ব্যাপক দর্শক সমাগম ঘটে। একটা মজার ব্যাপার হলো, ছবিটির সব টিকিট এক সপ্তাহ আগেই বিক্রি হয়ে যায়। এদিকে প্রবাসী বাঙালিরা বোধ হয় ভেবেছিলেন, দু-একদিন আগে গেলেই টিকিট পাওয়া যাবে। সুতরাং, তাঁদের প্রায় সবাই ছবিটি দেখা থেকে বঞ্চিত হন। যা-ই হোক, সেখানে আমার একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়। প্রদর্শনীর কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই আমরা নিউইয়র্কে। ফলে নিউইয়র্কের যুদ্ধবিরোধী মানুষের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আমি প্রত্যক্ষ করেছি, আমি ও ক্যাথরিন সেই যুদ্ধবিরোধী মিছিলে অংশগ্রহণ করেছি। নিউইয়র্কের ইতিহাসে যা কখনো ঘটেনি—পুলিশের লাঠি, ঘোড়া, কাঁদানে গ্যাস চার্জ—এসবের সম্মুখীন হই আমরা। এই মিছিলে আমাদের এক বন্ধু তার শিশুসন্তানসহ পুলিশের লাঠিপেটার শিকার হয়। যদিও নিউইয়র্কের মানুষ যথেষ্ট উদার এবং ইরাক যুদ্ধের বিরোধী, তবুও এমন একটা সময়ে মাদ্রাসা ও ইসলামবিষয়ক একটি ছবি নিয়ে আমি এই উৎসবে আছি। এতে আমার মনে একটা মিশ্র অনুভূতি কাজ করছিল যে, এই উৎসবে আমার

অংশগ্রহণ করা ঠিক হচ্ছে কি না, বা এটা বয়কট করা আমার উচিত হবে কি না! শেষ পর্যন্ত আমি উৎসব বয়কট করিনি, তবে একটি কাজ আমি করেছিলাম, যাতে করে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়ন কিছুটা লাঘব হয়েছিল। প্রদর্শনী শুরুর আগে উৎসবের রেওয়াজ অনুযায়ী ছবির পরিচালককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে এসে উপস্থাপক বললেন, 'এই পরিচালককে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ আপনারা যা পড়েছেন, তারপর তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা অর্থহীন।' যা-ই হোক, তারপর আমি কিছু কথা বলেছিলাম, যেটা আমার লিখিত বক্তব্য ছিল এবং সেখানকার এশিয়ান টেলিভিশন ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সেটা প্রচার করেছিল। বলেছিলাম, 'আমি খুবই আনন্দিত যে আজ আমার দ্বিতীয় শহর নিউইয়র্কে আপনাদের ছবিটি দেখাতে পারছি। আমি বিশেষভাবে আবেগাপ্লুত এবং খুশি এই কারণে যে, এই ছবিটির চিত্রনাট্যের প্রাথমিক ধারণাটি আমি ধারণ এবং বিশদ করতে পেরেছিলাম এই শহরের মিশ্র সংস্কৃতি ও মিশ্র ধর্মের জীবনপ্রবাহের অনুপ্রেরণায়। এ জন্য আমি আমার পাঁচ বছরের নিউইয়র্ক-জীবনের অভিজ্ঞতার কাছে ঋণী। তাই এ শহরে ছবিটি দেখাতে পেরে আমি একধরনের পুলক ও সম্মান বোধ করছি। কিন্তু একই সঙ্গে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এমন একটা সময় ছবিটি দেখাতে হচ্ছে, যখন অন্যায় যুদ্ধের কারণে ঠিক এই মুহূর্তে মারা যাচ্ছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ এবং যে যুদ্ধ পশ্চিম ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আরও দূরত্ব ও দেয়াল তৈরি করছে। এমন অন্যায় যুদ্ধের সময় ছবিটি দেখাতে হচ্ছে, এটা দুর্ভাগ্যজনক এবং আমি এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' আমি আমার বক্তব্য শেষ করা মাত্র সেই বিশাল হলভর্তি দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে একটানা দুই-আড়াই মিনিট করতালি দিয়ে এই বক্তব্যের সমর্থনে অভিবাদন জানান। আমার কিছুটা হালকা লেগেছিল এই ভেবে, এমন যুদ্ধোন্মাদ একটা সময়ে নিউইয়র্কে ছবিটির প্রদর্শনীতে একটা অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ আমি করেছি এবং সেই প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে দর্শকের করতালিতে। এটা আমার একটা বড় প্রাপ্তি। ওই উৎসবে বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে রোকেয়া প্রাচী উপস্থিত ছিলেন। সস্ত্রীক এসেছিলেন *মুক্তির গান*-এর মূল চিত্রগ্রাহক লিয়ার লেভিন। আরও ছিলেন আমাদের বাংলাদেশি, আমেরিকান, ভারতীয় তথা পশ্চিম বাংলার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এ প্রদর্শনীতে ছবিটি দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত লেখক অমিতাভ ঘোষ প্রশংসাসূচক একটি ই-মেইল পাঠিয়েছিলেন, যা সত্যিই আমার অন্যতম প্রাপ্তি।

মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে ছবিটি প্রদর্শনের কারণে এবং যাঁরা সেই উৎসবে ছবিটি দেখেছিলেন, তাঁদের কারণে ছবিটি সামনের বছর (২০০৪) যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এ দেশে সাবটাইটেলওয়ালা ছবি বাণিজ্যিক হলে চলেই না। এ ধরনের ছবির প্রতি ভয়ংকর অনীহা আমেরিকান দর্শকদের। তাই এদের বলা হয় নিরক্ষর দর্শক। এরা সাবটাইটেল পড়তে জানে না। কিন্তু অবশেষে এ দেশে আমরা পরিবেশক পেয়েছি। পুরো যুক্তরাষ্ট্র ও ইংরেজি ভাষাভাষী কানাডায় ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টের উৎসবের প্রায় সমসাময়িক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয় আমার। সেটা হলো টরন্টো আন্তর্জাতিক উৎসবের স্পেশাল শো-কেস। এখানে বছরের সবচেয়ে আলোচিত তিনটি ছবি বেছে নেওয়া হয় এবং দু-তিন মাসের মধ্যে আলাদাভাবে এদের প্রদর্শনী হয়। *মাটির ময়নার* সঙ্গে এ বছরের অন্য ছবি দুটি ছিল কান ও অস্কার পুরস্কার পাওয়া রোমান পোলানস্কির ছবি *পিয়ানিস্ট* এবং জ্যাক নিকলসনের ছবি *অ্যাবাউট স্মিট*। এটা *মাটির ময়নার* জন্য এক বিরল সম্মান। এই উৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, প্রায় ছয় মাস আগেই প্রদর্শনীর সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায়, কিন্তু ছবি শুরুর ঘোষণা দেওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ ছবির নাম জানতে পারেন না। তাঁরা শুধু জানেন, ছবিগুলো বছরের সেরা তিনটি ছবি। শুরুর আগে ছবির নাম জানানো হয় এবং আমন্ত্রিত ছবির পরিচালককে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ছবি শেষে এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে দর্শক-পরিচালক মতবিনিময় হয়। এ জন্যই এর আরেক নাম 'টক সিনেমা'। একটি মজার ব্যাপার হলো, যেহেতু এখানে উপস্থিত দর্শকদের সবাই শিক্ষিত ও উন্নত রুচির, তাঁরা প্রত্যক্ষ মতবিনিময় পর্বের পরও ই-মেইলে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকেন এবং উৎসবের আয়োজকেরা সেসব মেইল পরিচালকদের কাছে পাঠিয়ে দেন। সব মিলিয়ে এটা একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চলচ্চিত্র আয়োজন এবং আমি আনন্দিত যে এই টরন্টোতে আগামী মার্চে ছবিটি মুক্তি পাবে।

আবার একটু এডিনবার্গ উৎসব প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আসলে ওই উৎসবে সফল ব্রিটিশ প্রিমিয়ার হওয়ার কারণেই ছবিটি মূলধারায় মুক্তি পায় এবং প্রায় প্রতিটি হলেই ছয় থেকে আট সপ্তাহ ধরে চলেছে। ম্যানচেস্টার, গ্লাসগো, লন্ডন, শেফিল্ড, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ডসহ যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে ছবিটি চলছে এবং ২০০৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন হলে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে আমরা অংশ নিয়েছিলাম, যেটা মিউনিখ চলচ্চিত্র উৎসব। অপ্রতিযোগিতামূলক এই উৎসবে ছবিটি প্রশংসিত হয় এবং আমার জীবনে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক কিছু অভিজ্ঞতা হয়। যেসব আদর্শ চলচ্চিত্রনির্মাতার ছবি দেখে এবং তাঁদের সম্পর্কে পড়াশোনা করে আমি দিন দিন চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে বেড়ে উঠেছি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন আলেকজান্ডার ক্লুগে। সৌভাগ্য, তিনি আমার টেলিভিশন সাক্ষাৎকার নেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার আধা ঘণ্টা পর আমি তাঁর পরিচয় জানতে পারি। আমার মনে পড়ে, এই সাক্ষাৎকারটি এড়িয়ে বরং রাইনার হাউফ ও আদুর গোপালকৃষ্ণাণের সঙ্গে আমাদের নৈশভোজের ব্যাপারেই বেশি উৎসাহী ছিলাম আমি। কিন্তু তাঁরাই বললেন, 'যাও, আমরা ক্যাথরিনসহ কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে বসছি।' আর উৎসবের একজন কর্মীকে রেখে গেলেন, সাক্ষাৎকার শেষে আমাকে তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে। আমি নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে রয়ে গেলাম। ভাবছিলাম, এই বুড়ো লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি না হলে কী এমন হতো! তাঁকে কিছুটা পরিচিত মনে হচ্ছিল। ভাবলাম, কোনো টিভি ব্যক্তিত্ব হবেন। কিন্তু আলাপ শুরু হলে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, এটা কোনো সাধারণ টিভি সাক্ষাৎকার নয়। কারণ, খুবই দার্শনিক পর্যায়ে কথাবার্তা চলছিল। দীর্ঘ এক ঘণ্টা পর তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি যখন রেস্টুরেন্টে পৌঁছালাম, ততক্ষণে তাঁরা অর্ধেক খাবার সাবাড় করে ফেলেছেন। তো তাঁরা জানতে চাইলেন, কার সঙ্গে সাক্ষাৎকার আমি বাদ দিতে চাইছিলাম, তা আমি জানি কি না। আমি বললাম, জানি না। তখন তাঁরা জানালেন, ইনি আলেকজান্ডার ক্লুগে। শুনে আমার গলা দিয়ে যেন আর খাবার ঢুকতে চায় না। তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করেই দৌড়ে আবার স্টুডিওতে গেলাম। তাঁকে চিনতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে বললাম, তাঁর *ব্রুটালিটি অব স্টোন* থেকে শুরু করে অন্যান্য বিখ্যাত সব ছবি দেখেছি, সেগুলো থেকে কত শিখেছি, আর তিনিই আমার সাক্ষাৎকার নেবেন, এটা আমার কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। তাঁকে এটাও বলি, আগে থেকে না জানায় বরং একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে, নইলে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় আমি হয়তো আড়ষ্ট হয়ে থাকতাম।

এই উৎসবেই বিখ্যাত ইরানি নির্মাতা সামিরা মাখমলবাফের সঙ্গে আমাদের পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা হয়। আমরা একসঙ্গে ঘুরি-খাই-ছবি তুলি—বেশ মজার সময় কাটে তাঁর সঙ্গে আমাদের। অনেক আদান-প্রদানও ঘটে। তাঁর ছবিরও এক সময়কার পরিবেশক ছিল 'এম-কে-টু', যাদের সম্পর্কে ইদানীং

আমাদেরও কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তাদের ছেড়ে সামিরা চলে গেছে মিরাম্যাক্সের সঙ্গে। সম্প্রতি তাঁর ও ইরানের ছবি পরিবেশনায় কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে, তারপর বিশ্ব চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিষয়ে খোলামেলা কথা হয় তাঁর সঙ্গে। আরও অনেক বিখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতার সঙ্গে চমৎকার সময় কাটে, অনেক ছবিও দেখা হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবগুলোয় *মাটির ময়নার* জন্য তেমন কোনো আগ্রহ লক্ষ করিনি। অথচ সারা পৃথিবীতে ছবিটির প্রতি আগ্রহের সুযোগে আমাদের পরিবেশক প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য ন্যূনতম হাজার ডলার করে মূল্য নিচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়া যেহেতু তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, আমাদের নিয়ন্ত্রণে, আমরা বিনে পয়সায় ছবিটি উৎসবে দিতে পারতাম। কিন্তু কই, তেমন আগ্রহই দেখলাম না। আগের বছর দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে টেকনিক্যাল অজুহাতে ছবিটি বাদ দেওয়া হয়। এবার সিনেমা উৎসবে আমরা আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু সেখানে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ছবিটি প্রদর্শিত হয়নি। উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় ছবিটি থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করেনি, শুধু থাকার বন্দোবস্ত করে। তার পরও দিল্লিতে ছবিটি প্রদর্শিত হওয়ায় আমি খুশি। এর ফলে সেখানে বেশ কিছু সমালোচনা বেরিয়েছে *দ্য হিন্দু, আউটলুক* ও অন্যান্য পত্রিকায়। তবে এটা বেশ দুঃখজনক আমাদের জন্য, বিশেষ করে উপমহাদেশে আমরা ছবিটি তেমনভাবে দেখাতে পারিনি, অবশ্য তেমন একটা আগ্রহও দেখিনি। আমরা এখানে ভারতের ছবি নিয়ে যেমন হইচই করি, যতটা আগ্রহ-উৎসাহ নিয়ে ব্যাপক আয়োজনে তাদের ছবি দেখাই, আমাদের ছবি নিয়ে কিন্তু তাদের তেমন আগ্রহ নেই। এটা দুঃখজনক। আমার একটা আগ্রহ আছে, ছবিটি প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রদর্শিত হোক, তাহলে এর প্রতিক্রিয়াও আমরা বুঝতে পারব।

২০০৩

অন্তর্যাত্রা, বহির্যাত্রা : সিনেমা যখন সহযাত্রী

আমার কাছে ছবি বানানো হলো চূড়ান্ত রকমের বাহ্যিক একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও অন্তর্মুখী এক যাত্রা; সর্বোচ্চ রকমের সামষ্টিক একটা প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে ব্যক্তিক কল্পনার রূপায়ণ। শুটিং হচ্ছে প্রতিটি দৃশ্যায়নের মাধ্যমে বাস্তবতা ও চিত্রনাট্যকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলা, আর সম্পাদনা হলো ছিন্ন বাস্তবতাকে জোড়া লাগানো। শুটিং অনেকটা বাজার করার মতো, আর সম্পাদনা হলো হেঁশেলে রান্না করা। একটা গদ্য, আরেকটা কবিতা। কিন্তু দুই প্রক্রিয়ারই একটা সাধারণ লক্ষ্য আছে—একটি খেয়ালি আয়তক্ষেত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। 'ছায়াছবি এক মিথ্যার শিকল, যার মাধ্যমে আমরা একটা বৃহত্তর সত্যে পৌঁছাই'—আব্বাস কিয়েরোস্তামি যেমন বলেছেন। কিয়েরোস্তামির বক্তব্যকে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আরেকটু জারিত করে পুনর্ব্যক্ত করতে চাই—ছবি বানানো হলো একটা কুৎসিত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আমরা বৃহৎ সৌন্দর্যের কাছে যেতে চাই। সত্য ও সৌন্দর্যের পথে যাত্রা সব সময়ই ছলনাময়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় পাই, 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/ বিচিত্র ছলনাজালে/ হে ছলনাময়ী!'

যদিও শিল্প রচনা করা হয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ করে, তার পরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্প কেবল শিল্পীর আত্মতৃপ্তির জন্যই। আপনি যদি একজন সংগীতশিল্পী হন এবং কোনো নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় যদি মন খারাপ থাকে আপনার, তাহলে আপনি কেবল নিজের জন্যই আপনার গিটারটা বাজাতে পারেন। কিংবা ধরুন, আপনি একজন চিত্রশিল্পী। আপনি জলরং নিয়ে খেলতে পারেন, এর আশ্রয় নিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, চলচ্চিত্রের ব্যাপারে এমনটা বলা যাচ্ছে না। তাই এটাই স্বাভাবিক যে কিয়েরোস্তামি যখন হাইকু লেখেন, তিনি

বইয়ের নাম দেন *হাওয়ার সঙ্গে হাঁটা*। তাঁর চলচ্চিত্রকার-জীবনের দিকে একটু সূক্ষ্মভাবে তাকালে বোঝা যায়, তিনি বরং সিনেমাকে সঙ্গী করে হাওয়ার বিরুদ্ধেই হাঁটেন সব সময়!

অনেক দূর থেকে যখন দেখা হয়, তা পূর্বের বা পশ্চিমের যে দৃষ্টি দিয়েই দেখা হোক না কেন, এমনকি চাঁদকেও সমতল লাগে। যত কাছে যাওয়া যায়, খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো ধরা পড়ে, পূর্বানুমিত নিশ্চিত ধারণার বিপরীতে বিষয়বস্তুর জটিলতাগুলো বেরিয়ে আসে। কোনো জিনিসকে খুব বেশি কাছ থেকে দেখাও আবার কখনো কখনো ভুল ধারণা দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে করিয়ে দেন—আমরা তার খুব নিকটবর্তী বলেই বিশ্বকে ভ্রান্তিজনকভাবে অমন সমতল বা অমসৃণ দেখায়। চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান, যিনি আধুনিক চিত্রশিল্প থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলেন সহজ শিল্পে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার জন্য, একবার বলেছিলেন, 'কৃষকেরা সব সময়ই আমার ছবির একটা প্রধান বিষয়। কিন্তু আমি সব সময়ই তাদের দিকে "পাখির চোখ" দিয়ে তাকাতাম। ৩০ বছর ধরে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থাকার পর আমি এখন তাদের দিকে ব্যাঙের চোখে তাকাই। আগে আমার ছবির মানচিত্রে তাদের বিন্দু কিংবা আলংকারিক উপাদানের মতো মনে হতো, এখন আমার ছবিতে কৃষকেরা জীবনের চেয়ে বড় (লার্জার দেন লাইফ) হয়ে উঠেছে—মানচিত্র হয়ে গেছে মানুষ-চিত্র!'

কী এর মানে? এর মানে কি কেবল এটাই যে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে কীভাবে বিষয়কে দেখা হচ্ছে তার ওপর, নাকি কখনো কখনো দ্রষ্টার ওপর বিষয়েরও একটা পরিবর্তনক্ষম সক্রিয় প্রভাব থাকে? শিল্পকর্ম মানুষকে, বিশেষ করে শিল্পীকে জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসে। আব্বাস কিয়েরোস্তামি কেবল তাঁর বিষয়েরই ঘনিষ্ঠ হন না, নিজের কাছেও যান। যেমন তাঁর ছবি *ক্লোজ আপ*, যার ফারসি নাম *নামেয়ে নাজদিক*, বাংলা আক্ষরিক অনুবাদ *কাছ থেকে দেখা*। এই ছবি নিয়ে বলতে গিয়ে আব্বাস বলেন, 'ছবিটি আমি বানাইনি, ছবিটিই আমাকে নির্মাণ করেছে।' *মুক্তির কথা* বানানোর আগ পর্যন্ত আব্বাসের এ কথার প্রকৃত অর্থ আমি বুঝিনি। প্রত্যন্ত গ্রামের দর্শকদের মধ্যে আমাদের আগের ছবি *মুক্তির গান* প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা নিয়ে *মুক্তির কথা* প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরি। *মুক্তির কথা* তৈরি করতে গিয়ে আমরা আবিষ্কার করলাম, প্রদর্শিত ছবির পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে দর্শকেরা তাদের জায়গা বদল করেছে। *মুক্তির গান*-এ দেখা ঘটনাগুলোর মাধ্যমে তাড়িত হয়ে তারা আমাদের কাছে তাদের নিজেদের জীবনের কাহিনি বলতে শুরু করেছে।

তারা হয়ে উঠেছে সক্রিয় গল্পকথক, যেখানে পর্দার কুশীলবেরা হয়ে গেছে তাদের নির্বাক শ্রোতা।

এখানেই শুরু হয় ফিরতি যাত্রা। আমাদের অন্তরের যাত্রা, বিচার-বিবেচনাবিহীন এক যাত্রা। দ্বন্দ্বটা শুরু হয় দর্শক থেকে দ্রষ্টায় রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কীভাবে একটা বাহ্যিক প্রশ্নকে অন্তরের কৌতূহলে পাল্টে ফেলা যায়? একটা বাঁকা নদী, যা আবার নানা রকমের বদলে যাওয়া ভূগোলের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে, তার পাশ দিয়ে একলা পাখির মতো কী করে উড়ে চলা সম্ভব? আমাদের একান্ত উড়াল বিশ্ববিবেকের নদীর সঙ্গে মিশতে পারে ভবের বাজারের পর্বত পাড়ি দেওয়ার জন্য। পাখিটা যখন ওড়ার জন্য মুক্ত থাকে না, কী হয় তখন? নদীটা যখন বইতে পারে না? এ নদীটাই আসলে অঞ্চলের সঙ্গে অঞ্চলের সবচেয়ে ভালো সেতু। নদীর ওপর খুব বেশি সেতু তৈরি করতে গেলে নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা।

পাখির মতো বাউলরাও ভ্রমণ করে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতেই কেবল নয়, এক সময় থেকে আরেক সময়েও তাদের ভ্রমণ; যেহেতু তাদের শব্দেরা এক মুখ থেকে ফেরে আরও অসংখ্য মুখে। তাদের বয়ান কেবল প্রসারিত হতে থাকে, তাদের কথার নিহিতার্থ কখনো নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে না। একটা পুকুর বরফে জমে যেতে পারে, কিন্তু একটা নদী সব সময়ই বয়ে যায়, এমনকি বরফের নিচ দিয়ে হলেও। প্রবহমান নদীর মালিকানা কে দাবি করতে পারে? যেসব খাঁড়িকে সে ছোঁয়, তারাই ঢেউয়ের মালিক, তেমনি ছায়াছবির প্রকৃত লেখকত্বের দাবিদার তার দর্শক।

বাহ্যিক দূরত্ব অতিক্রমই কেবল ভ্রমণ নয়। কখনো কখনো আমরা সময়-ভ্রমণও করি। অতীতে ফিরে যাওয়াও একধরনের যাত্রা। সামনে এগোতে হলে পেছাতেও হয়। *মুক্তির গান* (সারা পৃথিবীর বিভিন্ন মহাফেজখানা থেকে সংগ্রহ করা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নানা উপকরণ দিয়ে তৈরি একটি ছবি) তৈরির সময় আমার সুযোগ হয়েছিল জাতীয় স্মৃতি নেড়েচেড়ে দেখার। কখনো কখনো নিকট অতীতকেও খুঁড়ে বের করে আনতে হয়, যখন তার দালিলিক উপাদানগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো মাটির গভীরে চলে যায়। ১৯৭১ সালের যে চিত্র ২৫ বছর ধরে সেলুলয়েডে বন্দী হয়ে ছিল, সেগুলোকে পুনরাবিষ্কার করতে পারাটা একটা আকর্ষণীয় কাজ নিঃসন্দেহে। আমরা যখন প্রজেক্টরে ফিল্মগুলো চালালাম, স্থিরচিত্রগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে গেল যখন, সেগুলো হয়ে উঠল ইতিহাসের ঝরনাধারা। ইতিহাসের বিজেতাই কি তার মালিক? সৌভাগ্যক্রমে সব সময় না!

আমার কাছে জাতীয় স্মৃতির ভেতর দিয়ে যাওয়ার একটা ব্যক্তিগত রূপও ছিল। জাতির বিনির্মাণ-পর্ব এবং আমার শৈশব সমকালীন। *মুক্তির গান* জাতির জন্মলগ্নের উদ্দেশে এক তীর্থযাত্রা, *মাটির ময়না* আমার নিজের শৈশবের উদ্দেশে অন্তর্গত যাত্রা। শৈশবের স্মৃতির মধ্যে ফিরে গিয়ে সমস্যাকীর্ণ পরিণত বয়সের উত্তর খোঁজা, আবার শৈশবের মানসিক আঘাতগুলোকে বয়সী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করা—পুরো ব্যাপারটা আমার জন্য ছিল আত্ম-শুশ্রূষার এক অভিজ্ঞতা।

শৈশবে ফেরা মানে কেবল একটা নির্দিষ্ট সময়েই ফেরা নয়। এটা নিজের শিকড়ে ফেরার মতোও। আমার কাছে এটা হলো নিজের গ্রামে ফেরা। এস এম সুলতান যখন শিল্পজগতের নাম-যশকে তুচ্ছ করে তাঁর গ্রামে ফিরেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর শৈশবেও ফেরা। আমি একটা গ্রামে বেড়ে উঠেছি, কিন্তু যখন ছোট ছিলাম, গ্রামের জীবন কখনো আমাকে সেভাবে টানেনি। বরং শহরে ঘুরতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাকে উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত করেছে। আমার কাছে শহর ছিল বড় আকারের মেলার মতো। অনেক পরে সুলতানের চোখ দিয়ে আমি গ্রামজীবনের ঐশ্বর্য অনুভব করতে পেরেছি। আমার প্রথম প্রামাণ্যচিত্র *আদম সুরত* তাঁকে নিয়েই করা। তিনি এই শর্তে ছবিটিতে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিলেন যে, তিনি ছবিটির বিষয় হবেন না, বরং ছবির সত্যিকারের নায়ক বাংলার কৃষককে উন্মোচিত করতে তিনি হবেন একটি উপায়মাত্র। ছবিটি বানাতে সাত বছর লেগেছিল। আমি তাঁর সঙ্গে সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি, লোকজ উৎসব থেকে শুরু করে সাধুসঙ্গে গিয়েছি। ছবিটি আসলে একটা উপজাত, সুলতানের সঙ্গে গ্রামবাংলার ঐশ্বর্যের স্বাদ নেওয়ার অভিজ্ঞতা সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

সুলতানের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে আমি একক মূলধারার জাতীয় সংস্কৃতির বদলে সংস্কৃতির শত শত ক্ষুদ্র ধারা আবিষ্কার করেছি। আমি দেখেছি যে আদিবাসী মানুষদের মতো যারা মাটির খুব কাছাকাছি, তারা যে সব সময় তাদের নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাবে, এমন কোনো কথা নেই। তারা তাদের নিজেদের সংস্কৃতিতেও বাইরেরই মানুষ। সুলতান কি নিজেও তাঁর গ্রামে একজন বাইরের মানুষ ছিলেন? নাগরিক শিল্পধারায় অবশ্যই তিনি একজন বহিরাগত, কিন্তু তাঁর নিজস্ব প্রতিবেশেও তিনি ছিলেন একজন নিঃসঙ্গ পর্যটক। একবার আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি মেয়েদের মতো জামাকাপড় পরেন কেন?' সুলতান বলেছিলেন, 'যাতে মানুষ ভাবে যে

আমি পাগল। গ্রামে পাগলকে ঘরহীন হিসেবে ধরা হয় এবং তাকে মানুষ সহানুভূতি দেখায়।'

আমি যখন কয়েক বছরের জন্য নিউইয়র্কে ছিলাম, নিউইয়র্ককে নিজের শহরের মতো লাগছিল। ম্যানহাটনের ভিড়ে মানুষের চামড়ার বিচিত্র রং দেখতে আমার ভালো লাগত। ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমি নিউইয়র্কে আবার যাই এবং গ্রাউন্ড জিরোতে গিয়ে শোক জানিয়ে আসি। আমার এক বন্ধু ওখানে নিহত হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো, এই প্রথমবারের মতো আমি নিজেকে একজন বহিরাগত হিসেবে আবিষ্কার করলাম। আমার মনে হলো, আমার ত্বক, চুল আর চোখের রঙের কারণে আমাকে অন্য চোখে দেখা হচ্ছে, যেগুলোর কোনোটাই আমার সত্যিকারের পরিচয় বয়ে বেড়ায় না। মজার ব্যাপার, নিজের দেশেও খুব কম সময়ই নিজেকে একজন ঘরের লোক বলে মনে হয় আমার। বৈশ্বিক মাপকাঠিতে আমরা একটা আত্মপরিচয়কে রক্ষা করতে চাই, দেশের গণ্ডিতে যে পরিচয়ের মালিকানা আমরা পছন্দ করি না।

আমাদের নতুন ছবি *অন্তর্যাত্রা*—যার আক্ষরিক অনুবাদ হতে পারে *ইনার জার্নি*—স্বদেশ নিয়ে তৈরি। ঘরে ফেরার গল্প। স্বদেশ কি কেবল ভূমি? ভূমি কি স্বদেশ? আমাদের কল্পনায় কি কেবল স্বদেশ-ভূমি? আমরা ঠিক কোথাকার? কোথা থেকে এসেছি আমরা? কবি জালালুদ্দিন রুমির পঙ্‌ক্তি আছে, 'আমি নই পুবের, নই আমি পশ্চিমের—দেশ আমার দেশহীন, ঠিকানা আমার ঠিকানাবিহীন।' কান্দাহারে তাঁর জন্ম, মৃত্যু তুরস্কের কনইয়ায়। দুই জায়গাতেই কি নিজেকে তাঁর আগন্তুক মনে হতো? সম্ভবত তাঁর ঘর এ দুই জায়গার মাঝামাঝি কোথাও ছিল—তাঁর যাত্রার মধ্যে!

চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ৪০ বছর : গলা সাধা বনাম কান সাধা

সত্তরের দশকের সাহিত্যমনস্ক যেকোনো তরুণের মতো আমিও চলচ্চিত্রমাধ্যমকে খাটো করে দেখতাম। সবকিছু বদলে গেল বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ (বিএফএস) আয়োজিত একটি মার্কিন প্রামাণ্যচিত্র দেখার মধ্য দিয়ে। যত দূর মনে আছে, প্রদর্শনীটি হয়েছিল মগবাজার ওয়্যারলেসের কাছাকাছি জিএসও কম্পাউন্ডে। ওখানেই প্রদর্শনী শেষে প্রথম পরিচয় হয় সংসদ আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ মুহম্মদ খসরুর সঙ্গে। আমার চাচাতো ভাই কামাল মাহমুদের বন্ধু, পেশায় স্থপতি, প্রিন্সদা আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলনে। মাদ্রাসাভিত্তিক শৈশব ও রক্ষণশীল ধর্মীয় পরিবারে বড় হওয়ার কারণে দেশি-বিদেশি বাণিজ্যিক বা জনপ্রিয় ধারার সিনেমার প্রভাব বলয় থেকে একরকম মুক্ত ছিলাম। তাই বলতে গেলে চলচ্চিত্রশিল্প মাধ্যমের সঙ্গে আমার পরিচয় চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন তথা মুহম্মদ খসরুর মাধ্যমে।

যা-ই হোক, কয়েক দিন পর প্রিন্সদা যেদিন আমাকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ কার্যালয় কাম লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন, আমার তো চক্ষু ছানাবড়া! সিনেমাবিষয়ক এত বই এক জায়গায়! সঙ্গদোষে কিছুটা সাহিত্য-আক্রান্ত হলেও সাহিত্যিক হওয়ার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কখনো ছিল না। সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্যশিল্প, নৃ-তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ছিল প্রবল আগ্রহ। সিনেমার সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক আছে বলে ধারণা ছিল না। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ বা বিএফএসের লাইব্রেরিতে নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য, মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের চলচ্চিত্রবিষয়ক বইগুলো দেখে

আমি রীতিমতো বিস্মিত! বিশেষ করে, ওই বইগুলো পড়ার লোভেই বিএফএস অফিসে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলাম। খসরু ভাই নতুন সংগ্রহের বইগুলো দেখাতে যতটা মনোযোগী—আমার আরাধ্য বইগুলো ধার দেওয়া তো দূরের কথা—পড়তে দিতে ততটা আগ্রহী নন। সদ্যপ্রাপ্ত লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্রের ওপর বইগুলো নিয়ে তখন তিনি খুব উত্তেজিত।

এরই মধ্যে দেখা হলো রাজেন তরফদার নির্মিত *পালঙ্ক* ছবিটি। মূল গল্পটির লেখক নরেন মিত্র কেবল যে আমার প্রতিবেশী গ্রামের মানুষ ছিলেন, তা-ই নয়, গল্পটি আমার পরিচিত একটি পরিবার ও গ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত। পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে দেশে তখন সামরিক শাসন চলছে। সেন্সর বোর্ড *পালঙ্ক* ছবিটির মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়-সংশ্লিষ্ট রঙিন অংশটুকু কেটে বাদ দিল। জবাই করে রক্তাক্ত করল প্রধানত সাদা-কালোতে নির্মিত রাজনৈতিকভাবে নিরীহ ছবিটিকে। ছবিটিতে খসরু ভাই সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয় সম্পাদক সেন্সর বোর্ডের কল্যাণে পৃথক *পালঙ্ক* একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলাম। ব্যস, ফেঁসে গেলাম। কনিষ্ঠ অথচ একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে শীতল পাটিতে বসে উষ্ণ আলাপে অংশগ্রহণের জরিমানা হিসেবে খসরু ভাইয়ের ফরমান হলো, 'আড্ডায় *পালঙ্ক* সম্পর্কে যা বললাম, তা লিখে জমা দিতে হবে দুই-এক দিনের মধ্যে।'

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের নিয়মিত বুলেটিনের পরবর্তী সংখ্যা বেরোবে অচিরেই। যেখানে ছবি দেখার অভ্যেস নেই, সেখানে ছবি নিয়ে লেখার সাহস কোথায় পাই! কিন্তু না লিখে টেকা দায় হলো। ফতোয়া জারি হলো, লেখা নিয়ে না এলে লাইব্রেরিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বলা যায়, একরকম গান পয়েন্টেই লিখলাম। মুদ্রিত আকারে খুব সম্ভব নিজের নাম সেই প্রথম দেখলাম! কিছুদিনের মধ্যেই টের পেলাম, ছবি দেখাদেখির সঙ্গে লেখালেখির কী সম্পর্ক! ছবি নিয়ে লিখতে বসলে সেটা আর দেখা থাকে না, হয়ে ওঠে চলচ্চিত্র পাঠ। এই চিত্রপাঠ থেকেই অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠে চলচ্চিত্রবিষয়ক পঠনপাঠন।

আজ অনেকেই হয়তো 'চলচ্চিত্রনির্মাতা হব' মনস্থ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অথবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে দ্রুত নির্মাতা হয়ে যাচ্ছেন। সাফল্যের পাশাপাশি এর কিছু কুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। চলচ্চিত্র সংসদ চর্চা বা সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আমরা যারা নির্মাণপ্রক্রিয়ায়

এসেছি, তাদের অনেকেরই মাথার মধ্যে 'নির্মাতা হব'—এমন ব্যাপারটি ছিল না। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তেই নিজেকে অবিষ্কার করেছি নির্মাতা হিসেবে।

সংসদকর্মীদের মধ্যে অনেক দিন ধরেই একটি বিতর্ক ছিল—সংসদের কাজ কেবল প্রাগ্রসর চলচ্চিত্র-দর্শক সৃষ্টি করা, নাকি দর্শকের পাশাপাশি নির্মাতাও সৃষ্টি করা? চলচ্চিত্র সংসদের কার্যক্রম প্রদর্শনী ইত্যাদির মধ্যেই সীমিত রাখা, নাকি চলচ্চিত্র নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা? আশির দশকের গোড়ার দিকে এই বিতর্ক ঘনীভূত হয় এবং আমি নিজে নির্মাণমুখী ধারার পক্ষে অবস্থান নিই। মনে পড়ে, খসরু ভাই আমার প্রো-অ্যাকটিভ প্রস্তাবনার বিপক্ষে লিখিতভাবে অবস্থান নেন। কিন্তু আজ বিতর্কটি অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর হয়ে পড়েছে। কারণ, খসরু ভাই, যিনি বিশ্বাস করতেন সংসদ আন্দোলনের সঙ্গে নির্মাণের কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি নিজেই চলচ্চিত্র সংসদের ব্যানারে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি *হুলিয়া* নির্মাণে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নেন। সূচনা হয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের।

যা-ই হোক, ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো, সংসদ আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক, সৃষ্টিশীল ধারার প্রায় সব নির্মাতা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছেন। আমি মনে করি, আমার চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রধান স্কুল ছিল চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন। এই স্কুলের মেয়াদ দুই বছরের নয়, দুই দশকের। ফিল্ম আর্কাইভসের যে কোর্সটি অন্য সংসদকর্মীদের সঙ্গে আমি করেছি, সেই প্রতিষ্ঠানটিও সংসদ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল। বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামও গঠিত হয়েছিল মূলত সংসদকর্মীদের নেতৃত্বেই।

গান শিখতে গেলে গলা সাধার দরকার রয়েছে বৈকি! এই গলা সাধার কাজটি হয়তো দু-তিন বছরের মধ্যেও সম্পন্ন করা সম্ভব। কিন্তু সফল গানের একজন শিল্পীর পেছনে আরও একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি-প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, আর তা হলো কান সাধার ব্যাপারটি। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন আমার চলচ্চিত্রনির্মাতা হয়ে ওঠার পেছনে দীর্ঘকালীন এই গুরুত্বপূর্ণ কান সাধার দুর্লভ সুযোগটি করে দিয়েছে। এ জন্য সংসদ আন্দোলনের কাছে, মুহম্মদ খসরুর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। সে কারণেই যতবার খসরু ভাইয়ের গালাগালি খেয়েছি, ততবারই তাঁর সঙ্গে আমার গলাগলি আরও বেড়েছে!

সংসদ আন্দোলনের চল্লিশ বছরে পদার্পণে ঋণগ্রস্ত সবার পক্ষ থেকে আমার অভিনন্দন। আশা করি, আমরা সবাই আমাদের এতকালের অপরিণত বয়সের অর্বাচীনতা কাটিয়ে উঠে ইতিবাচক আচরণে উদ্বুদ্ধ হব। যখন উইকেট পতনের মহামারি চলছে, তখন সত্যিকারের ক্যাপ্টেনের মতো অনমনীয়ভাবে একটি সামান্য ক্যাচের সুযোগ না দিয়ে ৪০ ওভার ক্রিজে টিকে থাকার জন্য মুহম্মদ খসরুকে প্রথম স্যালুট, নতুন ঝগড়ার আগে!

সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতি

১৯৮৫ সাল। *আদম সুরত* নির্মাণের ফাঁকে ভিডিওমাধ্যমে *সোনার বেড়ী*র শুটিং চলছে। হঠাৎ কলকাতার 'চিত্রবাণী' নামের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে মাসব্যাপী চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছি, সঙ্গে *সোনার বেড়ী*র অন্যতম ক্যামেরাম্যান আমিনুল ইসলাম দিপু। চিত্রবাণীর পরিচালক, আমাদের প্রধান প্রশিক্ষক ফাদার গাঁস্ত রোবের্জের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের খুবই ঘনিষ্ঠতা। বায়না ধরলাম, শুধু দেখা করতে নয়, দীর্ঘ আলাপের সুযোগ চাই সত্যজিতের সঙ্গে। 'ওনার শরীরটা ভালো না, কারও সঙ্গেই সাক্ষাৎ দেন না।' বলতেন ফাদার। কিন্তু ওই রাতেই ডরমিটরির রুমে তিনি এসে হাজির, 'খুব সকালে উঠতে পারবে?' বললাম, 'অবশ্যই।' 'সকাল সাতটায় মানিকদার বাড়িতে যাব, রেডি থেকো।' সারা রাত উত্তেজনায় ভালো ঘুম হলো না। অনেকগুলো বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন মনে মনে মুখস্থ করলাম। যথাসময়ে তাঁর বাসায় পৌঁছলাম। যেন সিনেমার শিল্পনির্দেশিত সজানো সেটে সত্যজিৎ বসে আছেন। ডানে-বাঁয়ে-পেছনে বই আর কাগজপত্র।

041221

বাঁ কাঁধের গা ছুঁয়ে খোলা একটি বড় জানালা। সকালের তির্যক অথচ নরম আলো তাঁর মুখের একদিকে এসে পড়েছে। যেন ছবি তোলার জন্য লাইট ঠিক করা আছে, ফোকাস আর অ্যাপরচার ঠিক করে শাটার চাপলেই অসাধারণ ছবি! প্রথমে ফাদার কিছু কাজের কথা সারলেন। খসরু ভাইয়ের (মুহাম্মদ খসরু) দেওয়া *ধ্রুপদী* আর নাইম হাসানের সম্পাদিত *নিরন্তর* প্রকাশনা দুটো সত্যজিতের হাতে তুলে দিলাম। নেড়েচেড়ে দেখলেন। বোম্বের বিখ্যাত সাউন্ড মিক্সার মঙ্গেশ দেশাই মারা গেছেন। তা নিয়ে খুব

বিচলিত আছেন বলে মনে হলো। বারবার বলছেন, 'কাকে দিয়ে আর মিক্সিং করব!'

তারপর তিনি একের পর এক প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। *ধ্রুপদী*র পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের ঢাকা টেলিভিশনে একটা নাটক দেখেছিলাম, অসাধারণ! *রক্তকরবী*, কে করেছেন?' আমি বললাম, 'মুস্তাফা মনোয়ার। আপনার কাজের একনিষ্ঠ ভক্ত।' 'ও, ওনার নাম শুনেছি, ভালো জলরঙের ছবি আঁকেন।' মনে আছে, দেশে ফিরে মুস্তাফা মনোয়ার ভাইকে যখন বলেছিলাম, তখন উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ভাবিকে ডাকলেন, বললেন, 'এই শুনেছ, আমার তো নোবেল পাওয়া হয়ে গেছে!'

দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, ঢাকার খোঁজখবর তেমন জানেন না। একসময় ঢাকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের মাধ্যম ছিল আমানুল হক, প্রখ্যাত আলোকচিত্রী। উনি কেমন আছেন, জানতে চাইলেন। রায়ের ওপর বিদেশে প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ে সত্যজিতের বেশ কিছু পোর্ট্রেট ও ওয়ার্কিং স্টিল আমানুল হকের তোলা। এরপর জানতে চাইলেন, তাঁর ছবিটবি বাংলাদেশে দেখানো হয় কি না? আমি বললাম, চলচ্চিত্র সংসদের সীমিত পরিসরে দেখানো হয়। তবে সম্প্রতি *জন-অরণ্য* ছবিটি সেন্সরে আটকে দেওয়ায় দেখানো যায়নি, বলতেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'চলচ্চিত্র সংসদেও ছবি দেখাতে সেন্সর অনুমোদন লাগে!' জানতে চাইলেন, কী কারণে আটকাল? আমি বললাম, ছবিটি পলিটিক্যাল বলে। সদা গম্ভীর মানুষটি হো হো করে হেসে উঠলেন। 'আমার ছবি পলিটিক্যাল!' কথাটার মধ্যে অভিমানের সুর ছিল। কলকাতায় দীর্ঘদিন থেকে সমালোচনা চলছিল, তাঁর ছবি ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের ছবির মতো যথেষ্ট রাজনীতি-সচেতন নয়। বললাম, তাঁর অরাজনৈতিক শিশু চলচ্চিত্র *হীরক রাজার দেশে* ঢাকায় কতখানি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ঢাকায় 'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান' কীভাবে 'দড়ি ধরে মারো টান, জিয়া হবে খান খান' হয়ে রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হয়েছিল, শুনে উনি অবাক হলেন!

আমন্ত্রিত হলে ঢাকা আসবেন কি না, জিজ্ঞেস করলে 'না না' করে উঠলেন। ৭২-এ পল্টনে তাঁর সংবর্ধনার কথা উল্লেখ করে বললেন, 'সে এক কাণ্ড! এই বুড়ো বয়সে ও ধকল সইবে না।' পরে শুনেছি, ঢাকার সংবর্ধনায় 'সত্যজিৎ রায় জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে একপর্যায়ে ছাত্ররা তাঁকে আক্ষরিক অর্থে মাথায় তুলেছিল। মনে পড়ে, ভিডিওতে কাজ করছি শুনে ভিডিও

ফরম্যাট সম্পর্কে অসম্ভব আগ্রহ নিয়ে অনেক কিছু জানতে চাইলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে কখন আটটা বেজে গেছে টের পেলাম না। মনে হলো, আমার ওঠা উচিত। দিপু অনুমতি নিয়ে সত্যজিতের সঙ্গে আমার ও ফাদারের কিছু ছবি তুলল। আমার হাতে আমাদের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান অডিওভিশনের যে ফোল্ডার ছিল, তাতে তাঁর শুভেচ্ছাসহ অটোগ্রাফ নিলাম। ফিরতে ফিরতে মনে হলো, একটা 'বুদ্ধিদীপ্ত' প্রশ্নও তাঁকে করতে হলো না, অথচ মানুষটি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম! আর কত চমৎকারভাবে আমাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে উনি কত কিছুই জেনে নিলেন।

তবে আমিও 'কুয়াশা' ছিলাম

আমার স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়নি। মাদ্রাসায় পড়েছি। মাদ্রাসায় তো ইংরেজি, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস—এ বিষয়গুলো ছিল না। আমি পড়েছি আরবি, ফারসি, উর্দু। উর্দু ছিল পরীক্ষার মাধ্যম। মিডিয়াম অব এডুকেশন যাকে বলে। এর পরের কাহিনি অনেক লম্বা। যা হোক, সত্তরের দশকের দিকে আমি এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছিলাম। কিন্তু ওটা খুব স্বল্প সিলেবাসে নামকাওয়াস্তে পরীক্ষা ছিল। এরপর আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে পড়াশোনা করি। আমি কলেজেও কোনো রকমে পাস করেছি, আবার সেই সেকেন্ড ডিভিশনে। কলেজ শেষ করে আমার খুব ইচ্ছা ছিল মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার, কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফল করিনি। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হই। ওই অর্থে আমি একাডেমিকভাবে পড়াশোনায় মনোযোগী ছিলাম না।

বিশেষ করে, ইতিহাস বিভাগের যে সিলেবাস, তারিখ, সাল—এসব নাম মুখস্থ করা, এই ইতিহাসচর্চায় আমার কোনো দিনই আগ্রহ ছিল না। আমার মনে আছে, যেসব সিলেবাস আমি লিখতাম, তা ছিল অনেক বিশ্লেষণধর্মী। আমার শিক্ষকেরা সব সময় বলতেন, 'এটা তো তোমাকে বলা হয়নি।' তথ্যের চেয়ে তথ্যের ব্যাখ্যাই আমাকে সব সময় আগ্রহী করেছে। সে জন্য তথাকথিত প্রথাসিদ্ধ যে ইতিহাসচর্চা, সেটা আমাকে কখনোই আকৃষ্ট করেনি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে পড়তে গিয়ে বুঝতে পারলাম, প্রথাগত একাডেমির যে ইতিহাসচর্চা, তা খুবই তথ্য ও সংখ্যাভিত্তিক। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে আমি বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসার সুযোগ

পেয়েছি। মুনতাসীর মামুন আমার শিক্ষক ছিলেন। আমি ভালো ছাত্র ছিলাম না। তার পরও প্রশ্রয় দিতেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম আমার শিক্ষক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আহমদ শরীফ। আমি তাঁর খুব ভক্ত ছিলাম।

তখন 'লেখক শিবির' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এর সঙ্গে জড়িত হয়ে যায় আমার সব সৃজনশীল মেধাবী বন্ধু। শামীম আখতার, পিয়াস করিম, আফসার আজিজ, আবরার চৌধুরী, কামরুল হক মিঠু—এমন আরও অনেকেই। যা হোক, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে লেখকদের একটি জোটের মতো হচ্ছিল, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হই আমিও। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে আহমদ ছফার সান্নিধ্য। তিনি বলে যাচ্ছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আর আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি। মাঝেমধ্যে এমনও হতো যে, চার-পাচ ঘণ্টা কথা বলে যাচ্ছেন লাইব্রেরি চত্বরে বসে। অথচ আমরা সবাই অনড় হয়ে বসে আছি। এমন আরও অনেকেই আমাদের অনুপ্রাণিত করতেন। যেমন, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু মাহমুদও আমাদের খুব প্রিয় ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল আহমদ ছফার সঙ্গে। কারণ, ছফা ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের একটা সুবিধা ছিল। অন্যদের সঙ্গে আমরা তেমন তর্ক করতে পারতাম না।

আমার মনে আছে, আমি ছফা ভাইয়ের সঙ্গে নিয়মিত যেকোনো বিষয় নিয়ে তর্ক করতাম। খুব জেনে-বুঝে যে করতাম, এমন নয়। তার পরও হুজ্জুতি করে হলেও তর্ক করার জন্য তর্ক করা যেত। উনি পছন্দ করতেন না, কিন্তু সহ্য করতেন; এবং কিছুটা হলেও এগুলো প্রশ্রয় দিতেন। একটি ইশতেহারের কথা মনে আছে। সমসাময়িক শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে প্রবণতা অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা—এ বিষয়ে আমরা প্রায় ১৪ জন লেখক, এর মধ্যে সলিমুল্লাহ খান প্রধান দায়িত্ব পালন করেছিলেন লেখাটি তৈরির ক্ষেত্রে। এবং সঙ্গে ছিলেন নুরুল হুদা থেকে অসীম সাহা—অনেকেই। আমরা ১৪ জন স্বাক্ষর করেছিলাম, আমি লেখক না হয়েও স্বাক্ষর করেছিলাম। ইশতেহারটিতে ষাটের দশকের অনেক বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে বেশ আক্রমণাত্মক সমালোচনা ছিল। ছাপার আগে আমরা ইশতেহারটি পড়িয়ে নিয়েছিলাম আহমদ ছফাকে। ওটা পড়ে তিনি আমাদের গাল দিয়েছিলেন। একটা কথা বলেছিলেন, 'তোমরা এখন উঠতি বয়সী লেখালেখির ক্ষেত্রে, এ সময় অগ্রজদের এভাবে খেপিয়ে তুললে তোমাদের ক্ষতি হবে।' তখন আমি কিছুটা বেয়াদবের মতো বলেছিলাম,

'উই ডোন্ট কেয়ার।' তখন তিনি আমাকে সাবধান করে বলেছিলেন, 'এই ছেলে, তুমি বিপদে পড়বে।'

অসত্য না থাকলেও একটু অতিশয়োক্তি ছিল আমাদের সমালোচনার ক্ষেত্রে, বয়স হওয়ার পর আমরা ঠিকই বুঝতে পেরেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই তখন বিভিন্ন মাধ্যম নিয়ে কাজ করত। আমি ছিলাম ফিল্ম নিয়ে। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ 'রাখাল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান করল। খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল আমাদের। ওদিকে শিশির ভট্টাচার্য্য, ঢালী আল মামুন, রুহুল আমিন কাজল, হাবিবুর রহমান, ওয়াকিলুর রহমান, আলিম হোসেন নোটন—সবাই তখন আর্ট কলেজের ছাত্র। ইতিহাসের ছাত্র হয়েও ওদের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ওই সময়টায় একটা ব্যাপার ছিল পারস্পরিক আদান-প্রদান। আমি আর্ট কলেজে এত নিয়মিত যেতাম যে অনেক ছাত্রছাত্রী আমাকে আর্ট কলেজের ভাবত। আর্ট কলেজের ছাত্রাবাসের ১২ নম্বর রুমটায় থাকত শিশির। ওখানে আমার অনেক রাত কেটেছে। ভিজ্যুয়াল আর্ট নিয়ে আমার আগ্রহ ছিল প্রবল। এ জন্যই সুলতানকে নিয়ে ছবি করা। আমার প্রথম ছবির বেলায় আহমদ ছফার একটা বিরাট অবদান ছিল। তেমনি সংগীতের প্রতিও আমার প্রচুর আগ্রহ ছিল এবং এর সঙ্গে জড়িত অনেক বন্ধুও ছিল। পুলক গুপ্ত, সঞ্জীব দে, সুমন, হ্যাপী আখন্দ, মাকসুদুল হক—এমন আরও অনেকে। সহপাঠীদের সঙ্গে আমার খুব একটা সময় কাটেনি, এটা আমার ব্যর্থতা। আমার যতটা না ইতিহাস বিভাগে কেটেছে, তার চেয়ে বেশি কেটেছে ইংরেজি ও স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগে। বুয়েটের ডরমিটরিতে আমি প্রায় এক বছর থেকেছি। বুয়েটের বাইরে যে কজন অনাহূত অবৈধ ছাত্র থাকত, তাদের একটা নাম ছিল, 'কুয়াশা'। এটা কেন, আমি জানি না। তবে আমিও 'কুয়াশা' ছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে চার-পাঁচ বছর আমার কেটেছে, এর পুরোটাই আমার কাজে লেগেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে যে ধরনের প্রস্তুতির দরকার, প্রকারান্তরে তা-ই ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের তোলা জলে আমার স্নান নয়।' আমার ওই বিশিষ্টতা নেই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করব, তবে আমি ঠিক উল্টো বলব। আমার যে শিক্ষা-দীক্ষা, তার পুরোটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে, কিন্তু ক্লাসের ভেতরে নয়, ক্লাসের বাইরের ক্যাম্পাসে। কারণ, সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডাগুলো খুবই সৃজনশীল ও শিক্ষামূলক হতো। এখন কেমন হয়, জানি না। আমার মনে

হয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দিনের আড্ডাও আমার বৃথা গেছে। আমার মাদ্রাসার জীবন ছিল খুবই নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত—ভোর চারটা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সবকিছু পরিপাটি ও সাজানো। এ কারণেই কি না জানি না, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়টা খুবই বাউন্ডুলেপনা ও বোহেমিপনার ভেতর দিয়ে কেটেছে। যে ধরনের কাপড়চোপড় আমি পরতাম, জানি না এখনকার ছাত্রছাত্রীরা সে সাহস করবে কি না। আমি একেবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে এসেছি। আমার চাচাদের ও চাচাতো ভাইবোনের আর্থিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আমার সময় কেটেছে। থাকতামও চাচাতো ভাইদের সঙ্গে। দারিদ্র্য ও অর্থাভাবেই কেটেছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়। এক বেলা খেতে পারিনি—এমন অনেক সময় হয়েছে, কিন্তু সেটা আমল করিনি। কোনো না কোনোভাবে ঠিকই চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমার প্রাপ্তি অনেক। এখনো কখনো যদি যাই, খুবই নস্টালজিক অনুভূতি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন নিয়ে একটি সিনেমা বানানোর স্বপ্ন দেখি আমি। সত্তরের দশকের পটভূমিতে ওই সময় যে হিপ্পি টাইপ লম্বা চুল, বেলবটম প্যান্ট, এমনই লুক-এ। অর্থাৎ ওই সময়ের জীবনকে ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটা সিনেমায় একটা গল্পের মধ্য দিয়ে বলা। কারণ, এরাই তো সিনেমার বিরাট দর্শক। এদের নিজেদের জীবন তো এরা নিজেরা দেখতে পায় না।

স্মৃতিতে অম্লান আলমগীর কবির

আমি নিজেকে বিশেষভাবে গৌরবান্বিত মনে করি, কারণ কবির ভাইকে আমার কিশোর বয়স থেকেই কাছে থেকে দেখার ও জানার সুযোগ হয়েছে। তিনি আমার চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রীর বড় ভাই। সে কারণেই পারিবারিকভাবে তাঁকে জানা ও পরে চেনা হয়। এ ছাড়া চলচ্চিত্র সংসদকর্মী হিসেবে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমার প্রথম ছবি *আদম সুরত* করতে গিয়ে আমি তাঁর সরাসরি সাহায্য পেয়েছি। প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের আমি সমন্বয়কারী ছিলাম। দেড় থেকে দুই বছর প্রস্তুতি নিয়ে উৎসবটা হয়েছিল। সেই উৎসবের চেয়ারম্যান ছিলেন আলমগীর কবির। এই দেড় থেকে দুই বছর একজন সহকর্মী হিসেবে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। ফিল্ম আর্কাইভসে যে বিখ্যাত কোর্স, যেখান থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, সেই কোর্সের শিক্ষক হিসেবে আলমগীর কবিরকে পেয়েছিলাম আমরা।

একজন শিক্ষক হিসেবে, একজন সহকর্মী হিসেবে, একজন স্নেহধন্য আত্মীয় হিসেবে, তাঁর ছবির একজন দর্শক হিসেবে এবং একজন চলচ্চিত্র সংসদকর্মী হিসেবে তাঁর কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ পেয়েছি আমি।

জানতাম, আলমগীর কবির আমার আত্মীয়, কিন্তু পরিচয় ছিল না। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর *ধীরে বহে মেঘনা* ছবির কাজ শেষ করেছেন। তাঁর একটা ব্যাপক পরিচিতি আছে। জহির রায়হানের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে *স্টপ জেনোসাইড* তৈরি করেছেন। খুব সম্ভবত '৭৩ সালে আমি তাঁকে প্রথম দেখি। স্বভাবত আমি খুব ভীত ছিলাম। আমি তখন গ্রাম থেকে এসেছি, মাদ্রাসা থেকে এসেছি। শহরে একটা কো-অ্যাড কলেজে পড়ছি। চাচাতো

ভাই শহীদুর রহমান শহীদ ও খুকু ভাবির ক্যান্টনমেন্টের বাসায় থাকি। প্রায় প্রতিদিনই খাবারের টেবিলে বা অন্য কোনো আড্ডায় ভাবির মুখে আমি আলমগীর কবিরের কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। ভাবি তাঁর ভাইকে নিয়ে অবসেসড ছিলেন। আলমগীর কবিরের বোনেরা তখন আলমগীর কবিরকে নিয়ে গর্বিত ছিলেন। এভাবেই আলমগীর কবির সম্পর্কে আমার মধ্যে অতিমানবীয় একটা ধারণা হয়েছে। খুব সম্ভবত আজিমপুরে তাঁর বাড়িতে খুকু ভাবির সঙ্গে গিয়েছিলাম। তাঁর সম্পর্কে শুনে, তাঁর ছবি দেখে একধরনের সমীহ তৈরি হয়েছিল। তারপর তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর অবয়ব—সব মিলিয়ে ইন্টিমিটেটেড হওয়া। যে গ্রাম থেকে এসেছে, মাত্র কলেজে পড়ে, যে অবাক বিস্ময়ে চলচ্চিত্রমাধ্যমটাকে আবিষ্কার করছে, চলচ্চিত্র সংসদকর্মী হিসেবে কেবল কাজকর্ম শুরু করেছে—সেখানে এ রকম একজন ব্যক্তির কাছাকাছি হওয়াটা যেমন ইন্টিমেডিটিং, একই সঙ্গে ইলিউমিনেটিং। কিছুটা ভীতিকর, কিছুটা আলোকিত হওয়ার মতো।

তাঁর বাড়িতে যেদিন গেলাম, সেদিন আমার একটি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হয়। আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমার মনে হয় সেই দিনের ঘটনাটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেছে। সেদিন তিনি একটি রুম থেকে বেরিয়ে এসে রাশভারী কণ্ঠে বললেন, 'এই শোনো, তুমি এই দিকে এসো' বলে তিনি আমাকে সেই রুমে নিয়ে গেলেন। একটু ভ্যাবাচেকা খেলাম। দরজা-জানালা সব বন্ধ। জানালা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। তিনি আমাকে বসতে বললেন। তারপর একটা যন্ত্র অন করলেন। ১৬ মিলিমিটার প্রজেক্টর। তিনি বললেন, 'এবার দেখো।' আমি দেখলাম। একটা অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। সেটি হচ্ছে *পথের পাঁচালী*। এটা আমাকে দেখানোর জন্য নয়, অন্য কাউকে দেখানোর জন্যও নয়। উনি ইতিমধ্যে ছবি নির্মাণ করেছেন। চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সেই মানুষটি একটি ১৬ মিলিমিটার প্রিন্ট সংগ্রহ করে স্টাডি করছেন *পথের পাঁচালী*। হয়তো অনেকবার দেখেছেন। সেই স্টাডির অংশ হিসেবে একটা তরুণ বয়সের ছেলেকে ছবিটি দেখানো, যার হয়তো ১০০ ভাগের এক ভাগও সম্ভাবনা নেই চলচ্চিত্রে আগ্রহী হওয়ার। তাঁর যে তরুণ প্রজন্মের প্রতি আলাদা মনোযোগ ছিল, তার প্রকাশ ছিল এটি। অভিজ্ঞতাটা আমার জন্য ছিল অবিশ্বাস্য। এখনো।

আমি মাদ্রাসায় থাকতে সিনেমা চিনতাম না। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, গতানুগতিক কুশিক্ষা থেকে বেঁচে গেছি আমি। আমি ভালো-মন্দ কোনো সিনেমা দেখিনি। *পথের পাঁচালী* আমাকে দুটি কারণে বিস্মিত

করেছে। একটি ছবি কী করে আমার জীবনের এত কাছাকাছি হতে পারে। অপু লাজুক, ভীরু একটা ছেলে। আমিও তা-ই ছিলাম। আমার বড় বোন দুর্গার মতো চঞ্চল, যে জীবনকে ভালোবাসে। ঠিক আমার উল্টো। বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াত। ঠিক দুর্গার পরিণতি আমার বোনের হয়েছে। আমার বাবা হরিহরের মতো আত্মভোলা মানুষ। কিছুটা দায়িত্বহীন স্বামী বা বাবা। *পথের পাঁচালীর* সঙ্গে অদ্ভুত মিল আমাদের সংসারের। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* অনেকেই আগে বই হিসেবে পেয়েছে, তারপর ছবিটা দেখেছে। আজকাল হয়তো এই প্রজন্ম ছবিটাই আগে দেখে। আগে পড়া থাকার কারণে *পথের পাঁচালী* ছবিটি গল্পের মুগ্ধতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে। কিন্তু মাদ্রাসায় পড়ার কারণে গল্পটি আমি আগে পড়িনি। যদিও আমি তখন প্রথম বর্ষের ছাত্র। তাই সেদিন ছবিটি দেখাটা ছিল আমার জন্য দ্বিগুণ প্রাপ্তি। আমি ওই দিন *পথের পাঁচালী* ছবি ও উপন্যাস একসঙ্গে আবিষ্কার করলাম। আবিষ্কার করলাম আলমগীর কবিরকে। আমি ১০ বছর চলচ্চিত্রে যা অর্জন করতে না পারতাম, সেই স্কুলিং সেদিন আলমগীর কবিরের কল্যাণে আমার হয়ে গেল।

তারপর অনেক বছর। সম্ভবত সত্তরের দশকের শেষ বা আশির দশকের শুরুর দিকে চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক হিসেবে আলমগীর কবিরকে পেয়েছি আমি। কিন্তু তার চেয়ে বড় অর্জন হয়েছে আমার সেই প্রথম দিনেই। সেই থেকে কবির ভাই সম্পর্কে আমার মধ্যে একটা সমীহ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা গড়ে ওঠে। যে মানুষটি শুধুই ভয়ের নয়। তারপর আমি সক্রিয় চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে আকৃষ্ট হই। পরে আমরা নিজেরা একটি চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে তুলি। পাশাপাশি তার ঢাকা সিনে ক্লাবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। তিনি 'চলচ্চিত্রকার' নামে একটি সংগঠন করেছিলেন। তাতেও পরোক্ষভাবে আমার সংযুক্তি ছিল। তার চেয়ে বড় কথা, ব্যক্তি আলমগীর কবিরের কাছাকাছি হওয়ার, আলোকিত হওয়ার সুযোগ, তা তো নিয়মিত ছিলই।

তবে একটা বড় গ্যাপ ছিল এই আত্মীয়তার সম্পর্কটির ক্ষেত্রে। কখনোই আমরা বিষয়টি নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনার সুযোগ পাইনি। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর খুব কাছাকাছি হই ফিল্ম আর্কাইভস থেকে প্রশিক্ষণ শেষে, যখন এস এম সুলতানের ওপর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ করা শুরু করি। তাঁর একটা ১৬ মিলিমিটারের ক্যামেরা ছিল, যা তিনি ভাড়া দিতেন। আমার এ প্রকল্পের আর্থিক অসংগতির কথা ভেবেই হোক বা আত্মীয় বলেই হোক, আমি বিনা ভাড়ায় ওই ক্যামেরাটি তাঁর কাছ থেকে পেতাম। স্বল্পদৈর্ঘ্য

চলচ্চিত্র যেভাবে নির্মাণ হয়, ধরুন ২৫ মিনিটের একটি ছবি, হয়তো ১৫ দিন শুটিং হলো—আমার ক্ষেত্রে এ রকম নয়। আমি বছরের পর বছর শুটিং করেছি। বিনা ভাড়ায় ক্যামেরা পাচ্ছি, তাই হাত পাকানোর সুযোগটা কাজে লাগাতাম। সুলতানকে নিয়ে কত মেলায় চলে গেছি আমি আর মিশুক! এই প্রশ্রয়টা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া।

আমি *আদম সুরত* ছবির ইংরেজি ধারাভাষ্যের জন্য কাউকে খুঁজছিলাম। *স্টপ জিনোসাইড*-এ আলমগীর কবির যে ধারাভাষ্য পাঠ করেছিলেন, এর কাছাকাছি আর কোনো ধারাভাষ্য হতে পারে না। আমি খুব ভয় ও দ্বিধায় আলমগীর কবিরকে প্রস্তাবটি দিলাম। উনি খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজি হলেন। সে বছর প্রচণ্ড বন্যা হয়েছিল। '৮৮ সাল। তিনি মালিবাগে এক বোনের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর শ্যামলীর বাসায় পানি আগেই উঠেছে। তাঁর বোনের ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেও পানি ওঠে। ধানমন্ডিতে 'প্রশিকা'র একটি স্টুডিও সবে চালু হয়েছিল। সেখানে আমার রেকর্ডিং। পুরো শহর পানির নিচে। আমি কবির ভাইকে ফোন করে বললাম, 'আজ রের্কডিং ছিল। এই অবস্থায় তো সম্ভব না, আমি ক্যানসেল করি।' তিনি বললেন, 'আজ পেছালে তুমি আরও ঢিলেমি করার সুযোগ পাবে। সে সুযোগ আমি তোমাকে দেব না। আমি আসছি।' তিনি সেই পানি ভেঙে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট ভিজিয়ে এলেন। উনি বললেন, 'আমি তিনভাবে পড়ি, তুমি কোনভাবে নেবে চুজ করে নাও।' আমি ধারাভাষ্যের জন্য যে ইংরেজি লিখে এনেছিলাম, আমি নিশ্চিত সেটা খুব দুর্বল ইংরেজি ছিল। কিন্তু উনি শিল্পকর্মকে শ্রদ্ধা করতেন, স্বাধীন ও নির্মাতার জিনিস বলে মনে করতেন। তিনি কোথাও পরিবর্তন না করে তিনভাবে পড়লেন। একটা আমেরিকান ঢঙে, একটা ব্রিটিশ ঢঙে, একটা উপমহাদেশীয় ঢঙে। আমি প্রথমটাই রাখলাম।

দুই

যখন একটি ছবি আমি শেষ করি, সেই ছবি নিয়ে অনেক সংগ্রাম হয়, অনেক কষ্ট হয়, সেন্সর বোর্ডে হয়রানি হতে হয়। তখন প্রচণ্ডভাবে আলমগীর ভাইয়ের অনুপস্থিতি অনুভব করি। আবার তাঁর উপস্থিতিও অনুভব করি। আমি জানি, আলমগীর কবির হলে আমাদের ওই লড়াইটায়, ওই হয়রানিটায় উনি অভিভাবকের মতো সাহস দিতেন, ছায়া দিতেন। আবার আলমগীর কবির যেভাবে শক্ত থাকতেন, দৃঢ় থাকতেন, সেই জিনিসটা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। শিল্পের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের

প্রতিবন্ধকতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তিনি মোকাবিলা করতেন দৃঢ়তার সঙ্গে। যা হোক, *আদম সুরত* ছবিটি যখন প্রদর্শনের পর প্রশংসিত হয়, তখন আফসোস হয় ছবিটি আলমগীর ভাইকে দেখাতে পারলাম না বলে। আমার মনে হয়, আফসোসটা তানভীর ও মোরশেদুল ইসলামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আদম সুরত ছবিটি আলমগীর কবিরকে উৎসর্গ করেছি, যে ছবির পেছনে তাঁর এত অবদান! আমার প্রথম ছবি। কিন্তু ছবিটি তাঁকে দেখাতে পারলাম না। তার আগেই তিনি মারা গেলেন। *মুক্তির গান* করার পর সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন আলমগীর কবির। এ ছবি নিয়ে যখন সেন্সরে ঝামেলা হচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল, বেঁচে থাকলে আলমগীর কবির পাশে এসে দাঁড়াতেন। এই অনুভূতি হয়েছে *মাটির ময়না* নিয়েও। যখন বিপদে পড়েছি, অসহায় বোধ করেছি, সে সময় অনেকের সমর্থন পেয়েছি, অনেকে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সাংবাদিকেরা এসেছেন, চলচ্চিত্রের বন্ধুরা এসেছেন। কিন্তু ততটা আশ্বস্ত বোধ করিনি। কোথাও যেন একা বোধ করেছি। মনে হয়েছে, কী একটা সমর্থন আমার প্রাপ্য ছিল এবং সেটা আমি পাচ্ছি না। সেটা আসলে ব্যক্তি আলমগীর কবিরের সমর্থন। ছবিটি নিয়ে অনেকেই লিখেছেন, যাঁদের আমি নমস্য মনে করি। অনেকে লিখেছেন, দেশের বিরুদ্ধে কিছু থাকলে, ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু থাকলে তা কেটে বাদ দিয়ে ছবিটা ছেড়ে দেওয়া হোক। আলমগীর কবির কিন্তু এটা করতেন না, তিনি দর্শকের অধিকার ও শিল্পীর অধিকার—দুটোর প্রতিই দৃঢ় থাকতেন। এই-ই আলমগীর কবির। নতুন প্রজন্মের যাঁরা, তাঁরা জানেন না, তাঁরা কী মিস করছেন! নির্মাতা আলমগীর কবিরের ছবিগুলো আমরা দেখেছি। ছবিগুলো দ্বারা আমরা নিজেরা প্রভাবিত হয়েছি। কারণ, তিনি তথাকথিত বাণিজ্যিক ফর্মুলার বাইরে কাজ করতেন। প্রকরণ, আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষা করতেন। তিনি যে শুধু সমসাময়িক চলচ্চিত্রের পাঠক বা তাত্ত্বিক ও সমঝদার ছিলেন, তা নয়। তিনি তাঁর শিক্ষাটা নিজের কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। আমরা অনেকেই চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক দিকটা জানি, কিন্তু আমরা যখন ছবি নির্মাণ করি, তখন খুবই সেকেলে কাঠামোর ছবি তৈরি করি। আলমগীর কবির কিন্তু ক্রমাগতভাবে নিজেকে উত্তরণ করতেন, আপগ্রেড করতেন। তাঁর প্রাণশক্তির তাড়নায় তিনি ততটাই উদ্দীপ্ত থাকতেন। তিনি ছবি বানিয়ে যেতেন। আমি তাঁকে চলচ্চিত্রের একধরনের বাউল বলব। তিনি কোনো ছবি ইনকমপ্লিট রাখতেন না। তিনি প্রাণের আনন্দে কাজ করতেন। কিছু একটা বলা এবং নতুনভাবে বলা।

চলচ্চিত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের কাছে একটা বিরাট মিথ। একজন এজিটেটর। মেকিংয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর এজিটেটিং রোল ছিল। শুধু একটা ক্যাম্পেইন, শুধু রাজনৈতিক বক্তব্যের ক্ষেত্রেই নয়, ছবি বানাতে গিয়ে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে একটা স্টেটমেন্টও দিতেন। সেটা পরিশীলিত শিল্পের হলো কি না হলো, তা নিয়ে হয়তো তোয়াক্কা করতেন না। একজন চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে এটা তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ। তিনি নিজের পুনরাবৃত্তি নিজে কখনো করেননি। *ধীরে বহে মেঘনা* এক রকম ছবি, আবার *সূর্যকন্যা* আরেক ধরনের ছবি। *সীমানা পেরিয়ে* অন্য রকম। *রূপালী সৈকতে* আরেক ধরনের ছবি। শেষ দিকে তিনি *মনিকাঞ্চন* করেছিলেন। আমি বলব শিং ভেঙে বাছুরদের দলে যোগদান করা, যা করতে বিরাট একটা বুকের পাটা লাগে। একধরনের শৈল্পিক সাহস লাগে। শুধু রাজনৈতিক বা ব্যক্তিমানুষের সাহস নয়। তিনি ছোটদের দলে নামলেন কথাটা একটু স্পর্ধার ও ঔদ্ধত্যের শোনাবে। আমি খুব বড় গলায় বলতে চাই, আলমগীর কবির আমাদের সব সময় অনুপ্রাণিত করছেন। তাঁর মধ্যে তরুণ প্রজন্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার ক্যাপাসিটি ছিল। তাঁর জীবনের শেষ কয় বছর আমার মনে হয় তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছি। তরুণদের পালস ফিল করা শুধু নয়, তাদের অ্যাপ্রিশিয়েট করা, তাদের কাছ থেকে শেখা—এটা আমরা পারি না। আমরা দরজা বন্ধ করে রাখি। এটা কিন্তু মহান শিল্পীরা কখনোই করেন না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন দত্তের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিয়েছেন। তিনি জানতেন, এই নেওয়ার মধ্যে তাঁর কৃতিত্ব আছে, হীনতা নেই। আলমগীর কবিরও তেমনই ছিলেন।

নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তো আমরা অনেকেই চেয়েছি। নেতা বলুন আর আদর্শ বলুন, নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমরা অনেকের কাছে গিয়েছি। এক ঝাঁক নির্মাতা ছিলেন। তাঁর থেকে তরুণতর, আবার আমাদের থেকে অগ্রজ। আমরা কাউকে পাই না। আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না। আমি আলমগীর কবিরকে দেখি একজন চলচ্চিত্র-আন্দোলনের নেতা হিসেবে। তাঁর আরেকটি পরিচয় আমার কাছে সবচেয়ে বড় ও ঈর্ষণীয়। আমি মনে করি, বাংলাদেশের আর কোনো নির্মাতা তখন ও এখন, যে প্রজন্মেরই হোক, তার পর্যায়ে পৌঁছতে পারেননি। তা হলো ফিল্ম ক্রিটিসিজম। চলচ্চিত্রবিষয়ক লেখালেখি। চলচ্চিত্রবোদ্ধা, সমালোচক, চলচ্চিত্রের ইতিহাসবিদ, চলচ্চিত্রের কারিগর হিসেবে অনেককেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সবকিছু এক ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। এজিটেটর

আলমগীর কবির, নির্মাতা আলমগীর কবির, শিক্ষক আলমগীর কবির, যদিও ফিল্ম ক্রিটিকস হিসেবে ছিল তাঁর অনবদ্য পরিচয়। আমি তাঁর লেখার ঘনিষ্ঠ পাঠক। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আমরা তাঁর কাছাকাছি কোনো দিন পৌঁছতে পারব না। শুধু চলচ্চিত্র সম্পর্কে নয়, দর্শন, রাজনীতিসহ বিচিত্র বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। একটা জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য যা যা রসদ দরকার, তা আলমগীর কবিরের মধ্যে ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিকল্প কেউ আসেনি। ভবিষ্যতে কবে আসবে, আমি জানি না। যেটা জহির রায়হানেরও ছিল না। একজন পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন আলমগীর কবির। আমার মনে আছে, ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম* ছবিটির একটি কঠোর সমালোচনা লিখেছিলেন—এটা ঔদ্ধত্য হতে পারে, এটা খুব বেশি একপেশে মনে হতে পারে। যখন ঋত্বিক ঘটক একদম শীর্ষে, ওই সময় এত আক্রমণাত্মকভাবে তাঁর ছবি সম্পর্কে লেখার সাহস আলমগীর কবিরের ছিল। তিনি যে পত্রিকাগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন। আমরা জানি, ষাটের দশকের শেষে তিনি ফিল্ম ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছিলেন। তিনি অগ্রগামী বহু ক্ষেত্রে।

তিন

আমার অন্যতম প্রাপ্তি আলমগীর কবিরের সঙ্গে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উদ্‌যাপন। আমি দাবি করব, উৎসবটির পরিকল্পনা, রূপরেখা তৈরি—সবকিছুই ব্যক্তিগতভাবে আমার। ওই সময় যাঁরা আমার সাথি ছিলেন, তাঁরাই এর সাক্ষী। আমরা ওই উদ্‌যাপন কমিটির আলংকরিক চেয়ারম্যান হিসেবে আলমগীর কবিরকে মনোনীত করেছিলাম। কারণ, আমাদের নানা রকম রসদ দরকার, রিসোর্স দরকার। কিন্তু আলমগীর কবির প্রথমে প্রস্তাবটিতে রাজি হননি। বলেছেন, 'আমি ঠোঁটকাটা মানুষ, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমার অনেক শত্রু আছে। তাই আমাকে রাখলে প্রোগ্রামটি সফল হবে না। তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' তিনি আরেকজন চলচ্চিত্রনির্মাতা, যিনি চলচ্চিত্রসংক্রান্ত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বড় দায়িত্বে ছিলেন, সেই সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকির নাম প্রস্তাব করে বললেন, 'তাঁকে নিয়ে লাভবান হওয়া যাবে।' শেষ পর্যন্ত আমরা জাকি ভাইকে পাইনি। আমরা আবার তাঁর কাছে যাই।

তিনি তখন আমাদের ফেরাননি। এরপর আমার সেই ঐতিহাসিক

অভিজ্ঞতা। প্রায় দুই বছর তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়া। '৮৬ সালে আমরা যখন শর্ট ফিল্ম ফোরাম গঠন করলাম, সেই ফোরামের প্রথম প্রকল্পেই ছিল এই চলচ্চিত্র-উৎসব আয়োজন। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র কী? এটা খায় না মাথায় দেয়—এটি দেশবাসীকে জানিয়ে দিতে হবে। এর যে বিচিত্র বৈভব আছে, কত রকম হয়। ডকুমেন্টারি, অ্যানিমেশন, ফিকশন, শর্ট ফিল্ম, এক্সপেরিমেন্টাল—কত রকম কাজ হয়েছে। নরম্যান ম্যাকলারেন থেকে শুরু করে বার্ড হানস্ট্রা, জিগা ভের্তভ থেকে শুরু করে রবার্ট ফ্লাহার্টি—এঁদের বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারের সম্মিলন ঘটানোর জন্য হবে উৎসব। উৎসবটি '৮৭ সালে করার কথা ছিল। বন্যার কারণে করা হলো না। এটি শাপে বর হলো। এত বড় আয়োজনের প্রস্তুতির জন্য আরও কিছু সময়ের দরকার ছিল। আমরা আরও সময় পেলাম। বলা যায়, ২৪ ঘণ্টা কাজ করেছি টানা ছয় মাস। ছোট একটা রুমে আমাদের অফিস ছিল। টেবিলটা বেশ বড় ছিল। সেখানে ঘুমাতাম। সেই মহাযজ্ঞে আলমগীর কবির মহীরুহের মতো হয়ে এসেছিলেন। তিনি কখনো তাঁর ব্যক্তিত্ব বা তাঁর ধারণা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। সিদ্ধান্তগুলো আমরাই নিতাম। কবির ভাই এ ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দীপ্ত করতেন। সেই সময় আমি তাঁর ভেতরে যে ডায়নামিজম, তাঁর যে গতিময়তা, তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করলাম। আমাদের চেয়ে কোনো দিক দিয়েই তিনি কম না। এর এক বছর আগে তিনি মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচে এসেছেন। তাঁর এমন অসুখ হয়েছিল যে তিনি রীতিমতো শীর্ণকায় মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। লন্ডনে পাঠানোর কারণে হয়তো বেঁচে গিয়েছিলেন। সবাই ক্যানসার মনে করে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তিনি ফিরে এসে যেন নতুন জীবন শুরু করলেন। আমাদের মতো তরুণদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তো এই অভিজ্ঞতাটা আমার জন্য খুবই আনন্দের ও গর্বের। সেই আলমগীর কবিরের সঙ্গে আমি কাজ করেছি।

এখনকার তরুণ প্রজন্ম যেমন আমাদের অনেকের সঙ্গে কাজ করেছে সহকারী হিসেবে। আমাদের কাছ থেকে শিখেছে, আমাদের কাছ থেকে ভুলও শিখেছে। আমরা কোর্স করেছি, ওয়ার্কশপ করেছি বটে, আমরা কোনো অভিজ্ঞ নির্মাতার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাইনি। আলমগীর কবির একমাত্র নির্মাতা ছিলেন, যাঁর কাছ থেকে আমরা শিখতে পারতাম। কিন্তু এতই সমীহ করতাম, ভয় পেতাম যে তাঁর সহকারী হওয়ার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। সেই মানুষটির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক এবং সুহৃদ একজন মানুষ, যাঁর সঙ্গে তর্ক করা

যায়, ঝগড়া করা যায়, খেপে যাওয়া যায়। মনে আছে, কোনো বিষয়ে হতাশ হলে তিনি আমাদের শক্তি জোগাতেন, আশার আলো দেখাতেন। তিনি বলতেন, 'শোনো, যদি চলচ্চিত্রনির্মাতা হতে চাও, তবে গন্ডারের মতো চামড়া করতে হবে। আমাকে দেখো না?' তখন তিনি ক্যান্টনমেন্টে আমার সেই ভাইয়ের বাসায় থাকতেন। আমার মনে আছে, প্রতিদিন এক গাদা চিঠি নিয়ে তাঁর স্বাক্ষর নিতে যেতাম। দেখতাম, তিনি টাইপরাইটারে অনবরত লিখে যাচ্ছেন। আমি দু-একটা পড়ে দেখতাম। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর চলচ্চিত্র সম্পর্কে না জেনে পত্রপত্রিকায় যেসব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে, তার প্রতি-উত্তর লিখে যাচ্ছেন তিনি। আক্রমণাত্মক সেসব উত্তর।

আমি বলি, 'কবির ভাই, এগুলো করে আপনি সময় নষ্ট করেন কেন? আপনি আপনার কাজগুলো করেন।' তিনি বলতেন, 'তোমাকে টিকে থাকতে হলে এসব রণকৌশল থাকতে হবে। তুমি সরলতা নিয়ে চলচ্চিত্রমাধ্যমে টিকে থাকতে পারবে না।' এ ধরনের অনেক বাস্তব শিক্ষা আমি কবির ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি।

সবচেয়ে বড় কথা, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চিত্রটা পুরো পাল্টে দিতে পারতেন যিনি, তিনি জহির রায়হান। তাঁর একটা ট্র্যাজিক মৃত্যু হলো। জাতি একটি শৈল্পিক চলচ্চিত্র কাঠামো থেকে বঞ্চিত হলো। তাঁর সেই ভিশন ছিল, তাঁর সেই শক্তি ছিল। তাঁর সেই ক্ষমতা ছিল। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বোঝাতে সক্ষম হতেন যে, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থাকে প্রকৃত অর্থে একটা বিপ্লবী চলচ্চিত্র সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এবং তা আলমগীর কবিরকে সঙ্গে নিয়েই তিনি করতেন। তাঁর একজন যোগ্য সাথি ছিলেন আলমগীর কবির। আলমগীর কবির আমাকে সব সময় বলতেন, 'আমাদের আত্মশ্লাঘায় ভুগলে চলবে না। আমি কখনোই এমন আত্মতুষ্টিতে ভুগি না যে আমি সাংঘাতিক ছবি বানিয়ে ফেলেছি। আমি মনে করি, ঐতিহাসিকভাবে দুটি দায়িত্ব আমাদের কাঁধে পড়েছে—এক. সৃজনশীল চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যাওয়া, দুই. চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যাওয়া। অর্থাৎ গ্রাউন্ড ওয়ার্ক।' আলমগীর কবির খুব পরিষ্কার জানতেন, এই গ্রাউন্ডওয়ার্কের কাজটি চলচ্চিত্রনির্মাতা ছাড়া অন্য কেউ করে দিয়ে যাবে না। সেটা আমাদের আমলারা করে দেবে, বুদ্ধিজীবীরা করে দেবে, রাষ্ট্র করে দেবে এবং সেখানে আমরা চলচ্চিত্রনির্মাতারা ধান বুনব, চমৎকার ধানের ফসল হবে—এটা যে হবে না, আলমগীর কবির জানতেন। এ কাজটি চলচ্চিত্রনির্মাতাদেরই করতে হবে।

জহির রায়হান ও আলমগীর কবির—এ দুজন মিলে যে কাজ করার কথা ছিল, তা একজনের ঘাড়ে এসে পড়েছে। আলমগীর কবির যদি একজন সৃজনশীল নির্মাতা হিসেবে শুধু চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোযোগ দিতেন, আমি মনে করি, তিনি এককভাবে একজন মহান ও আরও বড় মাপের চলচ্চিত্রনির্মাতা হতে পারতেন। তাঁর সেই সামগ্রিক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের চেয়ে সামাজিক তাগিদের কাছে নতি স্বীকার করেছেন তিনি। জাতির দুর্ভাগ্য, নিজের সৃষ্টিশীলতাকে সেকেন্ডারি করে সামাজিক, রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চলচ্চিত্রমাধ্যমটিকে দাঁড় করানোর জন্য যিনি সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারতেন, তাঁরও ট্র্যাজিক মৃত্যু হলো। আমার মনে হয়, কিছু কিছু জাতি আছে, যারা অমৃত সম্ভাবনাময়। কিন্তু ট্র্যাজেডির যে চরিত্র, সেটা হচ্ছে অসম্ভব সম্ভাবনাময় অথচ সামান্য একটি ছোট জায়গায় সেই বিরাটত্বের থমকে যাওয়া। এটা একটা জাতিরই বৈশিষ্ট্য। আমাদের জাতির নিয়তি কি না, জানি না। আমরা বঙ্গবন্ধু থেকে জহির রায়হান, আলমগীর কবিরকে হারিয়েছি। যিনি একজন চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে যখন উপযোগী হয়ে ওঠেন, প্রডিউসাররা তাঁকে বিশ্বাস করে টাকা দেন, শিল্পীরা তাঁর নির্দেশ মানে—এই আস্থাটা তৈরি করতে করতে ৫০ বছর বয়স পার হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। ২৫ বছরে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব নয়। এমনকি ৩৭ বছরে সত্যজিৎ রায়ের দ্বারা যা সম্ভব হয়েছিল, সেই পরিবেশ এখানে এখনো গড়ে ওঠেনি। এই ৫০ বছর বয়সে যখন একজন চলচ্চিত্রনির্মাতা পৌঁছান, তখন তাঁকে বিচিত্র কারণে চলে যেতে হয়। চলচ্চিত্র তথা নিজের অস্তিত্বের জন্য কাঠখড় পোড়াতে গিয়ে তিনি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে পারেন না। আমি এর ব্যত্যয় দেখিনি। আলমগীর কবিরেরও সেই পরিণতি হলো। এই বহুমুখী প্রতিভাধর মহান ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে কখনোই উপেক্ষা করা যাবে না।

'কর্ণফুলীর কান্না' : কাঠমান্ডু ও কাণ্ডজ্ঞান

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান উৎসব 'ফিল্ম সাউথ এশিয়া'য় (এফএসএ) বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও আফগানিস্তান থেকে আসা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তৈরি ৪৩টি প্রামাণ্যচিত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার বাইরের বেশ কিছু ছবিও দেখানো হয়। জুরি বোর্ডের সভাপতি হিসেবে এই অঞ্চলে নির্মিত সাম্প্রতিক প্রামাণ্যচিত্রগুলোর শক্তি ও প্রাচুর্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার গৌরব ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে জন্ম নেওয়ার পর থেকে 'ফিল্ম সাউথ এশিয়া' তার নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে প্রাপ্য খ্যাতিই পেয়ে এসেছে। এই কৃতিত্বের দাবিদার নেপালের তুলনামূলক নিরপেক্ষ অবস্থান এবং আয়োজকদের সততা ও দক্ষতাও। উপমহাদেশের সব দেশকে সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়ার মধ্যেই এফএসএর বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতিফলন টের পাওয়া যায়। এটা খুব সহজ কাজ নয়, যেখানে অসমভাবে বৃহৎ ও ক্ষমতাবান ভারতের অংশগ্রহণ রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে একজন সভাপতি, পাকিস্তান থেকে আরেকজন জুরি নির্বাচন করা এবং একজন নেপালি কোনো একজন প্রতিনিধিকেও না রাখাটা নেপালি আয়োজকদের উদারতার বহিঃপ্রকাশই শুধু নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্য আয়োজক দেশগুলোর জন্যও একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এ বছরের উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্যচিত্র—তানভীর মোকাম্মেলের *কর্ণফুলীর কান্না*, ইয়াসমিন কবিরের *আ সার্টেইন লিবারেশন* এবং শাহীন দিল-রিয়াজের *হ্যাপিয়েস্ট পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড*। শেষোক্ত ছবিটি লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের একটি গবেষণার

পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত, যে গবেষণায় বের হয়ে এসেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষদের বসবাস বাংলাদেশে। *আ সার্টেইন লিবারেশন* আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিপর্যস্ত মানুষদের প্রতি একটি অনন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি, আর *কর্ণফুলীর কান্না* পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নিয়ে একটি সুচিন্তিত বিশ্লেষণ।

মোকাম্মেলের ছবিটি সরকার নিষিদ্ধ করেছে, এই অপ্রত্যাশিত খবরে আমি একটা ধাক্কা খাই। আমার জানামতে, বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্রের ইতিহাসে এই প্রথম একটা প্রামাণ্যচিত্র নিষিদ্ধ হলো। ভিডিও-মাধ্যমে নির্মিত আর কোনো কিছু নিষিদ্ধ হওয়ার নজির এর আগে ছিল না। সেন্সর আইন অনুযায়ী কেবল সেলুলয়েডে তৈরি এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিরই সেন্সর সার্টিফিকেটের দরকার পড়ে। একটি ভিডিওচিত্রকে সেন্সর করা কিংবা নিষিদ্ধ করা সেন্সর বোর্ডের দায়িত্বসীমার বাইরে। তাই ওয়াকিবহাল মহলের কাছে এটা কোনো রহস্যের বিষয় নয় যে কেন সেন্সর বোর্ডের বাইরের একটি কর্তৃপক্ষ *কর্ণফুলীর কান্না*কে নিষিদ্ধ করেছে। এ ছবির যে দিকটা ভালো লেগেছে তা হলো, বিষয়বস্তুর প্রতি এর নিরপেক্ষ মূল্যায়ন। বিষয়বস্তুকে একটি পূর্বনির্ধারিত অবস্থান থেকে না দেখে পরিচালক চেষ্টা করেছেন পাহাড়ি ও বাঙালির পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর গুরুত্ব দিতে। পাহাড়ি মানুষের দুর্দশা এবং বিয়োগাত্মক ইতিহাস যেমন ছবিটি তুলে ধরে, তেমনি দারিদ্র্য ও রাজনীতির শিকার হয়ে পাহাড়ে এসে আবাস গড়া গরিব বাঙালিদের দুর্বিষহ অবস্থাও এটি বিশ্লষণ করতে চায়। অন্যদিকে ১৯৭০ সাল থেকে শুরু হওয়া সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে ছবিটি খুব কম কথাই বলে। পাহাড়ি বিদ্রোহীদের ভূমিকাকেও এটি মহিমান্বিত করার চেষ্টা করে না। আসলে এই ছবিতে যেসব সাবেক বিদ্রোহীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তারা তাদের পূর্বেকার বিপ্লবী সম্পৃক্ততাকে তারুণ্যের রোমাঞ্চ অভিলাষ হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির কঠোর সমালোচকেরা এ ছবির মধ্যে 'অতি নমনীয়' ও শান্তিকামী অবস্থান খুঁজে পাবেন, চলচ্চিত্রের যে ধরনের গুণের আমি সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করি।

এ বছর এই উৎসবে বাংলাদেশের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব থাকলেও একদিন সকালে একটা ছবিকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত ঘটনার খবর পড়ে আমি খুবই সংকুচিত হয়ে পড়লাম। কাঠমান্ডুর শীর্ষ ইংরেজি দৈনিকটির দেওয়া খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশি দূতাবাসের কিছু কর্মকর্তা উৎসব প্রাঙ্গণে আসেন এবং *কর্ণফুলীর কান্না*র প্রদর্শনী বন্ধের জন্য জোর চেষ্টা করতে থাকেন। আয়োজক কর্তৃপক্ষ পরে আমাকে জানায়, নেপাল সরকারের মাধ্যমে

করা বাংলাদেশি দূতাবাসের অনুরোধের প্রতি সম্মান রাখতে তারা প্রধান ভেন্যুতে ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ রাখে এবং বিশেষ দর্শকদের নিয়ে একটি রুদ্ধদ্বার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখে। ঘটনাটা ভালোই চাঞ্চল্যের জন্ম দেয় এবং স্বভাবতই ছবিটির প্রচার ও আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। যাঁরা ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য যদি হয় বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করা, দৃশ্যত তাঁদের সেই প্রচেষ্টার ফল হয়েছে উল্টো। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী, বাংলাদেশের কোনো শিল্পকর্মের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই সীমিত। তার পরও যেকোনো সরকারই আরেকটি বন্ধু দেশকে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় জনগণের জন্য উন্মুক্ত না করার ব্যাপারে এই মর্মে অনুরোধ করতে পারে যে, নিষিদ্ধ বিষয়টির প্রচার তার দেশের ভাবমূর্তির ক্ষতি করবে। কিন্তু এ ধরনের অনুরোধ দুই দেশের সরকারের মধ্যে সরকারি প্রটোকল মেনেই হওয়া উচিত। এবং সব ক্ষেত্রে আয়োজক দেশটিরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকা উচিত—তারা কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করবে কি করবে না। এ ধরনের বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ সংশ্লিষ্ট দেশটির প্রতিনিধির অধিকারবহির্ভূত।

যদিও ভারত ও পাকিস্তানের এমন অনেক ছবিই উৎসবের তালিকায় ছিল, যেগুলো তীব্রভাবে প্রতিষ্ঠানবিরোধী ও স্পর্শকাতর বিষয়নির্ভর, তার পরও দেশ দুটোর দূতাবাসগুলোর ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। পাকিস্তানের কয়েকটি তীব্র সমালোচনাধর্মী প্রামাণ্যচিত্র উৎসবের তালিকাভুক্ত ছিল। এদের মধ্যে একটি পাকিস্তানের 'অনার কিলিং'-এর ওপর নির্মিত। কিন্তু তার পরও উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ছবির জোগানদার ভারত থেকে আসা *ফাইনাল সলিউশন* ছবিটি গুজরাটের দাঙ্গার ওপর নির্মিত। এখানে গুজরাট রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করা হয়েছে এবং সংখ্যালঘু মুসলমানদের গণহত্যার পেছনে রাজ্য সরকারের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া আরও কিছু বিতর্কিত বিষয়ের ওপর তৈরি করা বেশ কিছু ভারতীয় ছবি উৎসবে ছিল। এসব ছবি দেখানো বন্ধ করার চেষ্টা তো দূরে থাক, ভারতীয় দূতাবাস উৎসবের সবচেয়ে বড় পার্টিটির আয়োজক ছিল। নেপালি ছবিগুলোর মধ্যে একটি হলো মাওবাদী বিদ্রোহের উৎস নিয়ে তৈরি *দ্য কিলিং টেরাসেস*। এই ছবি মাওবাদীদের ব্যাপারে নেপাল সরকারের অবস্থানের সমালোচনা করলেও ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধে কেউ চেষ্টা করেনি। মিলনায়তন ভরা দর্শকের মধ্যে ছবিটি দেখানো হয়েছে এবং ছবিটির শেষে একটা প্রাণবন্ত আলোচনাও হয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমাজের অভিভাবকেরা চলচ্চিত্রনির্মাতাদের আশা ও সংহতি তৈরির সৎ প্রচেষ্টার ব্যাপারে খুবই কম সহনশীল। কোনো এক কারণে তাদের এই ভুল ধারণাটা হয়েছে যে চলচ্চিত্র এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম, যা একটা দেশের 'ভাবমূর্তি' গড়তে অথবা ভেঙে দিতে পারে। এই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি একটি সহজ সত্যকে ঘোলাটে করে তোলে যে একটা দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিই বিদেশে তার ভাবমূর্তি নির্ধারণ করে, কোনো ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা সীমিত মাত্রার বয়ান নয়। কর্তৃপক্ষের বাড়াবাড়ি রকমের রক্ষণশীল আচরণের উৎস আসলে সরকারের 'ভাবমূর্তি'কে ইচ্ছাপূর্বক দেশের 'ভাবমূর্তি'র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা। আমার মনে আছে, *মাটির ময়না* নিয়ে সরকার কী রকম বাড়াবাড়ি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। আশা করি, এত দিনে সরকারের একটা অংশ বুঝতে পেরেছে যে *মাটির ময়না* জঙ্গিবাদের উৎস হিসেবে মাদ্রাসার সামান্যই সমালোচনা করে। পরিহাসের বিষয় হলো, সারা দেশে জঙ্গিবাদ ছড়ানোর জন্য মাদ্রাসাগুলোর দিকে সরকারই এখন আঙুল তুলছে। মাদ্রাসা-পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের সাম্প্রতিক সময়ের প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে *মাটির ময়না* বিবেচিত হতে পারে মাদ্রাসার পশ্চাৎপদতার জন্য প্রায় ক্ষমাপ্রার্থনার মতো একটা বিষয় হিসেবে। এবং এই প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থা যে মারাত্মক সমস্যার সূতিকাগার হতে পারে, *মাটির ময়নায়* তার একটা ভবিষ্যৎ সতর্কবার্তাও খুঁজে পাওয়া যায়।

এই জটিল বিশ্বব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন সরকার এবং বিদেশে সরকারি প্রতিনিধিদের পরিণত ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি। যে কোনো কিছুই দেশের ভাবমূর্তি 'ধ্বংস' করতে পারে, এমন বিভ্রান্তির ফল বিপরীত হতে পারে। কোনো কিছুকে হুমকি মনে করে দমিয়ে রাখার চেয়ে যেসব জিনিস দেশের বাইরে গুরুত্বসহ উপস্থাপিত হওয়ার যোগ্য, আমাদের উচিত সেগুলোকে গর্বের সঙ্গে উদ্‌যাপন করা। এসবের মধ্যে রয়েছে আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, সাহিত্যে আমাদের অর্জন, শিল্পে আমাদের অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোয় আমাদের বর্ধিষ্ণু প্রভাব এবং সহনশীল ও গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দেশ হিসেবে আমাদের পরিচিতি। উৎসবের মঞ্চে জুরিদের পক্ষ থেকে কিছু বলার জন্য যখন দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে দাঁড়াইনি, দাঁড়িয়েছি দেশের একজন প্রতিনিধি হিসেবে। এটা আমার ও আমার দেশের সম্মান যে, উৎসবে সেরা হিসেবে পুরস্কৃত তিনটি ছবির মধ্যে একটি ছিল বাংলাদেশের।

রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ : সত্যজিৎ রায় এবং নারী

এই লেখাটিকে একটি সাক্ষাৎকারের 'বাই প্রোডাক্ট' বলা যেতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকায় একটি নতুন প্রকাশিত নারীবাদী পত্রিকার পক্ষে থেকে কথা বলেছিলাম উপমহাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও বিদগ্ধ সমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্তের সঙ্গে। প্রশ্নগুলো ছিল রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণে সত্যজিৎ রায়বিষয়ক। আবু সয়ীদ আইয়ুব যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যের আধুনিকতম ব্যাখ্যাকার হিসেবে স্বীকৃত, তেমনি চিদানন্দ দাশগুপ্ত সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রকর্মের আধুনিকতম বিশ্লেষক হিসেবেই বিবেচিত। সুতরাং, অনুযোগের সুরে তোলা প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দেওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি যে তিনিই, এ কথা বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাক্ষাৎকার শেষে অনুলিখন পড়ে ঠাহর হলো, জবাবগুলো তিনি এড়িয়ে গেছেন। তাই এই লেখার মাধ্যমে আমার পুরোনো অনুযোগ নতুন করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রথমেই বলে রাখি, আমার নিচের আলোচনাটি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের নন্দনতাত্ত্বিক সমালোচনা নয়। তাঁর চলচ্চিত্রকর্মের সৃষ্টিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি যা দেখার চেষ্টা করেছি তা হলো, রবীন্দ্রসাহিত্যের চলচ্চিত্র উপস্থাপনে সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিকোণগত ভিন্নতা। চলচ্চিত্রে ভাষার ভিন্নতার কারণে মূল সাহিত্য থেকে তাঁর চলচ্চিত্র রূপটি কিছুটা পৃথক হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্র রূপায়ণে সেটিই ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রশ্ন হলো, ব্যাপারটা কি আসলেই ভাষান্তরের, নাকি মতান্তরের? আমার বক্তব্য মূলত রবীন্দ্রনাথের

দুটো ছোটগল্প 'সমাপ্তি' ও 'নষ্টনীড়' এবং উপন্যাস *ঘরে বাইরের* রায়কৃত চিত্রায়ণকে কেন্দ্র করে। দুই কালজয়ী শিল্পীর সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের পারস্পরিক টেক্সচুয়াল রি-রিডিংয়ের মধ্যেই সীমিত আমার লেখাটি।

এখন তাকানো যাক রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'বাসী চারুলতার দিকে। ভূপতির পতিশূন্য ঘরে একাকী চারু প্রাণ খুঁজে পায় অমলের আবির্ভাবে। অমলের সংস্পর্শসূত্রেই চারু আবিষ্কার করে তার নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সৃজনশীলতাকে। ওদের দুজনের সম্পর্কটি ঠুনকো হতে পারে, কিন্তু এটাও ঠিক, এই সম্পর্কের অনুষঙ্গেই চারুর মধ্যে বিকশিত হতে দেখি তার নিজস্ব সত্তাকে। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এ ভূপতি ও অমল দুজনকেই আমরা পাই দুই আদর্শিক স্বপ্নের ঘোরে আবদ্ধ দুটি প্রাণী হিসেবে। দুজনেরই বর্তমান বন্ধক পড়ে আছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার কাছে। চারুই কেবল রক্তমাংসের মানুষ, যার মানসিক বয়স বেড়ে উঠেছে অমল ও ভূপতির সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। চারু 'স্ত্রীরপত্র'-এর প্রতিবাদী মৃণালের মতো যদিও 'ঘর' ছেড়ে 'বাইরে' বেরিয়ে পড়ে না, তবু গল্পের শেষে সে যেন ভিন্ন চারু। ভূপতি যখন চারুর অপরাধের শাস্তি হিসেবে চারুকে রেখে কিছুদিনের জন্য দূরে চলে যাওয়ার কথা বলল, তখন চারু পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়ে প্রথমে আত্মসমর্পণ করলেও পরক্ষণেই ভূপতি যখন অনুকম্পার সুরে বলল, 'চলো চারু, আমার সঙ্গেই চলো।' চারু বলল, 'না, থাক্।' এই 'না থাক্'-এর চপেটাঘাতের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ গল্পটি শেষ করেন এবং চারুর নিঃশব্দ রূপান্তরকে স্বাগত জানান। এই রূপান্তরিত নারী সত্তার পরিচয় আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই। এমনকি 'পোস্টমাস্টার' গল্পের ছোট্ট রতনের মধ্যেও। নতুন আর পুরোনো দুই পোস্টমাস্টারের আগমন ও নির্গমনের মাঝখানে ভালোবাসাবঞ্চিত রতন পুরোনো পোস্টমাস্টারের কেবল করুণা প্রত্যাখ্যান করে, তা-ই নয়, সে যে এই চাকরিতে থাকতে চায় না, তা জানিয়ে দেয়। সত্যজিতের *পোস্টমাস্টার* ছবিতে অভিমানী রতনকে পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথের গল্পের শেষের বিবর্তিত রতনকে পাওয়া যায় না। 'প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই

নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"' রতনের এই 'আমি থাকতে চাই নে'র সঙ্গে চারুর 'না থাক'-এর সম্পর্ক কাকতালীয় নয়।

এবার আমরা চোখ ফেরাই সত্যজিৎ রায়ের *চারুলতার* দিকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পটি 'নষ্টনীড়'-এর শিরোনাম দিয়ে শুরু করেন, কিন্তু গল্পের শেষে শিরোনামের মরালিস্ট মিথকে ভেঙে এটিকে 'চারুলতা'য়, অর্থাৎ চারুর গল্পে শেষ করেন। অন্যদিকে রায় তাঁর চলচ্চিত্রটি শুরু করেন *চারুলতাকে* নিয়ে, কিন্তু ছবির শেষে এটিকে পর্যবসিত করেন 'নষ্টনীড়'-এ। রবীন্দ্রনাথের গল্পের শেষে চারুর যে উত্তরণ, তা সত্যজিৎকে আকৃষ্ট করে না বরং তিনি আক্রান্ত বোধ করেন অনেকটা এ রকম কিছু ভেবে, 'আহা, চারু-ভূপতির সম্পর্কটি অবশেষে জোড়া লাগিল বটে, তথাপি সেই পূর্বের ন্যায় নিষ্কণ্টক রহিল না আর।' সত্যজিৎ রায় কার্যত ওপরের বাক্যটিকে চলচ্চিত্রের আক্ষরিক ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন *চারুলতার* শেষ ফ্রিজ শটে। ভূপতি ও চারুর দ্বিধান্বিত হাত পরস্পরকে স্পর্শ করতে গিয়েও যেন থমকে যায়। সত্যজিৎ এতটুকু ইঙ্গিতেও সন্তুষ্ট বোধ করেন না; সেই মিলনপূর্ব মুহূর্তে থেমে যাওয়া দুজনের হাতের ফ্রিজ ফ্রেমের ওপর তিনি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সেই প্রিয় নীতিবার্তা 'নষ্টনীড়'। ভাবতে অবাক লাগে, *ঘরে বাইরে* উপন্যাসটি নিয়ে সত্যজিৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা নেন *পথের পাঁচালীরও* আগে। সম্ভবত এটিই তাঁর প্রথম চিত্রনাট্যগত প্রচেষ্টা। আরও অবাক হতে হয়, সেই ছবি তিনি অবশেষে তৈরি করেন জীবনের শেষ দিকে এসে। অন্য কথায়, এটি খুবই স্পষ্ট, উপন্যাসটি যেমন তাঁকে ভাবিয়েছে, তেমনি এর চিত্রনাট্য নিয়েও তিনি ভেবেছেন প্রচুর। সুতরাং, রবীন্দ্রমানসকে সত্যজিৎ কীভাবে ব্যাখ্যা করেন তার নজির হিসেবে *ঘরে বাইরে* ছবিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘরে বাইরে উপন্যাসটিতে নিখিলেশের চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন, তাতে হয়তো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন ভাবনাও অমূলক হবে না যে, এই পক্ষপাতের দায় এড়ানোর জন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসটির জন্য এমন একটি কাঠামো-ভঙ্গি বেছে নিয়েছেন, যেখানে নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ—এই তিনটি চরিত্রের পরস্পর ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের নিজস্ব ভাষ্য পৃথকভাবে আমরা পেতে পারি। সত্যজিৎ রায় আধুনিকতম সময়ের আধুনিকতম শিল্পের

শিল্পী হিসেবে উপন্যাসের এই প্রাগ্রসর গঠনশৈলীকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন এবং 'রশোমনো'র সমতুল্য একটি নতুন ভাষাভঙ্গি উপহার দিতে পারতেন। কিন্তু সত্যজিৎ সেই রবিকরোজ্জ্বল পথে যাননি। কারণ, হয়তো তা হলে তাঁর জন্য নিখিলেশকে দেবতা এবং সন্দীপকে দানব বানানো ততটা সহজ হতো না। রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশ যে রায়ের দেবতুল্য নিখিলেশ নয়, বরং একধরনের অ্যান্টি হিরো, *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথার নিচের উদ্ধৃতি তার প্রমাণ :

'আজ সন্দেহ হচ্ছে, আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব, আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই মরে গিয়ে সে তার ভয়াবহ শোধ নেয়।

'এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাৎ হয়ে গেছি, ত জানতেই পারি নি। বিমল নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে সকল শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এই ছ হাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েছে। আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারেনি, কেননা, ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলভাবে পৃথক। আমাদের মতো একরোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলে না তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।'

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নিখিলেশ বা সন্দীপ কেউই নায়ক নয় অথবা প্রতিনায়ক হিসেবে চিহ্নিত নয়। বস্তুত, দুটি পরস্পরবিরোধী আইডিয়া বা আদর্শের মডেল মাত্র। উপন্যাসটিতে রক্তমাংসের মনুষ্য চরিত্র একটিই, সেটি বিমলা, যে প্রতি মুহূর্তে অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে নিয়ত বিকাশমান। বিমলা জীবনের ভুল-ত্রুটি, ন্যায়-অন্যায়, সব টানাপোড়েনে মথিত হয়ে উপলব্ধির নতুন স্তরে উন্নীত দেখতে পায় নিজেকে। *ঘরে বাইরে* দুটি পরস্পরবিরোধী আদর্শের সহাবস্থান এবং সংঘাতই একমাত্র উল্লেখযোগ্য দিক নয়। ওই মধ্যবিত্ত সংঘাতের মধ্যস্থলে আটকে পড়া অসহায় কৃষকসমাজ ও বিহ্বল বিমলার চেতনাগত বিকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এখন কথা হলো, সত্যজিৎ রায়ের ছবিটি *ঘরের বাইরের* এই গভীর

বার্তাকে আদৌ স্পর্শ করে কি? আমরা উপন্যাসের গোড়ার দিকেই লক্ষ করি, সন্দীপের সঙ্গে পরিচয়ের আগেই বিমলা বাইরের জগৎ সম্পর্কে উৎসুক ছিল। এমনকি নিখিলেশ নিজেই একদিন অবাক হয়ে শোনে যে বিমলা স্বদেশি আন্দোলনের খোঁজখবর রাখে। সন্দীপের আগমনে পরবর্তী সময়ে তার এই সুপ্ত ইচ্ছা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের বিমলাকে দেখি, একদিকে সন্দীপের প্রতি আকর্ষণই যেন তাকে স্বদেশি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্যদিকে সন্দীপের ব্যক্তিগত অসততাই যেন পুরো আন্দোলন সম্পর্কে বিমলার মোহভঙ্গ ঘটায়। কেবল মোহভঙ্গ ঘটায় বললে কম বলা হবে, বরং যে বিমলা গোড়া থেকেই নিখিলেশের 'ঠান্ডা' রক্ষণশীলতাকে প্রায়ই বিদ্রূপ করত, সেই বিমলা এতটাই পেছনে ফিরে যেতে চায় যে, সে তার স্বামী নিখিলেশকে বলছে, 'তোমাকে ছড়া আমি আর কিছুই বুঝতে চাই না, কিছুই জানতে চাই না।' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মোহমুক্ত বিমলার পরিণতি কি এতটা নেতিবাচক? উপন্যাসের বিমলা কি স্বামীর মৃত্যু এবং নিজের বৈধব্যকে তার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে গণ্য করে? বোধ হয় না। উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় বিমলার আত্মকথা : 'আর আমি ভয় করি নে, আপনাকেও না, অন্য কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই।' আসলে এই অপরাধবোধ বিমলার নয়। এই পাপচেতনা রবীন্দ্রনাথেরও নয়। এটা সত্যজিৎ রায়ের অর্থনৈতিক মানস গঠনের। এই মরালিজমের সম্ভাব্য উৎস সত্যজিৎ রায়ের ব্রাহ্ম-উত্তরাধিকার। ব্রাহ্মসমাজ যেমন বাঙালি হিন্দুসমাজে প্রগতির হাওয়া নিয়ে এসেছিল, অন্যদিকে ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতারও প্রচলন ঘটিয়েছিল। বাঙালি হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ফুলহাতা ব্লাউজ ও মোজা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দুসমাজে পর্দা প্রথার প্রচলন ঘটায় ব্রাহ্মসমাজই। মজার ব্যাপার হলো, পারিবারিকভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম পরিবেশেই বড় হয়েছেন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে তিনি ভিক্টোরিয়ান মরালিজম থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিলেন। ২০ বছর আগে সত্যজিৎ রায় চারুলতার উপসংহার টানেন নৈতিকতা বোধে তাড়িত হয়ে। ২০ বছর পর '৮৪ সালে পৃথিবী আরও খানিকটা অগ্রসর হলেও সত্যজিৎ রায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকভাবেও আরও বুড়িয়ে এসেছেন, তাই প্রায়শ্চিত্ত দিয়েই কেবল *ঘরে বাইরে* শেষ নয়, শুরুও করেন তাই দিয়ে।

এবার আসা যাক 'সমাপ্তি' গল্পের চলচ্চিত্রায়ণ প্রসঙ্গে। প্রথমেই বলে

রাখা প্রয়োজন, গল্পটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৮৯৩ সালে। প্রেম, যৌনতা ইত্যাকার বিষয়ে নারী চরিত্রকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখানোই ছিল তখনকার রেওয়াজ। অথচ রবীন্দ্রনাথ অবলীলায় বিপ্লবটি ঘটিয়ে ফেললেন গল্পটিতে। শহরে শিক্ষিত অপূর্ববাবু গ্রামে ফিরে তার বিবাহের পাত্রী হিসেবে বেছে নেন অপ্রাপ্তবয়স্কা মৃন্ময়ীকে। বিএ পাস করা বাবুটি বিয়ের ব্যাপারে কনের সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না, উপরন্তু বাসর রাতে প্রত্যাশা করেন ঠিকই। মৃন্ময়ীর যথারীতি সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। তার মন পড়ে আছে তার জানালা টপকে গাছ বেয়ে দোলনায় চড়ার দিকে। গল্পের শেষে মৃন্ময়ী যখন যথোচিত বয়সে এবং মনে প্রেমের সঞ্চার হলো, তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে দিয়ে এক কাণ্ড ঘটিয়ে দিলেন। যে অপূর্ববাবু মৃন্ময়ীর মধ্যে প্রেম সঞ্চারে ব্যর্থ হয়ে কলকাতায় পড়ে থাকলেন, সেই কলকাতায় নিজ উদ্যোগে একদিন এসে হাজির হলো মৃন্ময়ী। শুধু তা-ই নয়, অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ আঁধার ঘরে অপূর্বকে জাপটে ধরে চুমু খেলো সে। 'সমাপ্তি' গল্পের শেষ কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি: 'খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময়প্রকাশের অবসর দিল না।'

রবীন্দ্রনাথের গল্প এখানেই শেষ। মৃন্ময়ীর এই সক্রিয়তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন সত্যজিৎ রায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পের এই শেষটি আমূল বদলে ফেলে উদ্ভাবন করলেন এক ঔপনিবেশিক পরিণতির। রবীন্দ্রনাথের গল্প শেষের ঠিক বিপরীতমুখী ঘটনাস্রোত সৃষ্টি করে বাবুটিকে বরং গ্রামে ফিরিয়ে আনলেন আবার। ঝড়-বৃষ্টি পেরিয়ে অপূর্ব যখন মৃন্ময়ীকে নিজের বাড়িতেই খুঁজে পেল, তখন সে প্রেমের পরশের আকাঙ্ক্ষায় লজ্জাবনত। 'সমাপ্তি'র সমাপ্তি দৃশ্যে অপূর্ব যখন মৃন্ময়ীর চিবুক স্পর্শ করতে উদ্যত, তখন সত্যজিৎ রায়ের সম্ভ্রমে বাঁধল। পুত্র ও বধূর দৃশ্যে বিব্রত দরজার বাইরে দাঁড়ানো মা এবং চলচ্চিত্র দর্শকদের মুখের ওপর পরিচালক দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। লক্ষ করার মতো ব্যাপার, কেবল 'সমাপ্তি'র সমাপ্তি নয়, ওপরে আলোচিত অন্য দুটো গল্পেরও শেষ নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের যত সমস্যা।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরিণতি নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের এই সংকট যে কতটা ক্রনিক, তার আরও একটি পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

'দেবী' গল্পটি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হলেও আমরা জানি, মূল ধারণাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ('দেবী' গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন—এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই। এখন করিলাম।'—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। নব কথা, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।)। রবীন্দ্রনাথের সেই ত্রিকৌণিক সম্পর্কে এবং দুই পুরুষের মধ্যবর্তী নারী চরিত্রের অসহায়ত্ব এ গল্পেরও বিষয়। সত্যজিৎ রায়ের জীবনীকার মারি সিটনের সূত্রে আমরা জানি, রায় যেভাবে ছবিটি শেষ করেছিলেন, তাতে দয়াময়ী নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করে। আমাদের ভাগ্য ভালো বলতে হয়, দৃশ্যগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ছবিটি শেষ করেছিলেন দ্বিতীয়বার নদীর পাড়ে দয়াময়ীকে মৃত অবস্থায় দেখিয়ে। পরবর্তীকালে কান উৎসবের কল্যাণেই বলা যায়, অত্যন্ত সৃজনশীল ও ইতিবাচক একটি দৃশ্য জুড়ে রায় ছবিটির ইতি টানেন। কান উৎসবে পাঠানোর প্রাক-মুহূর্তে তিনি মৃত দৃশ্যের বদলে দয়াময়ীকে দেখান সে বাড়ি ছেড়ে, সাদা ফুলের প্রান্তর ছাড়িয়ে কুয়াশায় হারিয়ে যাচ্ছে। দুর্গার মতো নদীর জলে বিসর্জন না দিয়ে বরং 'স্ত্রীর পত্র'-এর গৃহত্যাগী মৃণালের মতো দয়াময়ীর জন্য সমস্ত পৃথিবীর দরজাটা যেন খুলে দিলেন সত্যজিৎ রায়।

সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের নারীপ্রধান গল্পগুলোর প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী মনে হয়। আগ্রহটা যথার্থই। কারণ, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মাত্রাযুক্ত ও জটিল। চরিত্রগুলো একদিকে যেমন নিতান্ত সরলা-অবলা নয়, অন্যদিকে তেমনি শরৎচন্দ্রের আদর্শায়িত দৃঢ় শক্তিময়ী 'মাতৃপ্রতিমা'ও নয়। সত্যজিৎ *ঘরে বাইরে*, 'সমাপ্তি' ও 'নষ্টনীড়' ছাড়া আরও যে দুটি রবীন্দ্রগল্প চলচ্চিত্রের জন্য বেছে নেন, তাতেও নারী চরিত্রের ভূমিকা মুখ্য।

তবে এটাও কম লক্ষণীয় নয়, 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণালের মতো প্রতিবাদী চরিত্রের থেকে 'মণিহারা'র মনিমালিকার মতো লোভী চরিত্র সত্যজিৎকে বেশি আকর্ষণ করল। প্রশ্ন জাগে, 'স্ত্রীর পত্র'-এর মতো গল্প কেন তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। গল্পটিতে যথেষ্ট চলচ্চিত্রীয় সম্ভাবনা নেই বলে কি? নাকি স্বামীগৃহ ত্যাগী মৃণালের গতি রোধ করা ততটা সহজ কাজ নয় বলে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই আমরা এই অপরাজিত নারীর দেখা পাই। প্রসঙ্গত, 'স্ত্রীর পত্র'-এর শেষ কয়েকটি লাইন : 'আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে

বসেছি।... তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি— ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল— তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি।... আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।' মৃণালের এই 'আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।' আর বিমলার 'যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই' আসলে রবীন্দ্র নারী-চিন্তার অভিন্ন উৎসারণ।

চলচ্চিত্রনির্মাতা ও আঁকিয়ে ছাড়া লেখক হিসেবেও সত্যজিৎ রায়ের খ্যাতি রয়েছে। কিন্তু লেখার হাতটি ব্যবহার করেছেন কেবল শিশু-কিশোরদের জন্য। শিশু-কিশোরদের জন্য তৈরি ছবিগুলো বাদ দিলে নিজের লেখার ওপর ভিত্তি করে তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রের সংখ্যা মাত্র চারটি। *কাঞ্চনজঙ্ঘা*, *নায়ক*, *আগন্তুক* ও *শাখা প্রশাখা*। অথচ তাঁর সমসাময়িক বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হচ্ছে সাহিত্যনির্ভরতা কমানো। একদিকে 'পারসোনাল সিনেমা' যা চলচ্চিত্রকারের ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং প্রত্যক্ষ ও আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা প্রকাশের দিকে গুরুত্বারোপ করছে, অন্যদিকে 'অতোর সিনেমা' চলচ্চিত্রকারকে তাঁর চলচ্চিত্রের সার্বভৌম স্রষ্টার ভূমিকায় দেখতে চাইছে। অন্য কোনো লেখকের ধারণাকে বাস্তবায়নের পরিবর্তে নিজস্ব ধারণা বা কাহিনি এবং সংগীত, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার ওপর নির্মাতার সক্রিয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি জোর দিচ্ছে 'অতোর সিনেমা'।

মজার ব্যাপার, সত্যজিৎ সংগীত, চিত্রগ্রহণসহ ছবি নির্মাণের অনেক কৃৎকৌশলই নিজে পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু কাহিনি ও ধারণার ক্ষেত্রে দ্বারস্থ হন অন্যের কাছে; এবং সেটা বিভূতিভূষণ থেকে সুনীল পর্যন্ত। আর ঘুরেফিরে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু কেন? নেহাত কাহিনি বা প্লটের জন্য নিশ্চয়ই নয়। তা হলে? রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন? এখানেই মূল প্রশ্ন। রবীন্দ্রদর্শনে যদি তাঁর আস্থা এতই প্রবল, তাহলে তাঁর চিত্ররূপে এত ভিন্ন সুর যোগ করছেন কেন? চলচ্চিত্র সাহিত্যের 'চাটুবৃত্তি' করবে, এটা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সাবধান করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্য, সাহিত্যিক চলচ্চিত্রের ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে এর মূল সুরটি বদলে ফেলতে হবে, সেটাও বোধ হয় ঠিক নয়।

চিদানন্দ দাশগুপ্তের কাছে আমার শেষ প্রশ্ন ছিল, সত্যজিৎ রায় কি তাহলে রবীন্দ্রসাহিত্য বা দর্শনের নিছক ব্যাখা প্রদানে সন্তুষ্ট নন—এটাই

ধরে নিতে পারি? যথারীতি আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, 'সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব কোনো জীবনদর্শন ছিল বলে আমি মনে করি না। অর্থাৎ সোশ্যাল থিংকার হিসেবে আমি তাঁকে তেমন মূল্য দেব না, যেটা রবীন্দ্রনাথকে দেব। আমার কাছে সত্যজিৎ রায়ের গুরুত্ব একজন সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে, বক্তব্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা মূলত ব্যাখ্যাকারের।' আমি জানি না সত্যজিৎ রায় চিদানন্দ দাশগুপ্তের এই ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা মেনে নিতেন কি না।

১৯৮২, শর্ট ফিল্ম ফোরাম প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত এক বৈঠকে মোরশেদুল ইসলাম (মাঝে) ও তারেক মাসুদ (বসা, ডানে)

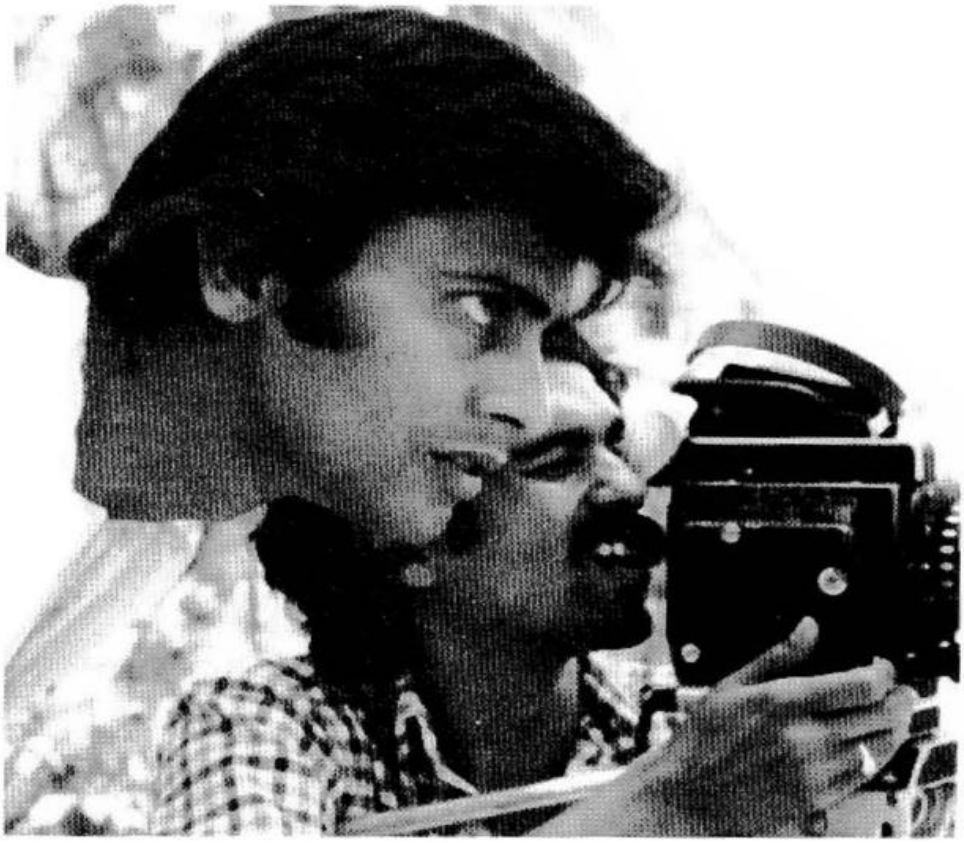

১৯৮৩, 'আদম সুরত' প্রামাণ্যচিত্রের চিত্রগ্রহণের সময় তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীর

১৯৮৮, অনুষ্ঠিত প্রথম ঢাকা আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির

১৯৯৩, ঢাকার ডন স্টুডিওতে রেকর্ডিংয়ের কাজে ব্যস্ত (ডান থেকে বাঁয়ে) তারেক মাসুদ, মোশাদ আলী, মাহমুদুর রহমান, দুলালচন্দ্র শীল ও ক্যাথরিন মাসুদ

২০০২, কান চলচ্চিত্র উৎসবে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

২০০৩, মন্ট্রিয়ল চলচ্চিত্র উৎসবে তারেক মাসুদ

২০০৩, মারাকেশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

২০০৩, *মাটির ময়না* ছবির পোস্টারের সামনে তারেক মাসুদ

২০০৬, ডিজিটাল প্রযুক্তিতে তৈরি দেশের প্রথম কাহিনিচিত্র *অন্তর্যাত্রা*র স্থিরচিত্র

২০০৬, একটি সংগীত ভিডিওর চিত্রায়ণকালে তারেক মাসুদ, মিশুক মুনীর ও ক্যাথরিন মাসুদ

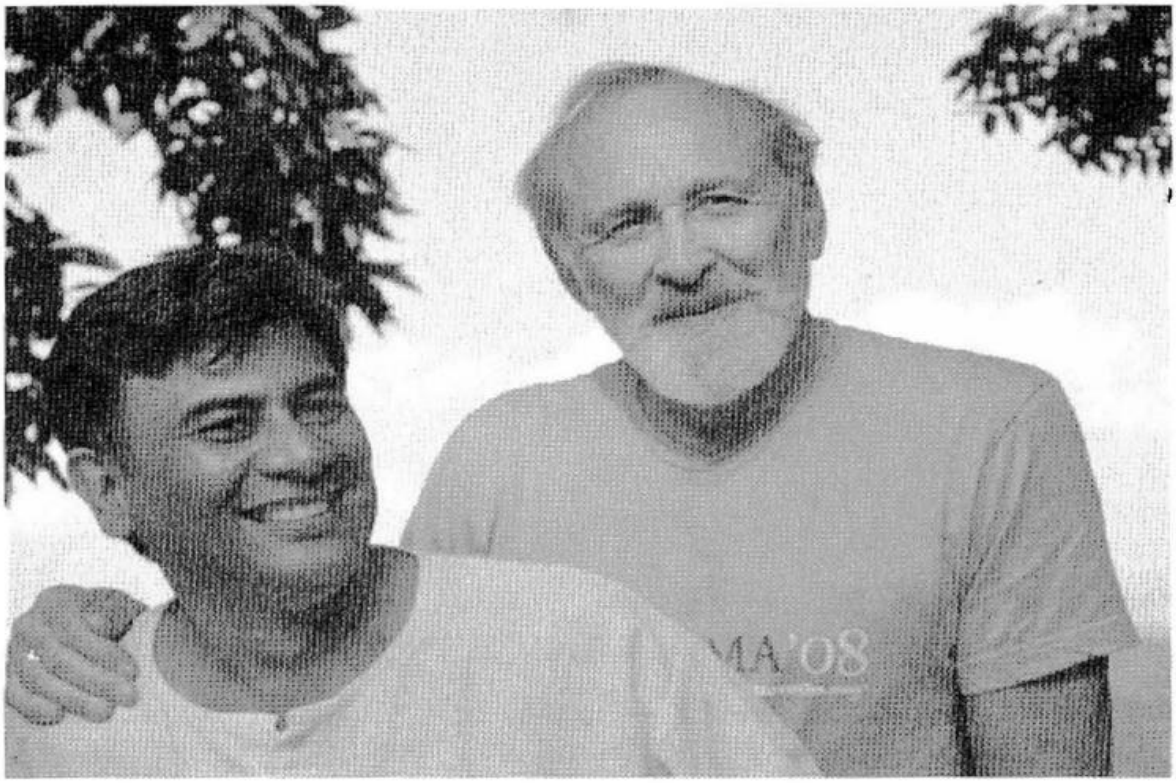

২০০৮, লিয়ার লেভিনের সঙ্গে তারেক মাসুদ

২০০৯, জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভস বাঁচাও আন্দোলনে অন্যদের সঙ্গে (ডান থেকে বাঁয়ে) তারেক মাসুদ, মিশুক মুনীর, মোরশেদুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল ও হাসিন মানজারে মুরাদ

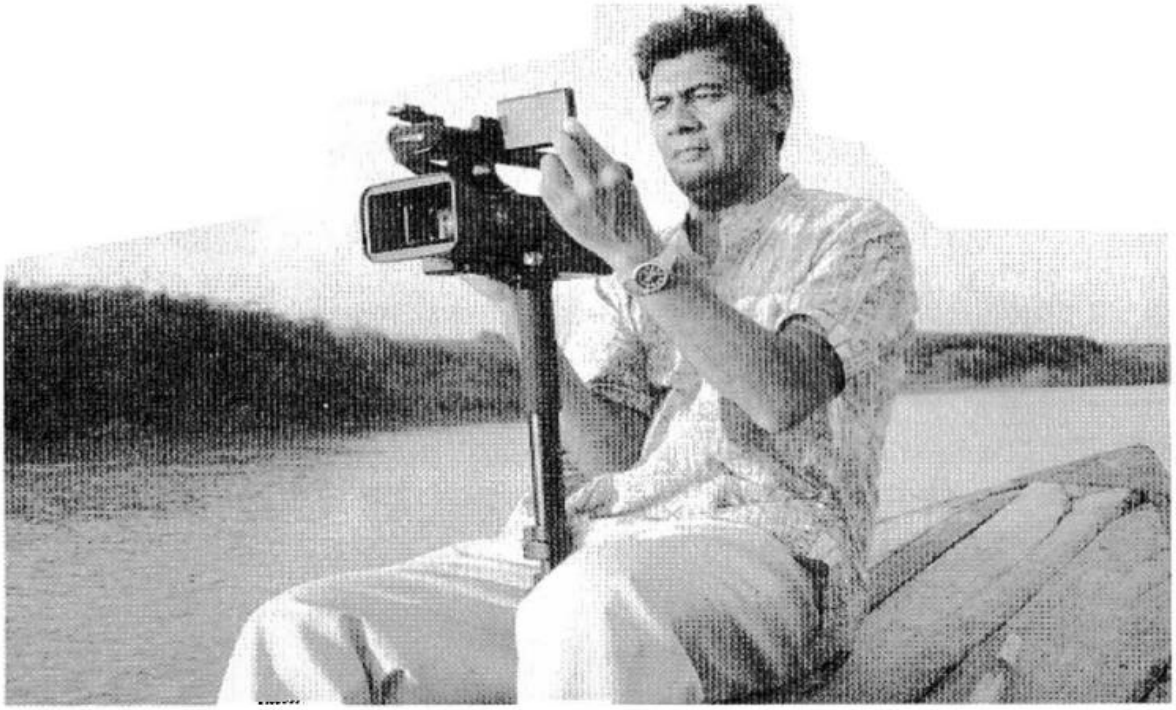

২০০৯, নির্মীয়মাণ *কাগজের ফুল* ছবির লোকেশন দেখছেন তারেক মাসুদ

২০১১, খুলনার করোনেশন সিনেমা হলের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করছেন তারেক মাসুদ

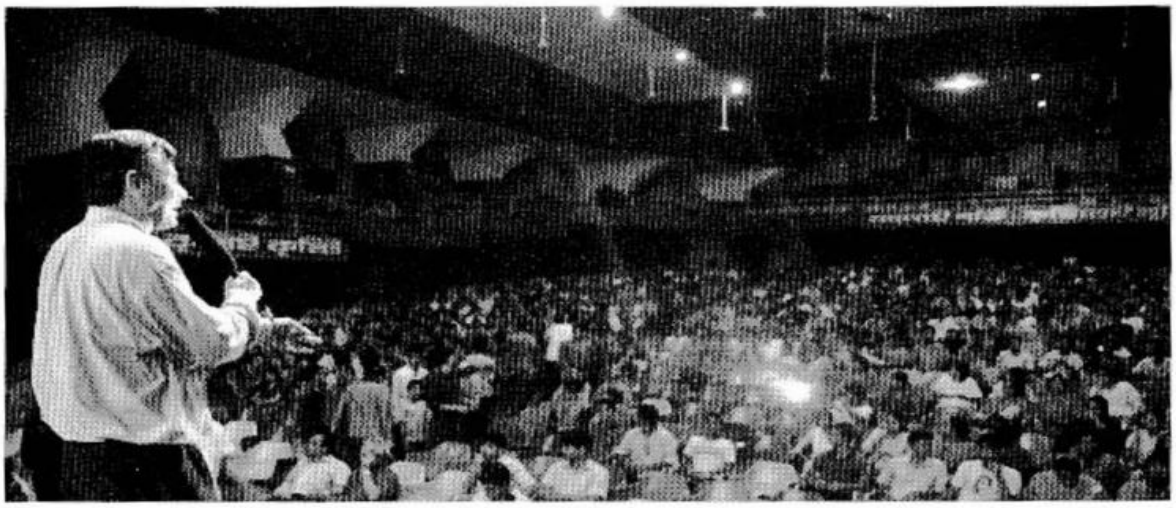

২০১১, বিকল্প প্রদর্শনব্যবস্থার মাধ্যমে ময়মনসিংহে নিজের ছবি *রানওয়ে* দেখাতে গিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছেন তারেক মাসুদ

২০১১, কুষ্টিয়ার চিত্রবাণী সিনেমা হলের সামনে তারেক মাসুদ

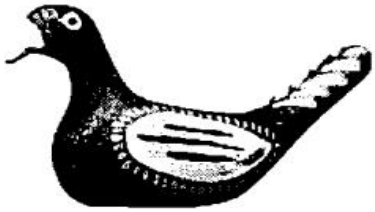

বিশ্ব চলচ্চিত্র : ভাষা ও মাধ্যমগত বিকাশের রেখাচিত্র

একজন ইংরেজ সিনেমা দেখতে যান। একজন আমেরিকান মুভি দেখতে যান। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী আজও বায়োস্কোপ দেখেন। আর স্বদেশে আমরা একসময় দেখতাম টকি আর এখন কেউ দেখি ছবি, কেউ দেখি বই। সাংবাদিকের চোখে 'ড্রিম ফ্যাক্টরি', ব্যবসায়ীর কাছে 'পঞ্চম বৃহত্তম শিল্প'। কারু বা কারখানা যেটাই হোক, শ্রুতিচিত্রের এই যে কাণ্ডকারখানা, তার বয়স ১০০ বছর পেরিয়ে গেছে। এই শতাধিক বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে আসে তা হলো, চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় পরিচয় এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নতুন ভাষা। যে ভাষা অক্ষরভিত্তিক ভাষার সমান্তরালে নিজস্ব চরিত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে যে কৃৎকৌশলের জন্ম, তা যে একপ্রকার চাক্ষুষ কৌতূহল নিবারণের বাইরে কোনো ভূমিকা রাখবে, স্বয়ং আবিষ্কর্তারাও হয়তো সেটা ঠাওর করতে পারেননি। তবে বাস্তব জগতের হুবহু পুনর্সৃষ্টি করার বিস্ময়কর ক্ষমতা চলচ্চিত্রকে দ্রুত জনগ্রাহ্য করে তুলতে বেশি সময় নেয়নি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, চলচ্চিত্রের আদিতম ব্যবহারের ধরনটি প্রামাণ্যমুখী হলেও অচিরেই তা নাটকীয় মোড় নেয়। এর বিজ্ঞানসুলভ আক্ষরিক প্রতিরূপ সৃষ্টিক্ষমতার রাশ টেনে ধরল হাজার বছরের কল্পনাপ্রবণ মানুষের মানসিক চাহিদা। বিজ্ঞাননির্ভর এই আধুনিক যন্ত্রটি পরিণত হলো জাদুর বাক্সে। উদ্ভব ঘটল ট্রিক ফটোগ্রাফির। আক্ষরিক অর্থেই জাদু প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকল ক্যামেরার উদ্ভট কারসাজি। চলচ্চিত্র হয়ে উঠল এবার আরও বিস্ময়কর।

চলচ্চিত্রের এই প্রত্নতাত্ত্বিক পর্বের ভাষাভঙ্গি গড়ে তুলতে কেবল জাদুর প্রদীপই ভূমিকা রাখেনি, ছায়ানৃত্য থেকে শুরু করে বহু রকম সনাতন লোকশিল্পরীতি প্রাগ্রসর যুগের এই যন্ত্রশিল্পটির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যত দিন কামেরার গতিশীলতা আবিষ্কৃত হয়নি, তত দিন মূলত নাট্য উপকরণের যান্ত্রিক পুনর্সৃষ্টির মধ্যেই সীমিত ছিল চলচ্চিত্রের গতিশীলতা। কিন্তু যখন থেকে ক্যামেরার সচল-সচেতন ব্যবহার শুরু হলো, সম্পাদনার নাটকীয় গতি সঞ্চারের সূচনা হলো, তখন থেকেই চলচ্চিত্র ভাষার নিজস্ব বাক্য বিন্যাস বাগধারারও, সর্বোপরি ব্যাকরণের বিকাশ শুরু হলো।

চলচ্চিত্রের কৃৎকৌশলটির প্রথম সৃজনশীল প্রকাশ ঘটল ডব্লিউ গ্রিফিথের হাতে। গ্রিফিথের উচ্চাভিলাষী আয়োজনে মাধ্যমটি ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়ে পড়ল। অর্থ লগ্নিকারীদের তরফ থেকে গ্রিফিথের সৃষ্টিশীলতাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠা হলো চলচ্চিত্রকারের ওপর প্রযোজকের আধিপত্য। শুরু হলো হলিউডের স্টুডিওভিত্তিক তারকা-প্রধান ফর্মুলা চলচ্চিত্রের। শুরু হলো বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়া। সৃষ্টি করা হলো সিনেমার বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা। একজন চলচ্চিত্রকার গ্রামীণ মৃৎশিল্পীর মতো তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে অনন্যরূপে তৈরি করার অধিকার হারালেন, আর বিনিময়ে পেলেন অ্যাসেম্বলি লাইনে প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রবের মতো ভোক্তার নিশ্চয়তা। বুর্জোয়া যুগের গোড়ার দিকে উদ্ভাবিত চলচ্চিত্রমাধ্যমটির মূল চরিত্রটিই যান্ত্রিক পুনর্সৃষ্টিমূলক। সুতরাং, এর বাণিজ্যিক সামান্যীকরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল।

দর্শকদের দিক থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় আরও কিছুটা জটিল। শ্রেণী, সম্প্রদায়, অঞ্চল ও ব্যক্তিবিশেষে সাংস্কৃতিক রুচির তারতম্য থাকাটাই স্বাভাবিক। সনাতন সব শিল্পকর্মকাণ্ডই এই রুচির বিভিন্নতা স্বীকার ও শ্রদ্ধা করেই পরিচালিত। কিন্তু হলিউডভিত্তিক চলচ্চিত্র তার বিশ্বব্যাপী দর্শক সৃষ্টির প্রয়োজনে তারকা প্রথাভিত্তিক ফর্মুলা ফিল্মের মাধ্যমে সৃষ্টি করল কৃত্রিম রুচি। বাজার অর্থনীতির যুগে পণ্যদ্রব্য কেনার ক্ষেত্রে মানুষের রুচি যেমন আজ বিজ্ঞাপনশিল্প কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তেমনি শিল্প আস্বাদনের ক্ষেত্রে দর্শকের চাহিদা হয়ে পড়ল ফর্মুলা ফিল্মের তৈরি রুচি থেকে অভিন্ন।

এই পর্যায় থেকে কেবল কারিগরি কৃৎকৌশল আর নান্দনিক ন্যায়নীতি নয়, চলচ্চিত্রশিল্পের অর্থনীতিই অনেকাংশে নির্ধারণ করে এসেছে এর ভাষাকে। তবে সৌভাগ্যের কথা হলো, হলিউডি প্রথার ভেতর ও বাইরে এমন সব বিশাল ব্যক্তিপ্রতিভা আমরা পেয়েছি, যাঁরা কেবল চলচ্চিত্রের ভাষাটিকে

তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কেবল শক্তিশালীই করে যাননি, দিয়ে গেছেন মার্গীয় মাত্রা। সাহিত্যের সমতুল্যে চলচ্চিত্রকে তাঁরা বিস্তৃত করে গেছেন বিচিত্র শাখায়। রবার্ট ফ্লাহার্টি কেবল প্রামাণ্যচিত্রের জন্ম দান করলেন, তা নয়; পৌঁছে দিলেন নান্দনিকতার শিখরে। সের্গেই আইজেনস্টাইন রুশ বিপ্লবকে ধারণ করলেন চলচ্চিত্র আঙ্গিকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। প্রথমজন প্রামাণ্য বিষয়ের মতো গদ্যাত্মক উপাদানে মেশালেন কাব্যিক আমেজ, আরেকজন স্থাপত্যের জমাট সংগীতকে গলালেন চলচ্চিত্রের বিপ্লবে।

সবাক হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত চলচ্চিত্রে চিত্রকলার প্রভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বিশ ও ত্রিশের দশকে ফরাসি ও জার্মান চিত্রকলার আন্দোলন চলচ্চিত্রকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। পরাবাস্তব আন্দোলন চলচ্চিত্রমাধ্যমকে উপহার দেয় লুই বুনুয়েলকে। এক্সপ্রেশনিস্ট আন্দোলন চলচ্চিত্রকে দেয় *কেবিনেট অব ডক্টর ক্যালগেরি*র মতো ছবি। চলচ্চিত্রে এই চিত্রল প্রকাশের দিকটি যখন একটি চূড়ান্ত উৎকর্ষের দিকে, ঠিক তখনই চলচ্চিত্রমাধ্যমের একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লব সব ওলট-পালট করে দিল। চলচ্চিত্রের শব্দ সংযোজন বা টকির আগমন চলচ্চিত্রের চিত্রকলামুখী যাত্রার গতি রোধ করে তাকে নাট্যধর্মী করে তুলল। ফলে চলচ্চিত্রকে যাঁরা সৃজনশীল মাধ্যম হিসেবে দেখতে চাইছিলেন, তাঁরা দমে গেলেন। আর চলচ্চিত্রশিল্পকে যাঁরা নিছক শৈল্পিক নিরীক্ষার বাইরে এনে বাণিজ্যভিত্তিক জনপ্রিয় মাধ্যমে রূপান্তরিত করতে চাইছিলেন, তাঁদের জন্য শব্দ হয়ে দাঁড়াল আশীর্বাদ।

নির্বাক যুগেই চলচ্চিত্রমাধ্যমটিকে যিনি একক প্রতিভা দিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলেন, তিনি হলেন শতাব্দীর এবং শতাধিক বর্ষ বয়সী চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী চার্লস চ্যাপলিন। নিজের প্রতিভাকে ক্যামেরার সামনে ও পেছনে যুগপৎ ব্যবহার করে প্রমাণ করে গেছেন, মহৎ সৃষ্টি যেমন অন্যান্য শিল্প ও সাহিত্যে হয়েছে, তেমনি চলচ্চিত্রেও সম্ভব। চ্যাপলিন দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সৃষ্টিতে চলচ্চিত্রের যে নির্বাক ভাষা তৈরি করেছিলেন, তা সবাকচিত্রের আবির্ভাবে পরিত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। সবাক যুগেও তিনি নির্বাক ছবি বানিয়ে গেলেন। তবে তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি বাক্যবান চিত্রের ব্যাপক শৈল্পিক উৎকর্ষ দেখে গেছেন। এবং নিজেই সবাক ছবি বানিয়ে বাক-সংযোগ যে চলচ্চিত্রের ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তা স্বীকার করে গেছেন।

আসলে চলচ্চিত্রের এই ক্রমাগত কারিগরি উত্তরণ ও উল্লম্ফন চলচ্চিত্রের ভাষার গতিপথকে এমনই পাল্টে দিয়েছে যে অনেক কালজয়ী চলচ্চিত্রকারকেও যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও বিপাকে পড়তে হয়েছে। বলা বাহুল্য,

রঙিন চলচ্চিত্রের আবির্ভাব বাণিজ্যসর্বস্ব প্রযোজকদের খুবই উৎসাহিত করে তোলে। কিন্তু সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্রকারেরা, এতকাল ধরে যাঁরা সাদা-কালো ছবির সূক্ষ্ম সুষমা গড়ে তুলেছেন, রঙের আবির্ভাব তাঁদের কাছে চলচ্চিত্রের ইতরীকরণ বলে বিবেচিত হয়। কালজয়ী চিত্রনির্মাতা ইংমার বার্গমান রঙিন ছবির যুগে সাদা-কালো ছবি করার মধ্য দিয়ে তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

চল্লিশের দশকের আগে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যেসব আন্দোলন লক্ষ করা যায়, তার কোনো কোনোটি মাধ্যমটির নিজস্ব ভাষা নির্মাণের পটভূমিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের প্রভাব অথবা সাধারণ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তৃত ছায়াপাত। হলিউডি সিনেমা প্রবর্তিত স্টুডিও ও তারকা-প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম বাস্তববাদী চলচ্চিত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে ইতালিতে। কেবল স্টুডিও আর তারকা ত্যাগ করেই নয়, সাধারণ মানুষের জীবন, লোকেশনে অপেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে চিত্রায়ণে ডি সিকা, রোসোলিনি, ফেদেরিকো ফেলিনি, ভিসকন্তি, জাভাত্তিনি শুরু করেন নতুন ধারার ছবি, যা 'নিউ রিয়েলিজম' হিসেবে পরিচিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইতালির দারিদ্র্যের পটভূমিতে সহানুভূতিশীল বাস্তবানুগ সামাজিক চিত্রায়ণ ছিল এর বৈশিষ্ট্য।

ইতালির নিউরিয়ালিস্ট আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে, বিশেষ করে নিউরিয়ালিস্ট দিকপালেরা নিজেরাই আন্দোলনের মূলধারা থেকে সরে এসে যাঁর যাঁর নিজস্ব স্টাইলে ভিন্ন ধাঁচের ছবি বানাতে শুরু করেছেন, তখন পঞ্চাশের দশকের শেষে ফ্রান্সে একদল তরুণ চিত্রসমালোচক কলম ছেড়ে নেমে পড়লেন চলচ্চিত্র নির্মাণে। তাঁদের মধ্যে আছেন জাঁ লুক গদার, ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, ক্লদ শ্যাব্রল, এরিখ রোমার প্রমুখ। এই নতুন চলচ্চিত্র আন্দোলনের নাম 'নিউ ওয়েভ'। নিউ রিয়ালিস্ট আন্দোলনকে যদি আদর্শবাদী বলে চিহ্নিত করা যায়, নিউ ওয়েভ আন্দোলনকে একটি বুদ্ধিবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখা যেতে পারে। নিউরিয়ালিস্টরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্রকারদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিগত নিজস্ব সংকট; বৃহত্তর সমাজের বাস্তবানুগ চিত্রায়ণের চেয়ে চলচ্চিত্রকারের নিজস্ব মানসজগতের প্রকাশ ঘটানো। কোনো ধরনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হননি অথচ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে স্মরণীয়, তাঁরা হলেন, কার্ল ড্রায়ার, রবের ব্রেসোঁ, জঁ রেনোয়া, ইয়াসুজিরো ওজু ও ইংমার বার্গমান। এঁদের গভীর দার্শনিক চিন্তাভাবনা তাঁদের চলচ্চিত্রকর্মকে সমৃদ্ধ ও কালজয়ী করে তুলেছে।

চলচ্চিত্রমাধ্যমে কাব্যময়তা নিয়ে এসেছেন যে দুজন শিল্পী, তাঁরা হলেন পাওলো পাসোলিনি ও আঁন্দ্রেই তারকোভস্কি।

হলিউডের স্টুডিও সিস্টেমের মধ্যেও একাধিক প্রতিভাবান বিশ্বনন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালকের আবির্ভাব হয়েছে—এ কথা অনস্বীকার্য। সিনেমার ক্র্যাফটম্যানশিপের রাজা জন ফোর্ড একক কৃতিত্বে গড়ে তুলেছেন *কাউবয়* ছবির এক বিশাল জগৎ। অ্যানিমেশন ছবির একচ্ছত্র অধিপতি ওয়াল্ট ডিজনি যে স্বপ্নের জগৎ তৈরি করেছেন, তারও কোনো তুলনা নেই। চলচ্চিত্রের এই জটিল শাখাটিতে তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। হলিউড শুধু তার জাঁকজমক দিয়ে সারা বিশ্বের দর্শকের মন মাতিয়েছে তা নয়, বিশ্বের বড় মাপের খুব কম পরিচালকই আছেন, যাঁরা হলিউডের হাতছানি এড়াতে পেরেছেন। চার্লস চ্যাপলিন, আলফ্রেড হিচকক, জঁ রেনোয়া, অরসন ওয়েলস থেকে শুরু করে হাল আমলের আকিরা কুরোসাওয়া, বেরনার্দো বের্তোলুচ্চি, ভিম ভেন্ডারস তাঁদের চলচ্চিত্র-জীবনের একটি পর্যায়ে বড় বাজেটের স্বার্থে হলিউডের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। অবশ্য এঁদের সবারই যে হলিউড-অভিজ্ঞতা মধুর হয়েছে, তা ঠিক নয়। ফেদেরিকো ফেলিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম, যিনি হলিউডের দ্বারস্থ না হয়েই বড় বাজেটের ছবি করে যেতে পেরেছেন।

চলচ্চিত্রমাধ্যমটি পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার সমবয়সী বলেই এর প্রযুক্তি ও প্রযোজনা বহুদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা দীর্ঘকাল ধরেই ভোক্তার ভূমিকা পালন করেছে। তবে পঞ্চাশ-ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকেই তৃতীয় বিশ্বের বেশ কিছু দেশ শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিশ্ব চলচ্চিত্রে স্থান করে নিয়েছে। জাপানের আকিরা কুরোসাওয়া ও ইয়াসুজিরো ওজুর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পাশাপাশি সত্যজিৎ রায় তাঁর অমর চলচ্চিত্র *পথের পাঁচালী*র মাধ্যমে উপমহাদেশকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের মানচিত্রে ঠাঁই করে দিয়েছেন।

ষাটের দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র আন্দোলন একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাকি বিশ্বের আদর্শ হয়ে রয়েছেন মহাদেশটির চলচ্চিত্রযোদ্ধারা। কিউবার তোমাস গিতেরেস আলেয়ার *মেমোরিজ অব আন্ডার ডেভেলপমেন্ট*, ব্রাজিলের 'সিনেমা নোভো' আন্দোলন ও সাম্প্রতিক ইতিহাসে মিগুয়েল লিতিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম।

আফ্রিকা থেকে ওসমান সেমবেনে আর সোলেমান সিসের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছেন নতুন এক ঝাঁক সপ্রতিভ চলচ্চিত্রকার। অতি সম্প্রতি চীন

ও ইরানে শক্তিশালী চলচ্চিত্রকারের আবির্ভাব ঘটেছে। বিশ্বের বড় বড় চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারগুলো এখন চীন ও ইরানের ছবিগুলো ছিনিয়ে নিচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত কেবল সংখ্যায় নয়, গুণেও বিশ্ব চলচ্চিত্রে আজ স্থান করে নিচ্ছে।

শতবর্ষী চলচ্চিত্রের ইতিহাসের একটি রূপরেখা নির্মাণ করা অসম্ভব, যদি আমরা চলচ্চিত্রমাধ্যমের তাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড ও চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের উল্লেখ না করি। বিশের দশকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে যে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন শুরু হয়, তা ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলচ্চিত্রমাধ্যমের নন্দনতাত্ত্বিক আস্বাদনের প্রথম সংগঠিত উদ্যোগ। মূলত রুশ বিপ্লব-উত্তর চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী ও তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে দর্শক-পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল সংসদগুলোর প্রাথমিক লক্ষ্য। কিনো আই চলচ্চিত্র আন্দোলনের পুরোধা জিগা ভের্তভের ছবি ও মেনিফেস্টো ধরনের লেখাজোখা, পুদভকিন ও আইজেনস্টাইনের ছবি ও বইপত্র ব্যাপক প্রভাব ফেলে পশ্চিমে। ফ্রান্সে আঁদ্রে বাজাঁর নেতৃত্বে সূচিত হয় চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক চর্চা। বেলা বালাজ চলচ্চিত্রমাধ্যমের যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তার ভূমিকা অপরিসীম। রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ষাটের দশকে ফ্রান্সের *কাহিয়ে দ্যু সিনেমা* ম্যাগাজিনে বেশ সাড়া ফেলেছিল। রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক ভূমিকার ক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকার ফেরনান্দো সোলানাস ও অক্তাভিও গেতিয়ার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমকালীন চলচ্চিত্রের সংকট

জমিদারির দিন শেষ, চলছে আসমানদারির কাল। সিনেমা তো দূরের কথা, স্থানীয় টেলিভিশনের স্থল (টেরিস্টোরিয়াল) গতিও থমকে গেছে আকাশপথের জয়যাত্রার কাছে। আকাশের সীমানা নির্ধারণের ক্ষমতা সামন্তপ্রভুর হাতে নেই। সবই আসমানদারের মর্জি। আকাশ আর মহাকাশ একাকার। পশ্চিম দিগন্তে রক্তচক্ষু কিন্তু ঈশান কোণেও কালো মেঘ। আকাশচারী হিন্দি সিনেমাকে ঠেকানো তো দূরের কথা, লোকাল কেব্‌লকে মোকাবিলা করা দায়। দেশি টেলির সঙ্গে টেক্কা দিয়ে বেসামাল বেদিশা বাংলা সিনেমা, আকাশচারী হিন্দি সিনোমাকে ঠেকাব কী করে! কিন্তু আদার বেপারির জাহাজের খবর নিয়ে লাভ কী? অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো সহজ। তাই কবি এবার নিজের কথা কও।

ঢালিউড অথবা স্বাধীন ধারার ছবির অভিন্ন দৈন্যের দিক হচ্ছে মৌলিক গল্প ও ভালো চিত্রনাট্য। বাণিজ্যপ্রধান ছবিতে ফর্মুলা ও নকল কাহিনি চিত্রনাট্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। ভিডিও দেখে হিন্দি ছবির শট ডিভিশন যেখানে হুবহু নকল করা হচ্ছে এবং তা কেবল সেন্সর ছাড়পত্র পাচ্ছে তা-ই নয়, জাতীয় পুরস্কারও পাচ্ছে, সেখানে চিত্রনাট্যের দরকারই বা কী? হলিউড, এমনকি বলিউডে একটি চিত্রনাট্যের পেছনে কত অর্থ ও সময় ব্যয় হয়, তা ঢালিউডের অনেকেরই জানা নেই। স্বনামে-বেনামে ঢালিউড ধারার ছবির চিত্রনাট্য লিখতেন একসময় সৈয়দ শামসুল হকের মতো প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক। আজ কারা লিখছেন, বলা নিষ্প্রয়োজন। ঢালিউডের পরিচালকেরা হুমায়ূন আহমেদ বা ইমদাদুল হক মিলনের মতো জনপ্রিয় ধারার লেখকের গল্প নেওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের দিয়ে চিত্রনাট্য লেখিয়ে নেওয়ার কথাও ভাবতে

পারেন না। বরং লেখককে যে টাকাটি দেবেন, তা তাঁরা দামি নায়িকার পেছনে খরচ করবেন। কিন্তু দামি নায়িকার দাপট দুর্বল গল্পভিত্তিক ছবিকে ব্যবসাসফল যে করতে পারে না, তার প্রমাণ ভূরি ভূরি। গত এক যুগে যে তিনটি ছবি ব্যবসাসফল হয়েছে, সেগুলোর অভিন্ন প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে তুলনামূলকভাবে মৌলিক গল্প।

স্বাধীন ধারার ক্ষেত্রে আমরা নির্মাতারা যতটা প্রোডাকশন ও পোস্ট প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে যত্নবান, ততটা চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে নই। চিত্রনাট্য লেখা একটি সুনির্দিষ্ট দক্ষতা। সব নির্মাতাকেই গল্প লিখতে হবে, সেটা যেমন জরুরি নয়, তেমনি, ছবির চিত্রনাট্য নিজেই লিখতে হবে—এমনও নয়। চলচ্চিত্র একটি যৌথ শিল্পকর্ম। এর নির্মাণ কর্মকাণ্ড যত ভাগ করে নেওয়া যায়, ততই ছবির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্য মঙ্গল। বাংলাদেশে এমন কিছু ভালো অথচ রণক্লান্ত নির্মাতা আছেন, যাঁরা ছবি বানানোর ঝক্কিঝামেলায় যেতে রাজি নন। অথচ তাঁরা ভালো চিত্রনাট্য লিখতে পারেন এবং পেশাদারির ভিত্তিতে অন্য নির্মাতাকে তা ব্যবহারের সুযোগ দিতে পারেন।

চলচ্চিত্র আর্ট না ইন্ডাস্ট্রি অর্থে শিল্প, তা নিয়ে কুতর্ক থাকলেও এটা যে একটি কারিগরি মাধ্যম, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। অথচ কারিগরি ব্যাপারে ঢালিউড কেন, আমরা যারা স্বাধীন ধারার নির্মাতা, তারাও যথেষ্ট সজাগ নই। আমাদের অনেকেরই ধারণা নেই, চলচ্চিত্র নির্মাণের কারিগরি কৃৎকৌশল ও যন্ত্রাদি কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কেবল চলচ্চিত্র নয়, সব শিল্পমাধ্যমে ডিজিটাল টেকনোলজির ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সংগীত, আলোকচিত্র, স্থাপত্যশিল্প, এমনকি চিত্রকলায় ডিজিটাল ডিভাইস অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শব্দ গ্রহণ, শব্দ মিশ্রণ, সম্পাদনা, প্রজেকশন, এমনকি চিত্র গ্রহণ পর্যন্ত—সব ক্ষেত্রেই ডিজিটাল অপশন ব্যবহার করা হচ্ছে। যে দেশে একটি মানসম্পন্ন ফিল্ম ল্যাব নেই, একটি কার্যকর অ্যানালগ শব্দ গ্রহণ ও মিশ্রণ স্টুডিও নেই, যেখানে মেয়াদোত্তীর্ণ ফিল্ম স্টক নিয়ে শুটিং করতে হয়, অন লোকেশনে সাউন্ড শুট করার ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্র নেই, সেখানে কম্পিউটারের কৃৎকৌশলের মাধ্যমেই বিগ লিপ দেওয়া সম্ভব। আমরা যদি এ ক্ষেত্রে বেশি শ্লথ গতিতে এগোই, সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন ভুটান, মালদ্বীপ আমাদের আগেই বিশ্ব চলচ্চিত্র মানচিত্রে বড় জায়গা করে নেবে। তার পদধ্বনি ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (এফডিসি) বর্তমান চলচ্চিত্র সংস্কৃতির মান অবনয়নের জন্য অনেকাংশে দায়ী। বিশেষ করে, ঢালিউড ধারার ছবির

এই দুর্দিনে সংস্থাটির ভূমিকা অনেকটা শ্মশানের শিয়ালের মতো। মুক্ত অর্থনীতির জিগির তুলে আমরা অর্থনৈতিক ও শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লাভবান অনেক প্রতিষ্ঠানকে বিকিয়ে দিয়েছি বেসরকারি খাতে। অথচ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা যথেষ্ট লাভজনক না হলেও একে শুধু টিকিয়ে রাখা হয়নি, দেওয়া হয়েছে একচেটিয়া আধিপত্য। সংস্থাটির বেসরকারীকরণ তো দূরের কথা, সংস্থাটির পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিযোগিতামূলক স্টুডিও ল্যাব ও কারিগরি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। যেখানে ঢালাওভাবে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে, সেখানে তথ্য নিয়ন্ত্রণের অজুহাত ধোপে টেকে না। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কায়েমি স্বার্থ রক্ষার জন্য পুরো চলচ্চিত্রশিল্প একটি ব্যাপক উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এফডিসি প্রবর্তিত ক্রেডিট প্রথার বিষয়ে আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে, এই সিস্টেম আদৌ কি ঢালিউড চলচ্চিত্রের বিকাশে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে? নাকি একটি স্বাভাবিক প্রতিযোগিতামুখী মনোভাবে স্থবিরতা সৃষ্টি করছে? এফডিসির ল্যাব, শব্দ গ্রহণ, মিশ্রণ, সম্পাদনা, এমনকি ক্যামেরাসহ বিভিন্ন সার্ভিসের মান যথেষ্ট ভালো না বলে স্বাধীন ধারায় প্রায় সব ছবির পরিস্ফুটন, মুদ্রণ, শব্দ মিশ্রণ, এমনকি সম্পাদনার কাজ ভারতে গিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। অতি সম্প্রতি ক্যামেরাও ভারত থেকে ভাড়া করে এনে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে ব্যবসাসফল *মনের মাঝে তুমি* ছবিটির শুটিং থেকে শুরু করে প্রায় সব কাজই হয়েছে ভারতে।

চলচ্চিত্র প্রযোজনায় বেসরকারি টেলিভিশন, বিশেষ করে চ্যানেল আই এগিয়ে এসেছে, এটা নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। সুস্থ বিনোদনের সমাজমনস্ক চলচ্চিত্র প্রযোজনার মাধ্যমে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। কিছু চ্যানেল টিভি প্রিমিয়ারের মাধ্যমে এগিয়ে আসছে। চারদিকে বেশ সাজসাজ রব। উভয় ধারার নবীন ও প্রবীণ সবাই কমবেশি সমান সুযোগ পাচ্ছেন। অন্য চ্যানেলগুলো প্রযোজনায় এগিয়ে এলে সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এক নতুন দিক খুলে যেতে পারে। ঢালিউডের সিনেমার এই মুমূর্ষু সময়ে ছোট পর্দার প্রাগ্রসর উদ্যোক্তারা বড় পর্দার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেন। পশ্চিম জার্মানিতে 'নিউ জার্মান সিনেমা'র বিপ্লবের পেছনে ছিল দু-তিনটি টেলিভিশনের উদ্যোগ ও অবদান। ফাসবিন্ডার, ভারনার হেরজগ ও ভিম ভেন্ডারদের মতো নির্মাতাদের সিংহভাগ ছবি টেলিভিশনের অর্থায়নে তৈরি হয়েছে। ফ্রান্সের কানাল প্লুস ও যুক্তরাজ্যের চ্যানেল ফোরের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

টিভি প্রযোজনার এই নতুন প্রবাহের ভালো দিকগুলোর পাশাপাশি কিছু সমস্যার দিকে আলো ফেলতে চাই। টিভি নাটকের তুলনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের আয়োজন, সময় ও বাজেট আলাদা হতে বাধ্য। টেলিভিশনের অর্থায়নে তৈরি ছবিগুলোর নির্মাতারা যথাযোগ্য প্রস্তুতির সময় ও বাজেট পাচ্ছেন না। দেশীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক হোক, সৃজনশীল হোক, নতুন জোয়ার আনতে হলে ঢালিউডের বস্তাপচা ফর্মুলা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মজার বিষয়, চ্যানেল কর্তৃপক্ষ নাটকের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ফর্মুলা ভেঙেচুরে অনায়াসে নতুন প্রতিমা গড়ে তুলেছে অথচ ছবি নির্মাণে এসে তাদের ড্রামার চার দেয়াল ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও সেখানে তারা মেলোড্রামায় নেমে আসছে। সত্যি এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, চ্যানেলগুলো তাদের নাটকের মধ্য দিয়ে একরাশ নতুন তারকা সৃষ্টি করলেও, ছবি বানাতে গিয়ে সেই তারকাদের ওপর তারা ভরসা করতে পারছে না। পরিচালকদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে প্রযোজকের কাজ, যা পীড়াদায়ক। ঢালিউডের তারকাদের শুধু ক্যামেরার সামনে নয়, ক্যামেরার পেছনেও ব্যবহার করছে তারা।

চ্যানেল প্রযোজিত ছবির ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতাটি হচ্ছে করপোরেট অর্থনীতি বা বিজ্ঞাপননির্ভর পরিবেশনা। চলচ্চিত্রের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে সিনেমা হল। ছবি দেখতে দর্শককে যদি সিনেমা হলেই না আনা গেল, সিনেমা হলের ইন্ডাস্ট্রি যদি চাঙা না হলো, তাহলে সেলুলয়েডে শুটিং করা কেন? বিজ্ঞাপনের টাকায় টিভি প্রিমিয়ারের মাধ্যমে বিনিয়োগ তুলে ফেলে একটি বা দুটি হলে প্রতীকী মুক্তি দিয়ে চলচ্চিত্রশিল্পের আরাধ্য মুক্তি সম্ভব নয়। তার চেয়ে ভিডিও ফরম্যাটে অনেক অল্প বাজেটে যত্ন নিয়ে সত্যিকারের ভালো টেলিফিল্ম বানানো সম্ভব। কিন্তু তার সংখ্যা আঙুলে গোনার মতোই অথবা নেই বললেই চলে। যে কয়েকটি উন্নত মানের টেলিফিল্ম তৈরি হয়েছে, তার প্রায় সব কটিই ব্যক্তি উদ্যোগে নির্মিত।

আরেকটি আশার দিক হচ্ছে, ছোট পর্দার নির্মাতারা বড় পর্দার নির্মাণকাজে এগিয়ে আসছেন। ভিডিও ফরম্যাটে প্রচুর শুটিং ও সম্পাদনা করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা নিয়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নতুন রক্তের সঞ্চার হতে চলেছে। তবে এই তরুণ নির্মাতাদের মনে রাখতে হবে, সেলুলয়েডে এক্সপোজ করলেই সেটা চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে না। এর জন্য টিভি নাটক ও সিরিয়ালের ভাষা থেকে কিছুটা ভিন্ন চলচ্চিত্রের ভাষার দিকে খেয়াল রাখাটা দরকার। ঋত্বিক ঘটক যাকে 'আলাদা এলেম' বলেছেন।

চলচ্চিত্রে অর্থায়ন ও তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বেসরকারি চ্যানেগুলোর উদ্যোগ আশাব্যঞ্জক হলেও সুস্থ বিনোদন ও সৃজনশীল ছবির প্রসারে যে বিনিয়োগপ্রবাহ প্রয়োজন, তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সৃজনশীল ধারার সাম্প্রতিক কিছু সাফল্য দু-একজন শিল্পপতিকে আগ্রহী ও উদ্যোগী করে তুললেও চলচ্চিত্র প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত উদ্যম হারিয়ে ফেলা একসময়ের ডাকসাইটে বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসছেন না। ভালো ছবির প্রযোজনায় একসময়ের সুনাম কুড়ানো দু-একটি প্রতিষ্ঠান এখনো কলকাতার নামকরা নির্মাতাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। সাম্প্রতিক কিছু সাফল্যের পরও স্থানীয় নতুন বা পুরোনো কোনো নির্মাতা তাঁদের দৃষ্টি ফেরাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। স্বাধীন ধারার নির্মাতাদের উচিত মূলধারার প্রযোজকদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা। অন্যদিকে একসময়ের ডাকসাইটে পশ্চিম বাংলামুখী প্রযোজকদের উচিত, স্থানীয় নির্মাতাদের যেকোনো দু-একজন নির্মাতাকে একবারের জন্য হলেও সুযোগ দিয়ে দেখা। স্বাধীন ধারার নির্মাতাদের দায়িত্ব প্রযোজকদের ধরে রাখা। অনেক সময় প্রযোজককে নির্মাতারা 'ওয়ান টাইম ইউজ' বলপেনের মতো ব্যবহার করে থাকেন। প্রযোজকদের টাকা উঠে আসার ব্যাপারটির দিকে নির্মাতাদের খেয়াল রাখা উচিত।

মন্ত্রী, আমলা থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী—সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, চলচ্চিত্র একটি শিল্প অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি। রাষ্ট্রীয়ভাবেও ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে স্বীকৃত। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রির সুবিধা থেকে চলচ্চিত্র কেন বঞ্চিত? কলকারখানা নির্মাণ থেকে শুরু করে হাঁস-মুরগির খামার নির্মাণ—সব ক্ষেত্রে ব্যাংক-ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কেন এগিয়ে আসবে না! আমরা ইরানি চলচ্চিত্র নির্মাণের দিগ্বিজয়ের কথা জানি। ইরানের স্থানীয় বাণিজ্যিক সিনেমাও ক্রমেই আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করে নিচ্ছে। এর পেছনে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকার কথা আমরা অনেকেই জানি না।

এ ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি, *মাটির ময়না*য় অর্থায়নের জন্য আমরা বেশ কয়েকটি বড় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। গ্যারান্টি, মর্টগেজ, কোলেটারাল—সবকিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম আমরা। কিন্তু নিয়ম বলে কথা। সব ব্যাংকের এক কথা, 'সিনেমার জন্য ঋণ দেওয়ার কোনো প্রভিশন নেই', 'ঋণখেলাপি ইস্যু নিয়ে আমরা খুব বিব্রত আছি' ইত্যাদি, ইত্যাদি। বড়লোকদের ব্যাংকের কাছ থেকে, ব্যর্থ ব্যাংকের কাছ থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আমরা গেলাম বিকল্প ধারার একটি বিখ্যাত ব্যাংকের

কর্ণধারের কাছে। উনি বললেন, 'আমরা তো গরিবদের ঋণ দিই শুধু।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টিতে সৃজনশীল চলচ্চিত্র একদিকে 'নেহাত আর্ট', তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে 'সেন্সর-সংক্রান্ত উটকো ঝামেলা', আর সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের চোখে 'স্রেফ তথ্যসংশ্লিষ্ট ব্যাপার'।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবকে অনেকেই সুস্থ সৃজনশীল ছবি নির্মাণের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, সরকারি অনুদান আমাদের কী দিয়েছে? প্রথম দফার দু-একটি ছবি ভিন্ন সরকারি অনুদানে সৃজনশীল ছবি নির্মাণের দৃষ্টান্ত খুবই কম নয় কি? অনুদান অনুগামীরা বলতে পারেন 'মন্দের ভালো'। এ ছাড়া উপায় কী? আমার কথা হলো, যে অঙ্কের অনুদান দেওয়া হয় এবং যার প্রধান অংশ 'এফডিসি ইন কাইন্ড' সার্ভিসে সীমিত, তার মধ্য দিয়ে দলবাজি আর আমলাতুষ্টি করে যে নির্মাতারা অনুগত হন, তাঁদের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' ছাড়া করার আর কিছু থাকে বলে মনে হয় না। স্বাধীন ধারার নির্মাতারা সরকারগুলোর কাছে সবচেয়ে বড় যে পৃষ্ঠপোষকতা আশা করতে পারেন, তা হলো একটাই—সৃজনশীল ছবির পক্ষে সরকারের বাধা হয়ে না দাঁড়ানো।

আজ সময় এসেছে সরকারের ওপর দায় চাপানো বন্ধ করা। রাষ্ট্রের কাছে দাবিদাওয়া পেশ করা ক্ষান্ত দেওয়া। সরকারের কাছ থেকে চলচ্চিত্রের যে দিকটিই এ পর্যন্ত উন্নয়নের দায়িত্ব ও অধিকার পেয়েছে, সে দিকটিরই বারোটা বেজেছে। জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভস ও এফডিসি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সময় এসেছে শক্ত মাটিতে দাঁড়ানোর, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ানোর।

সত্যজিৎ ও রবীন্দ্রনাথ

১৯৯২ সালে সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর যে দীর্ঘ শোকমিছিল হয় তার ব্যাপ্তির সঙ্গে কেবল আরেকজনের জন্য হওয়া ঐতিহাসিক শোকমিছিলের তুলনা করা যায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার এক বন্ধুকে যখন এই তুলনাটার কথা বললাম, সে আরেকটা প্রাসঙ্গিক ব্যাপার মনে করিয়ে দিল—সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে করা তাঁর প্রামাণ্যচিত্রটি রবীন্দ্রনাথের শোকমিছিলের ঐতিহাসিক দৃশ্যটি দিয়েই শুরু করেন।

দুই ভিন্ন সময় এবং ভিন্ন মাধ্যমের এ দুই বাঙালি বিস্ময়-পুরুষের পারস্পরিক সাদৃশ্য তাঁদের জন্য করা শোকযাত্রার মধ্যেই সীমিত নয়; তাঁদের সৃজনশীল জীবনের একেবারে শুরুতেই রয়েছে মিল। ইতিহাসের পরিহাস হলো, দুজনের প্রতিভাই আবিষ্কৃত এবং প্রাথমিকভাবে আদৃত হয়েছে পশ্চিমে, জন্মভূমিতে নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল জেতার পরই কেবল বাঙালি সাহিত্যসমাজ বুঝতে পারে তাদের মধ্যে এত বড়মাপের একজন কবি রয়েছেন। নোবেল জেতার পর বাঙালি অভিজাত সাহিত্যসমাজের দেওয়া সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ এই অস্বস্তিকর বাস্তবতাটিকে জোর দিয়ে তুলে ধরেন। একইভাবে *পথের পাঁচালী*র বিরতিহীন প্রশংসা আর মহিমাকীর্তনের মধ্যে আমরা ভুলে যাই যে 'কান উৎসব'-এ সাফল্যের পরও দেশীয় কর্তৃপক্ষ এই বলে ছবিটিকে বাতিল করেছিলেন যে 'ছবিটি অনুজ্জ্বল ও গতিহীন'। কমলকুমার মজুমদারের মতো মহৎ লেখকও এ ছবির বেলায় 'সুন্দর দৃশ্য' ছাড়া আর কিছু বলার মতো খুঁজে পাননি। এই সত্যও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে *পথের পাঁচালী*র কাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট

একটি বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য ছবিটিকে নিউইয়র্কে আমন্ত্রণ করেছিল। এ ছাড়া মিউজিয়াম পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল ছবিটি সম্পূর্ণ করার কাজে সহায়তা করতে। ছবিটিতে প্রামাণ্যচিত্রের লেবেল লাগানো এবং ছবির শেষে অপুর পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে না গিয়ে 'সমাজ গঠন কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছে'—এমন দৃশ্য ঢোকানোর জন্য পরিচালককে উপদেশ দেওয়ার পরই কেবল পশ্চিমবঙ্গের সে সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ছবিটি শেষ করার কাজে সহায়তা দিতে রাজি হন।

রবীন্দ্রাথের ছিল রেনেসাঁ মন। কেবল সাহিত্যেই নয়, চিত্রকলা, সংগীত ও নাটকের ওপর তাঁর শক্ত দখলেও এটা টের পাওয়া যায়। যদিও এখন ভাবা হয় যে রেনেসাঁ-মানবযুগ শেষ হয়ে গেছে। শিল্পের প্রতিটি শাখা ও মাধ্যম এত জটিল ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে যে একক কোনো মানুষের পক্ষে সব বিষয়ের চূড়ায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের মতো শিল্পীরা যখন এত প্রতিভা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাঁরা যখন অতীতের রেনেসাঁ-মানবের মতোই সৌকর্য দেখান, ব্যাপারটা তখন অচিন্তনীয়ই লাগে।

আমার ধারণা, বড় মাপের শিল্পীরা দুই প্রকারের হন। প্রথম প্রকারের শিল্পীরা নতুন চিন্তা বা ভাবধারার উন্মীলন ঘটিয়ে কিংবা তাঁদের নিজস্ব শিল্পকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন এনে একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু আরেক ধরনের শিল্পীও আছেন, যাঁরা সমাজকে বদলে না দিয়ে কিংবা তাঁদের শিল্পমাধ্যমে বিপ্লব না ঘটিয়েও তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের চূড়ান্ত ও সংশ্লেষী রূপ ধারণ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা শিল্পীসমাজের সাংস্কৃতিক প্রতীকে পরিণত হন। সমস্ত পাপ ও পুণ্য, পূর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতাসমেত সেই সমাজ শিল্পীর কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যজিৎ রায়—দুজনই এই দ্বিতীয় প্রকারের শিল্পী। লেখক ও কবি আহমদ ছফা যেমন একবার বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ একটি মহাসাগর, যেখানে ঝরনা, নদী, মেঘ—সমস্ত উৎস থেকে পানি এসে এক হয় এবং বৃহৎ সমগ্রের কাছে নিজেদের পৃথক সত্তা বিসর্জন দেয়।' তিনি এসব উৎসকে একটি নতুন ও সমন্বিত সাংস্কৃতিক সমগ্রে সমন্বিত করতে জানতেন। একইভাবে সত্যজিৎও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টি থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণের গ্রামবাংলা পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সব ঐশ্বর্যের খোঁজ করেছেন এবং চলচ্চিত্রে সেগুলোর সংশ্লেষ ঘটিয়েছেন।

ঠাকুর ও রায় পরিবারের ইতিহাস কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার পুরো ইতিহাসের একটি অনুকৃতি। সারা বাংলায় উগ্র জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্ববাদী প্রতিশোধপরায়ণতার বিপরীতে শীর্ষ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি সংস্কারধর্মী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। এ সমাজ থেকে নতুন একটি উদ্যমী, উদার ও সৃষ্টিশীল চেতনার উত্থান ঘটে। সব ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে মুক্তমনা অবস্থান এ সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ কারণে তারা বাঙালি রেনেসাঁর নেতৃত্বে পরিণত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই উদার অবস্থান এই নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক গোষ্ঠীটির মধ্যে আরেকটি বৈশিষ্ট্যেরও জন্ম দেয়, যাকে খুব বেশি প্রশংসা করা যায় না; সেটি হলো ভিক্টোরিয়ান ভাবপ্রবণতা এবং এর অতি শালীন রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি। তাই এটা কোনো কাকতাল নয় যে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ দুজনই যেহেতু ব্রাহ্মসমাজ থেকে এসেছিলেন, তাঁদের দুজনের মধ্যেই এনলাইটেনমেন্টের সমস্ত গুণ ও ভিক্টোরিয়ানিজমের ত্রুটির সমন্বয় ছিল। তাঁদের ব্যক্তিগত প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁদের মানসিকতায় ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমার কাছে সত্যজিৎ ও রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মিল তাঁদের বৃহৎ বিশ্বদৃষ্টি। তাঁদের কেউই জাতীয়তাবাদের গণ্ডিবদ্ধ অন্ধতার শিকার হননি। লক্ষণীয় বিষয়, সত্যজিতের সমসাময়িক পরিচালক ঋত্বিক ঘটক যখন মারা গেলেন, সত্যজিৎ তাঁর শোকবার্তায় বললেন, 'ঋত্বিক আমার চেয়ে বৃহত্তর বাঙালি ছিলেন।' আমার মনে হয় না সত্যজিৎ এখানে কেবল বিনয় দেখাচ্ছেন। বরং এটা এমন একটা প্রশস্তি, যা তিনি নিজের জন্য বরাদ্দ রাখতে চাননি। বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রবণতা থেকে এই মানসিক দূরত্ব রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনারও একটি মৌলিক দিক। ইতিহাসের পরিহাস হলো জীবিত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ যেখানে কখনোই জাতীয়তাবাদের শিকারে পরিণত হননি, তাঁর মৃত্যুর পর কিছু কিছু জায়গায় তিনি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। সত্যজিৎ কিছুটা হলেও এই দুর্ভাগ্য এড়াতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো সত্যজিৎ কোনো প্রতিষ্ঠান রেখে যাননি, যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারকে পোক্ত করে রাখবে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিষ্ঠানটি রেখে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেটাই ব্যবহৃত হয়েছে তাঁকে সীমিত পরিসরে সংজ্ঞায়িত করার এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির ফাঁপা স্তম্ভে পরিণত করার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হিসেবে। খুব স্বাভাবিক যে সত্যজিৎ এ ঘটনা থেকে শিক্ষা

নিয়েছিলেন। পারিবারিক চাপের কারণে সত্যজিৎ শান্তিনিকেতন থেকে কয়েক বছরের জন্য শিক্ষাও নিয়েছিলেন। কিন্তু ডিগ্রি শেষ করার আগেই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, সেখানকার পরিবেশ তাঁর ভালো লাগেনি। তিনি শান্তিনিকেতনি সুরেলা কণ্ঠে কথা বলার সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতেন। বহু বছর পর রবীন্দ্রনাথকে দেবতায় পরিণত করার শান্তিনিকেতনি ধারার বিরুদ্ধে সত্যজিৎ প্রতিবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের একটি পশ্চিমা মেলোডিকে আরও পশ্চিমা ভঙ্গিতে তাঁর ছবিতে ব্যবহার করে (কিশোর কুমারের গলায় 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী')।

সত্যজিৎকে নিয়ে লেখা অ্যান্ড্রু রবিনসনের বই *দি ইনার আই* থেকে একটি লক্ষণীয় উদাহরণ মনে পড়ছে। কলকাতা ভ্রমণের সময় রবিনসন খেয়াল করেন যে কলকাতার অন্য বসার ঘরগুলোর মতো সত্যজিতের ঘরের দেয়াল রবীন্দ্রনাথের ছবি দিয়ে অলংকৃত নয়। রবিনসন সত্যজিৎকে যখন এই অনুপস্থিতির কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যজিৎ বললেন, 'সাচ আ ক্লিশে!' আমরা কেবল এটুকুই আশা করতে পারি, সত্যজিতের কাজের মূল্যায়নও যেন 'সাচ আ ক্লিশে'তে পরিণত না হয়।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর বিদেশি নির্মাতাদের চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে সমাজজীবনের নানা অনুষঙ্গের মতো যুদ্ধ এসেছে অনিবার্যভাবেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংঘটিত প্রায় সব যুদ্ধ নিয়েই কমবেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। নিজভূমে সংঘটিত যুদ্ধের ওপর সে দেশের নির্মাতারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। সে চেষ্টা আমাদের দেশের নির্মাতারা করেছেন, এখনো তা চলছে। তবে নয় মাসব্যাপী সংঘটিত বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব থাকলেও আন্তর্জাতিক নির্মাতারা কেন যেন এ বিষয়টি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহ দেখাননি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গেও অনেক খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকার স্বচক্ষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলেও যুদ্ধ চলাকালীন কেউ যেমন কোনো তথ্যচিত্র নির্মাণে উদ্যোগ নেননি, তেমনি যুদ্ধ-পরবর্তী সময়েও আগ্রহ দেখাননি কোনো কাহিনিচিত্র নির্মাণের। সামান্য সীমান্ত সংঘর্ষকে পুঁজি করেও বলিউডের নির্মাতারা অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, যা একই সঙ্গে ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবেও সফল হয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ওপর খোদ আমেরিকান নির্মাতারা তৈরি করেছেন অসংখ্য চলচ্চিত্র। তবে কেন জানি বিশ্বের মহান চলচ্চিত্রকারদের কাছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধটি অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে।

ভিনদেশি নির্মাতার বিচ্ছিন্নভাবে কিছু তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা থাকলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত একমাত্র কাহিনিচিত্রটির নাম *জয় বাংলাদেশ*, যেটি নির্মাণ করেছিলেন ভারতের চলচ্চিত্রকার আই এস জোহর; যেটি অশ্লীলতার দায়ে পরবর্তী সময়ে নিষিদ্ধ হয়েছিল। আরেকটি উদ্যোগের

কথা বলা যেতে পারে, যা যুদ্ধ চলাকালীন নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ারে অনুষ্ঠিত কনর্সাটের ওপর নির্মিত, যাতে অংশ নিয়েছিলেন প্রয়াত সংগীতশিল্পী জর্জ হ্যারিসন, এরিক ক্ল্যাপটন, পণ্ডিত রবিশঙ্করসহ আরও অনেকে। কাহিনিচিত্র না হলেও প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য ও গুরুত্ব নিয়ে এটি প্রদর্শিত হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, যুদ্ধ ছাড়াও বিশ্বের অনেক মানবতাবাদী নেতার জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত হয়েছে অসংখ্য চলচ্চিত্র। যেমন হয়েছে উপমহাদেশের অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিকে নিয়ে। এর মধ্যে ব্রিটিশ অভিনেতা-পরিচালক রিচার্ড অ্যাটেনবরোর *গান্ধী* ছবিটির নাম আসে সর্বাগ্রে। সুভাষ বসু ও ভগৎ সিংকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে একাধিক চলচ্চিত্র। কিন্তু বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোনো নির্মাতাই আগ্রহ দেখাননি। এ ব্যাপারে বিদেশি নির্মাতাদের কোনো দায় না থাকলেও এ দায়ভার আমরা এড়াতে পারি না। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পার হয়ে গেলেও আমাদের কেউ এমন একটি উদ্যোগ কেন নিতে পারলেন না—সময় এসেছে তা খতিয়ে দেখার।

মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে পাকিস্তানিদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা শূন্য। কিন্তু ওপার বাংলা? মুক্তিযুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। এক কোটি শরণার্থীর আশ্রয়কেন্দ্র ছিল পশ্চিম বাংলা। প্রখ্যাত নির্মাতা নাগিসা ওসিমা সুদূর জাপান থেকে এসে বানালেন *জয় বাংলা* ও *রাহমান, দ্যাফাদার অব নেশান* নামে দুটি ছবি। এমনকি ভারতের অন্যান্য প্রান্ত থেকেও তৈরি হলো কয়েকটি ছবি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ তো দূরের কথা, কলকাতার নামীদামি রাজনীতি-সচেতন চলচ্চিত্রকারদের চোখ এড়িয়ে গেল শরণার্থী শিবিরের মানবেতর দৃশ্য! তাঁদের কান এড়িয়ে গেল মুমূর্ষুদের করুণ আর্তনাদ!

সত্যজিৎ রায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। এমনকি অনেক বিপত্তির মধ্য দিয়ে সিকিম নিয়েও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু একাত্তরে বা তার পরও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন বলে শোনা যায়নি। জানা গেছে, তিনি জহির রায়হানের *লেট দেয়ার বি লাইট*-এর প্রশংসা করেছিলেন এবং এ ছবির রাশ প্রিন্ট দেখে *অশনি সংকেত* ছবির জন্য ববিতার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিলেন। মৃণাল সেন সত্যজিৎ রায়ের চেয়ে ভিন্নধারার এবং রাজনীতি-সচেতন নির্মাতা হলেও একাত্তরে তিনি *কলকাতা-৭১* নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর জন্ম ও শৈশবভূমির প্রতি হয়তো মনোযোগ দেওয়ার

সুযোগ পাননি। পূর্ব বাংলা নিয়ে সারা জীবনই মোহগ্রস্ত ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। তবে বাংলাদেশের বাস্তবতার চেয়ে এর মিথই বোধ হয় তাঁকে বেশি টেনেছে। তাই হয়তো সুদূর পুনায় মুক্তিযুদ্ধকে কুর্নিশ করলেন স্বল্পদৈর্ঘ্য কল্পকাহিনি *দুর্বার গতি পদ্মা* বানিয়ে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে সবচেয়ে বড় কাজটি করেছিলেন মার্কিন চলচ্চিত্রকার লিয়ার লেভিন। তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য নিউজরিল চিত্রগ্রাহকের মতো তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ, গণহত্যা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁর ক্যামেরায় ধারণ করেননি। এ ক্ষেত্রে তাঁর যেমন আগ্রহ ছিল না, তেমনি সুযোগও ছিল না। সুযোগ ছিল না এই কারণে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে সিআইএর চর হিসেবে সন্দেহ করায় তাঁর পক্ষে শরণার্থী শিবিরের বাইরের ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। লিয়ার লেভিন যে প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন, ২৫ বছর পর তাঁর আরেক স্বদেশি ক্যাথরিন মাসুদ তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে আজ তিনি আমাদেরও স্বদেশি হয়ে উঠেছেন।

আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

সাম্প্রতিক কালে কিছু তরুণ নির্মাতা বিদেশের বড় বড় উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার নিয়ে আসছে। এটা দেখে আমাদের মতো বেকার বুড়ো নির্মাতারা, যারা সেই কবে অখ্যাত কোন চলচ্চিত্র উৎসবের ছোট কোন পুরস্কার পেয়েছিলাম, তাদের খারাপ লাগতেই পারে। কিন্তু তাই বলে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কমিটির বিচারকেরাও আমাদের মতো সংকীর্ণমনাদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন বলে আশা করা যায় না।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে, জাতীয় পুরস্কার কমিটির কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও পুরস্কৃত ছবিগুলোকে তিরস্কার করা। ব্যাপারটা এ রকম যে বিচারকেরা যদি বিদেশে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলোকেই পুরস্কার দিয়ে ফেললেন, তাহলে তাঁদের বাহাদুরিটা থাকল কোথায়? আবু সাইয়ীদ ও গোলাম রব্বানী বিপ্লবের আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত ছবি দুটি যদি এবার জাতীয় পুরস্কার পেয়ে যেত, তাহলেই আমি বিস্মিত হতাম। সামান্য পেছনে তাকালেই আমার বক্তব্যের ব্যাখ্যা মিলবে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে বাংলাদেশের যে ছবি আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রথমবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার লাভ করে, সেটি মোরশেদুল ইসলামের *চাকা*। বিস্ময়কর হলেও সত্য, ছবিটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়। জোট সরকারের আমলে ২০০২ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে *মাটির ময়না* কাজী হায়াতের *অন্ধকার*-এর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সাদেক খানের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কমিটি *মাটির ময়নার* কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পাওয়ার দাঁতভাঙা জবাব দেয়। অবশ্য এর আগেই জোট সরকারের সেন্সর বোর্ড কান উৎসবে ছবিটির নির্বাচিত হওয়ার খবর পাওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে এটিকে নিষিদ্ধ করে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আবু সাইয়ীদের *শঙ্খনাদ* ছবিটি আন্তর্জাতিক উৎসবে কেবল প্রদর্শিতই হয়নি, সুইজারল্যান্ডে বাণিজ্যিকভাবে পরিবেশিতও হয়েছে। শুধু বিদেশে নয়, দেশেও সুধী মহলে প্রশংসিত হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে এখনো একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও কম বিতর্কিত 'মেরিল-প্রথম আলো সমালোচক পুরস্কার'-এ শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার লাভ করে। একই বছরে নির্মিত তৌকীর আহমেদের *জয়যাত্রা* ছবিটি প্রধান পুরস্কারের দাবি রাখে। ছবিটি মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত উজ্জ্বলতম কাহিনিচিত্র। কিন্তু প্রযোজনা, পরিচালনা, কাহিনি ও চিত্রনাট্যের কোনো একটি পুরস্কারও *শঙ্খনাদ* পেল না, ব্যাপারটি চলচ্চিত্র ইতিহাসে গবেষণার বিষয় হয়ে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবারের জাতীয় পুরস্কারবঞ্চিত ছবিগুলো বাংলাদেশের মুখ অনুজ্জ্বল করে কী অপরাধ করেছে, সেটি দেখা যাক। *নিরন্তর* ছবিটি ভারতের দুটি প্রধান উৎসবের মুখ্য পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছে। কেবল বাংলাদেশে নয়, উপমহাদেশের যেকোনো নির্মাতার জন্য এই সম্মান ঈর্ষণীয়। *স্বপ্নডানায়* ছবিটি সাংহাই উৎসবে পুরস্কার পেয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, হলিউডের *ভ্যারাইটি* পত্রিকায় ছবিটির প্রশংসাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। টরন্টো উৎসবকে বলা হয় 'ফেস্টিভ্যাল অব দ্য ফেস্টিভ্যালস'। প্রতিযোগিতাহীন এই উৎসবে নির্বাচিত হওয়াটাই বড় পুরস্কার। *স্বপ্নডানায়* ছবিটি টরন্টো উৎসবে শুধু নির্বাচিতই হয়নি, প্রশংসিতও হয়েছে। *আহা* ছবিটির ভাগ্য ভালো যে বহু কুলীন উৎসবে নির্বাচিত হলেও আক্ষরিক অর্থে কোনো বিদেশি উৎসবে পুরস্কার পায়নি। পেলে ছবিটি হয়তো বিচারকদের কৃপাদৃষ্টি পেতই না, বরং রোষানলে পড়ত। বিচারকেরা যে ধরনের ছবিকে ডজন ডজন পুরস্কার দিয়েছেন, তাঁদের চোখে *আহার* আধুনিক নির্মাণ দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্যি আশ্চর্যের বিষয়!

আগে শুনেছি, বিচারকেরা বিব্রত হন, কিন্তু পুরস্কারপ্রাপ্তরাও যে পুরস্কার পেয়ে বিব্রত বোধ করতে পারেন, তা এবার জানলাম। একাধিক কলাকুশলী, নির্মাতা আমার কাছে ফোনে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। আমি তাঁদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছি। সাধারণত প্রতিবছর স্বাধীন ও সৃজনশীল ধারার ছবি পুরস্কার পেলে তথাকথিত মূলধারার নির্মাতারা নাখোশ হন। অন্যদিকে সিরিয়াস ধারার নির্মাতারা অখুশি হন ফর্মুলাভিত্তিক বাণিজ্যসর্বস্ব ছবি পুরস্কার পেলে। মজার ব্যাপার হলো, এবার কয়েকজন পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাড়া উভয় ধারার নির্মাতারাই

নিরাশ হয়েছেন। একটি দেশের বিনোদনশিল্পকে উপেক্ষা করে সে দেশের চলচ্চিত্রমাধ্যমের সামগ্রিক বিকাশ ঘটতে পারে না। বাণিজ্যিক কাঠামোয় নির্মিত জনপ্রিয় ছবিগুলোর মূল্যায়ন হওয়া জরুরি। একই মানদণ্ডে সৃজনশীল ও বাণিজ্যমূল্যের ছবির বিচার সম্ভব নয়। এ কারণেই প্রতিবেশী দেশে নান্দনিক বিচারে আয়োজিত জাতীয় পুরস্কারের মূল প্রতিযোগিতার পাশাপাশি 'শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ছবি'র শাখা প্রবর্তিত হয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই উদাহরণ কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয় ছবিকে পুরস্কার প্রদানের ধারা প্রবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছি।

ব্যক্তিগতভাবে আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কমিটির সব সদস্যকেই শ্রদ্ধা করি। তার পরও *মাটির ময়না*র তিক্ত অভিজ্ঞতার পর *অন্তর্যাত্রা* ছবিটি জাতীয় পুরস্কারের জন্য জমা দেওয়া থেকে বিরত থাকি। আমি এখন আরও নিশ্চিত, কাজটি আমি ঠিকই করেছি। আমার মনে হয়, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারকে সাদেক খান ধরনের এক-আধখানা ছবির পরিচালকেরা যেখানে নামিয়ে আনছেন, তাতে অচিরেই সৃজনশীল স্বাধীন ধারার তরুণ নির্মাতারা জাতীয় পুরস্কারের জন্য ছবি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবেন।

বিচারকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ দিতে হয় ৬৯টি ছবি দেড় মাসের মধ্যে দেখে ফেলার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের জন্য। আর অভিনন্দন জানাতে হয় ইমপ্রেস টেলিফিল্মকে গত চার বছরে প্রায় এক শ শতাংশ ছবির পুরস্কার পাওয়ার জন্য। তবে কমিটি সে ক্ষেত্রে সব পুরস্কার ফরিদুর রেজা সাগরকে দিয়ে দিতে পারত। তিনি তাঁর ছবিগুলোর নির্মাতা ও কলাকুশলীদের ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতেন এবং বিচারকমণ্ডলী অহেতুক বিতর্ক থেকে বেঁচে যেতেন।

২০০৮, *প্রথম আলো*

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ

কেবল যদি বর্তমানের ওপর দাঁড়িয়ে বিচার করার চেষ্টা করি, তাহলে খুব আশাবাদী হওয়ার মতো কিছু নেই। আবার যদি শুধু অতীতের তথাকথিত ঐতিহ্যের আলোকে দেখার চেষ্টা করি, তাহলেও আমাদের চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ তেমন উজ্জ্বল নয়। তবে অতীত-বর্তমান মিলিয়ে একটা ইতিবাচক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে হলেও সমষ্টি ও ব্যক্তিগত, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগগুলো পর্যালোচনা করলে চলচ্চিত্র সংস্কৃতি নিয়ে আশান্বিত হওয়ার মতো অনেক কিছুই ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ— চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন ও জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা, অনুদান ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রবর্তন, চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ঐতিহ্য, আশির দশকে শুরু হওয়া স্বাধীন ও বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন ও ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ের চলচ্চিত্রের কিছু ঘটনাপ্রবাহ এ ক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে। ইমপ্রেস টেলিফিল্মের উদ্যোগে গত তিন বছরে তিন ডজন চলচ্চিত্র প্রযোজিত হয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দু এফডিসির বাইরে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের এই ধারাবাহিক উদ্যোগ শুধু সুস্থ রুচিশীল ছবি নির্মাণে নতুন প্রবাহই তৈরি করেনি, একটি বিকল্প ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছে। *মাটির ময়না* ছবির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পর থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রথমবারের মতো ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেতে শুরু করেছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, উল্লিখিত ইতিবাচক উদ্যোগ ও ঘটনাপ্রবাহের পরবর্তী নেতিবাচক পরিণতি দেশের চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে। এফডিসি পর্যবসিত হয়েছে বাণিজ্যিকভাবে ব্যর্থ, কারিগরিভাবে

অকার্যকর, শৈল্পিকভাবে অসফল ছবির মহা-আড়ত হিসেবে। জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভস, যা হওয়ার কথা ছিল শুধু চলচ্চিত্র নয়, জাতীয় স্মৃতির সংরক্ষণাগার, তা পরিণত হয়েছে সিনেমার মহাশ্মশানে। আশির দশকে যখন আর্কাইভস নির্বাসিত হয়েছিল, তখন জহির রায়হান, আলমগীর কবিরসহ অন্যান্য সৃজনশীল নির্মাতার অনেক মূল্যবান ছবি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তার জাতীয় মর্যাদা হারিয়ে বিজাতীয় ছবির পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছে। শুভ সূচিত চলচ্চিত্র অনুদান প্রথা দীর্ঘকাল ধরে পরিণত হয়েছে দলীয় অনুগ্রহ ও সুস্থ ছবির নির্মাতাদের গলগ্রহ হিসেবে। ব্যক্তিস্বার্থে দ্বিধাবিভক্ত ফেডারেশনের ব্যর্থ নেতৃত্বে চলচ্চিত্র সংসদের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবির মধ্য দিয়ে স্বাধীন ধারার যে শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল, এখন তা কেবল টেলিভিশনের বাক্সের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলো পরিণত হয়েছে আঞ্চলিক আন্তকলহে।

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম ফিল্মের সংখ্যার দৌড়ে এগিয়ে থাকতে গিয়ে কেবল গুণের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে তা নয়, সিনেমা হলে দর্শক ফিরিয়ে আনার জায়গায় হলের দর্শককে টিভিমুখী করে তুলেছে। আকাশসংস্কৃতি হোক, ন্যূনতম বিনোদনসফল ছবি নির্মাণের ব্যর্থতাই হোক আর সিনেমা হলের দৈন্যদশাই হোক, বাস্তবতা হলো, মধ্যবিত্তসহ প্রায় সব শ্রেণী বহুদিন হলো সিনেমা হল ত্যাগ করেছে। শুধু হলের নয়, ছবি নির্মাণের অবকাঠামো ভেঙে পড়েছে। দেশের চলচ্চিত্রশিল্প স্থূল বিনোদনমূলক ছবি বানাতেও ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। ফলে বিনোদনহীন প্রান্তিক দর্শক ধরে রাখতে নোংরা ছবি যথেষ্ট না হওয়ায় জুড়ে দিতে হচ্ছে কাটপিস। এ ধরনের নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতিতে আমাদের আশাবাদের সবচেয়ে বড় জায়গা হচ্ছে এই মৃতপ্রায় ইন্ডাস্ট্রি নিজেই। এর ছাইভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠবে আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে প্রথম প্রয়োজন এই মৃতপ্রায় চলচ্চিত্র অবকাঠামোটির মৃত্যু ত্বরান্বিত করা। একটি জাতীয় চলচ্চিত্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নতুন চলচ্চিত্র সংস্কৃতির রূপরেখা গড়ে তুলতে হবে। পুরো চলচ্চিত্র শিল্প-সংস্কৃতিকে ঢেলে সাজানোর জন্য এখনই মোক্ষম সময়। মুক্তবাজার অর্থনীতি আমরা চাই কি না চাই, তা অপ্রতিরোধ্য। সুতরাং, এর কেবল কুফলের ভুক্তভোগী না হয়ে কিছু সুফল ভোগ করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার। অন্য অনেক কিছুর মতো এফডিসির বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রয়োজন অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন ল্যাব-স্টুডিও স্থাপনের কেবল অনুমোদনই নয়, এ ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেওয়াও দরকার। মুক্তবাজার

অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশ্বায়ন। ভারতের বিনিয়োগ অন্য সবকিছুতে হতে পারলে ফিল্ম ল্যাবে হলে ক্ষতি কোথায়? বাণিজ্যনির্ভর হোক আর শিল্পমনস্ক হোক, ন্যূনতম মানসম্পন্ন বা বাণিজ্যসফল ছবি পরিস্ফুটন ও মুদ্রণের কাজ এমনিতে ভারতের চেন্নাই বা মুম্বাই গিয়ে করতে হয়। মনে রাখা দরকার, ষাটের দশকের গোঁড়ার দিকে এই ভূখণ্ডের স্থানীয় চলচ্চিত্রশিল্পের (উভয় অর্থে) উত্থান ও বিকাশ ঘটেছে একাধারে লাহোরের উর্দু ছবি, বোম্বের হিন্দি ছবি, হলিউডের ইংরেজি ছবি ও টালিগঞ্জের বাংলা ছবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। চলচ্চিত্রশিল্পের যে অংশটি জনগণের স্বার্থে সরাসরি সম্পর্কিত, তা হলো সিনেমা হল-শিল্প। এখানেই সাধারণ মানুষ টিকিট কেটে শুধু এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখছে তা নয়, টিকিটের মূল দামের সঙ্গে ১০০ শতাংশ করও দিচ্ছে সরকারকে। এই করের মাধ্যমেই সরকার লাভজনকভাবে এ শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং, জনগণ ও সরকারের স্বার্থে সিনেমা হলগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো আশু প্রয়োজন এবং তা সরকারেরই দায়িত্ব। প্রতিবছর বহু সিনেমা হল ভেঙে শপিং কমপ্লেক্স হচ্ছে। অথচ প্রতিবেশী ভারত, এমনকি পাকিস্তানের প্রতিটি নতুন শপিং কমপ্লেক্সে একাধিক মাল্টিপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। সিনেমা হল শিল্পের এই অপমৃত্যুর প্রবণতা বন্ধ করতে অচিরেই নির্বাচিত বাইরের ছবি, বিশেষ করে ভারতের পশ্চিম বাংলার ছবির সঙ্গে সুস্থ প্রতিযোগিতা ফিরিয়ে আনতে হবে। এতে কেবল সিনেমা হলগুলোই চাঙা হবে না, সামগ্রিক চলচ্চিত্র নির্মাণশিল্প বৃহত্তর বাজার লাভ করবে। আমরা চাই কিংবা না চাই, বলিউড আমাদের দুই বাংলার ছবিকে গ্রাস করবে। বিশ্বায়নের এই অনিবার্য প্রক্রিয়াকে কিছুদিনের জন্য হলেও থামিয়ে রাখতে দুই বাংলার ছবির বাজার বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

প্রারম্ভিক সাফল্যের পরও অনুদান প্রথা প্রধান দুটি দলের রেষারেষির শিকারে পরিণত হয়েছে। যে দলটির আমলে প্রথাটি প্রবর্তিত হয়েছে, তারা এটির দলীয়করণ করে ছেড়েছে। অন্যদিকে অন্য দলটি ক্ষমতায় এসে এটি তাদের আমলে চালু হয়নি বলে কখনোই আমলে নেয়নি। তবে আশার খবর হচ্ছে, সামরিক সমর্থনপুষ্ট সাময়িক সুশীল সরকার প্রথমবারের মতো একটি নিরপেক্ষ কমিটি গঠনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তিনটি ছবিকে অনুদান দিয়েছে। যে তিনজন নির্মাতা এবার অনুদান পেয়েছেন, তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী কাজের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতার প্রমাণ রেখেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, চলচ্চিত্রজনদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অবশেষে বর্তমান সরকার অনুদানের অঙ্ক ২৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৪০ লাখে উন্নীত করেছে।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তার জাতীয় গুরুত্ব অনেক আগেই হারিয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি সেতু, এমনকি কালভার্ট উদ্বোধনে এত ব্যস্ত থাকেন যে পাঁচ বছরে জমে থাকা পুরস্কার এক বছরে দেওয়ার সময় পান না। গত কয়েক বছরের জাতীয় পুরস্কার এতটাই বিতর্কিত হয়েছে যে, সরকারপ্রধান তা হস্তান্তর করতে বিব্রতবোধ করছেন। দলীয় বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে গঠিত জোট সরকারের জুরি বোর্ড কেবল নিজেদের বোর্ড সদস্যকেই পুরস্কার দিয়েছে তা নয়, সৃজনশীল ধারার ছবিকে পুরস্কারের পরিবর্তে তিরস্কার করার ঔদ্ধত্যও দেখিয়েছে। (*প্রথম আলোর* বিনোদন পাতায় জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান সাদেক খানের *মাটির ময়নাকে* পুরস্কার না দেওয়ার আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি স্মর্তব্য)। আশার কথা, কাগজে পড়লাম, আগের সরকারের আমলে বিতর্কিত পুরস্কার বাতিল করে পুরস্কার পুনর্নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

চলচ্চিত্রের যে প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশি হতাশা তা হলো, জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভস। দীর্ঘদিন সংসদ ভবনের সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে নির্বাসিত থাকার পর সৌভাগ্যক্রমে যথাযোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্বে নতুন জীবন পাচ্ছে বলে মনে হয় প্রতিষ্ঠানটি। অনেক বছর পর দেখলাম, মহাপরিচালকের কক্ষটিই কেবল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়, চলচ্চিত্র সংরক্ষণের ভল্টগুলোতেও এয়ার কন্ডিশনার কাজ করছে। ইতিমধ্যে ফিল্ম থেকে ডিজিটাল ট্রান্সফারের দামি অথচ অত্যাবশকীয় যন্ত্র ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। তবে আর্কাইভসের সাম্প্রতিক কর্মচঞ্চলতায় আমি যেমন আশান্বিত, তেমনি আর্কাইভসের দৃষ্টিকোণ থেকে গৌণ ও অপ্রধান কর্মকাণ্ডে অতি উৎসাহ ও অতি তৎপরতা আমাকে শঙ্কিত করে তুলেছে। যে প্রতিষ্ঠানের সৃজনশীল ছবি ক্রয়ের বাজেট নেই, তারা একের পর এক সেমিনার, প্রকাশনা, ফিল্ম কোর্স চালিয়ে যাচ্ছে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলোর জন্য চলচ্চিত্র সংসদ, চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণকেন্দ্রসহ অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর্কাইভসের সব অর্থ, লোকবল ও প্রাণশক্তি ব্যয় করা উচিত চলচ্চিত্র সংগ্রহে।

এফডিসি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের পাদপীঠ। প্রতিষ্ঠানটির মৌলিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন ছাড়া চলচ্চিত্রের বর্তমান স্থবিরতা থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। সেন্সর বোর্ড ও প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এফডিসি ইদানীং নোংরা ছবির বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সফল ভূমিকা নিচ্ছে, এটি ভালো কথা, কিন্তু সৃজনশীল ছবির কথা বাদই দিলাম, এমনকি কারিগরিভাবে ন্যূনতম মানসম্পন্ন ও বাণিজ্যিকভাবে মোটামুটি সফল ছবির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এফডিসির খোলনলচে বদলে ফেলতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির বিরাষ্ট্রীয়করণ ছাড়া

তা সম্ভব কি না, যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের যতগুলো ব্যবসাসফল বা শিল্পসম্মত ছবি তৈরি হয়েছে, তার সিংহভাগ তৈরি হয়েছে এফডিসির কারিগরি সহযোগিতা ও স্টুডিও সিস্টেমের বাইরে। প্রধানত ইমপ্রেস টেলিফিল্মের বিকল্প ব্যবস্থাপনায় ও উদ্যোগে। দেশীয় ছবির কারিগরি মান অর্জনে এ ক্ষেত্রে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে চলচ্চিত্রের অবকাঠামো নির্মাণে পরিকল্পিত বিনিয়োগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ইমপ্রেস টেলিফিল্মের এখন সময় হয়েছে বিজ্ঞাপনভিত্তিক চ্যানেল প্রিমিয়ার ও মাঝারি মানের আন্তর্জাতিক উৎসবের দিকে নজর না দিয়ে দেশে ও দেশের বাইরের সিনেমা হল-ভিত্তিক বৃহত্তর বাজার সৃষ্টিতে সচেষ্ট হওয়ার। সত্তরের দশকের পর এফডিসিকেন্দ্রিক স্টুডিও ব্যবস্থা থেকে একটিও সৃষ্টিশীল সমাজমনস্ক চলচ্চিত্র বেরিয়ে আসেনি। যে কটি ছবি দেশের মধ্যে অথবা বাইরে নন্দিত বা পুরস্কৃত হয়েছে, তার প্রায় শতভাগই স্বাধীন ধারায় নির্মিত চলচ্চিত্র। এই স্বাধীন ধারার ছবিগুলোই দেশের বাইরে চলচ্চিত্রের বাজার সৃষ্টিতে ইতিমধ্যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে ও রাখছে। দেশের মধ্যেও এই ধারার ছবিগুলো সফল মুক্তির মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত দর্শককে আবার হলমুখী করতে চলেছে। এ কারণেই স্বাধীন ধারার নির্মাতাদের নিজেদের বিকল্প ধারায় সীমিত না রেখে জাতীয় চলচ্চিত্রের হাল ধরার দায়িত্ব নিতে হবে।

ষাটের দশকে গড়ে ওঠা চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন নতুন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার কার্যকারিতা অনেক আগেই হারিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দূতাবাস থেকে চলচ্চিত্র সংগ্রহ করে নির্বাচিত দর্শককে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের স্বাদ দেওয়া একটা অবাস্তব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল যুগে ডিভিডি বিপ্লবের কল্যাণে প্রায় যেকোনো ছবিই এখন আগ্রহী দর্শকের হাতের মুঠোয়। এ ছাড়া বড় পর্দার চলচ্চিত্র প্রদর্শনের দায় নেওয়ার জন্য বছরব্যাপী হরেক রকমের চলচ্চিত্র উৎসবের দোকান খোলার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। তাহলে সংসদগুলোর কার্যক্রম কী হওয়া উচিত? সিনেমা হলে বা টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয় না, এ ধরনের সিরিয়াস সৃজনশীল ও নিরীক্ষামূলক ছবির প্রদর্শন, নিয়মিত সিরিয়াস প্রকাশনা, চলচ্চিত্র সংস্কৃতিবিষয়ক সেমিনার, কর্মশালা ও গবেষণা। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই নিম্নমানের প্রজেকশন ও সাউন্ড সিস্টেমে সংসদগুলো পাইরেটেড ডিভিডি দেখানোর মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমিত রাখছে। চলচ্চিত্র সংসদগুলো এই সময়ের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে জরুরি যে ভূমিকাটি নিতে পারত তা হলো, সরকার ও চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর সৃজনশীল ছবির স্বার্থে চাপ সৃষ্টি ও পরামর্শ প্রদান। কিন্তু চলচ্চিত্র সংসদের মধ্যে বিদ্যমান ক্রনিক অন্তর্কলহ ও বিভক্তির কারণে তা কখনোই সম্ভব হচ্ছে না। চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের এই অন্তর্বিবাদের সুযোগ নিয়ে সরকার যা ইচ্ছা করতে পারছে। চলচ্চিত্র সংসদ-উদ্ভূত দুটি বিবদমান প্রধান চলচ্চিত্র উৎসব কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। তাদের রেষারেষির সুযোগ নিয়ে সেন্সর বোর্ড উৎসবে প্রদর্শিত প্রতিটি বিদেশি ছবির জন্য বড় অঙ্কের ফি চাপিয়ে দেওয়ায় বেসরকারি পর্যায়ে উৎসব আয়োজন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকারের উচিত, যত দিন পর্যন্ত নিজে আন্তর্জাতিক মানের একটি নিয়মিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করতে না পারে, তত দিন এই অর্থদণ্ড নীতি পরিহার করা। আশির দশকের শুরুতে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নামের আড়ালে স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্রের যে সূচনা হয়েছিল, কেবল টেলিভিশনের হাতছানির কাছে তা সাময়িক পরাজয় বরণ করলেও সেই কেব্‌ল টেলিভিশনের গোকূলেই বেড়ে উঠছে স্বাধীন ধারার এক নতুন প্রজন্ম। এ প্রজন্ম টিভি তথা ভিডিও মাধ্যমের ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে অচিরেই এই স্বাধীন ধারাকে মূল ধারায় রূপান্তরিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। তার পদধ্বনি ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি চলচ্চিত্রমাধ্যমটিকে এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কারিগরি শিকল থেকে মুক্তি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পকে। এই ডিজিটাল যুগের আবির্ভাবের কারণেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখা সম্ভব। কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম ব্যয়বহুল বিশালায়তনের মান্ধাতা প্রযুক্তিকে এড়িয়ে সস্তায় ও সহজে শত ফুল ফোটাবে, এটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে সরকার কোনো সক্রিয় ভূমিকা নিতে না পারলে অন্তত বাধা হয়ে না দাঁড়ানোর নিশ্চয়তা দরকার। তবে ভবিষ্যতের এই সুন্দর সম্ভাবনা কেবল স্বপ্ন থেকে যাবে, যদি না যথাসময়ে এই নতুন প্রযুক্তি ও প্রতিভা মাথায় রেখে দ্রুত জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা হয়। সরকার অনেক ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিয়েছে। আমি আশা করব, চলচ্চিত্রশিল্পের (উভয় অর্থে) কথা তারা গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখবে। কারণ, চলচ্চিত্র মাধ্যম কেবল একটি ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্পই নয়, রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ বাহনও বটে।

টেলিভিশন চ্যানেলের চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ : একটি পর্যালোচনা

সিনেমা শিল্প অন্ধকারাচ্ছন্ন। অদ্ভুত আঁধার এক সৃজনশীল চলচ্চিত্রের জগতে। মুখ ও মুখোশ একাকার। মুড়ি মুড়কির এক দর। সিনেমা হলে কেবল বোমা হামলাসর্বস্ব ছবি চলছে তা-ই নয়, বাস্তব বোমা হামলার শিকার হচ্ছে হলগুলো। পূর্ণদৈর্ঘ্য বাণিজ্যিক ছবি আর বাণিজ্য করছে না, জুড়ে দিতে হচ্ছে তার সঙ্গে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি-কাটপিস। আকাশ সংস্কৃতির কল্যাণে ঢালিউডের ডার্টি বোমাগুলো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে মধ্যবিত্তের রক্ষণশীল গৃহকোণে। নোংরা ছবির নির্মাতারাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন 'নোংরা ছবি' ও 'নোংরা শিল্পীদের' বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে। পৃথিবীজুড়ে শপিং মলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গড়ে উঠছে মিনি থিয়েটার ও মাল্টিপ্লেক্স, অথচ আমাদের দেশে একের পর এক সিনেমা হল ভেঙে গড়ে উঠছে শপিং কমপ্লেক্স। ফিল্ম আর্কাইভস পরিণত হয়েছে চলচ্চিত্রের কবরস্থানে। অনুদান হয়ে পড়েছে দলীয় আনুগত্য আর অনুগ্রহের অন্য নাম। সেন্সর বোর্ডের মতো একটি মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠানের পেশি শক্তিশালী করতে ব্যস্ত, এমনকি চিত্রনির্মাতারাও।

চলচ্চিত্রশিল্প যখন এমনই 'শঙ্খনীল কারাগারে' আটকে ছিল, তখন কেবল 'হঠাৎ বৃষ্টি' নয়, এক কালবৈশাখী ঝড় নিয়ে এসেছে বেসরকারি টেলিভিশন, প্রধানত স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'চ্যানেল আই'। গত তিন বছরে চ্যানেল আই একাই নির্মাণ করেছে দেড় ডজন ছবি। তাদের নির্মাণাধীন আছে আরও বেশ কয়েকটি ছবি। এটিএন টেলিভিশনও বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে। সম্প্রতি চলচ্চিত্র প্রযোজনায় অবতীর্ণ হয়েছে এনটিভি। বেশ হাঁকডাক দিয়ে, ঢাকঢোল পিটিয়ে আরও নতুন কয়েকটি

চ্যানেল আসছে, তারাও যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, বলাই বাহুল্য। সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রশিল্প ও সংস্কৃতিতে এই উদ্যোগ ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে এবং ফেলবে। যেখানে একমাত্র সরকারি টেলিভিশন বিটিভি এমনকি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলো কিনে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে না, সেখানে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় বেসরকারি টেলিভিশনগুলো এগিয়ে এসেছে, এটা নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। সুস্থ বিনোদনের সমাজমনস্ক চলচ্চিত্র প্রযোজনার মাধ্যমে এক নতুন আশার সঞ্চার হতে চলেছে।

ইতিমধ্যেই দু-একজন শক্তিশালী তরুণ চলচ্চিত্রনির্মাতার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অন্য চ্যানেলগুলো টিভি প্রিমিয়ারের মাধ্যমে এগিয়ে এসেছে। চারদিকে বেশ সাজসাজ রব। উভয় ধারার প্রবীণ-নবীন সবাই সমান সুযোগ পাচ্ছেন। চ্যানেলগুলো প্রযোজনায় এগিয়ে আসায় সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এক নতুন দিকের উন্মোচন হয়েছে। ঢালিউড সিনেমার এই মুমূর্ষু সময়ে ছোট পর্দার প্রাগ্রসর উদ্যোক্তারা বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেন। আশার দিক হচ্ছে, একদিকে ঢালিউডের সুস্থ বিনোদন ধারার যেসব নির্মাতা অবস্থাদৃষ্টে স্বেচ্ছা-অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, চ্যানেলগুলোর চলচ্চিত্র প্রযোজনা তাদের চলচ্চিত্র নির্মাণে ফিরিয়ে আনছে। অন্যদিকে সৃজনশীল স্বাধীন ধারার নির্মাতাদের অনেকে হয় টিভি প্রিমিয়ারের মাধ্যমে এই ধারায় যুক্ত হচ্ছেন অথবা সরাসরি চ্যানেলের প্রযোজনায় ছবি নির্মাণ করছেন। আরেক দিকে ছোট পর্দার নির্মাতারা বড় পর্দার নির্মাণে সুযোগ পাচ্ছেন। ভিডিও ফরম্যাটে প্রচুর শুটিং ও সম্পাদনা করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা নিয়ে চলচ্চিত্রমাধ্যমে নতুন রক্তের সঞ্চার হতে চলেছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, সেলুলয়েডে শুটিং করলেই সেটা চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে না, যেমন কোনো ধ্রুপদি চলচ্চিত্র টেলিভিশনে দেখালে তা টেলিফিল্ম বা নাটক হয়ে যায় না। এর জন্য টিভি নাটক বা সিরিয়ালের ভাষা থেকে কিছুটা ভিন্ন চলচ্চিত্রের ভাষাটির দিকেও আমাদের খেয়াল রাখা দরকার।

চলচ্চিত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রে টেলিভিশন সব দেশেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কখনো প্রদর্শনের মাধ্যমে, কখনো নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখে থাকে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে চ্যানেল ফোর, ফ্রান্সের কানালপুস ও আর্তে, জার্মানির জিডিএফ, জাপানের এনএইচকে, অস্ট্রেলিয়ার এবিসি, কানাডার *সিবিসি* ও যুক্তরাষ্ট্রের *এইচবিও* উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় চলচ্চিত্র সংস্কৃতির প্রসারে, বিশেষ করে সরকারি টেলিভিশনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। ভারতে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া প্রতিটি

চলচ্চিত্র সরকারি টেলিভিশন কেন্দ্র *দূরদর্শন* কিনে নিতে ও তা প্রদর্শনে বাধ্য থাকে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি ভারতে মূলত দূরদর্শনের উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে 'প্রসার ভারতী' নামে একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ভারতীয় স্বাধীনতা ও পরবর্তী গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে ভিত্তি ও পটভূমি করে প্রতিষ্ঠানটি বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে। অন্যদিকে ভারতের বেসরকারি চ্যানেলগুলো ক্লাসিক ও সমসাময়িক কালে নির্মিত ছবিগুলো প্রদর্শন ছাড়াও বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অর্থায়নে ভূমিকা রাখছে। পশ্চিম জার্মানিতে 'নিউ জার্মান সিনেমা'র বিপ্লবের পেছনে ছিল দু-তিনটি টেলিভিশনের উদ্যোগ ও অবদান। ফাসবিন্ডার, ভারনার হেরজগ ও ভিম ভেন্ডারের মতো নির্মাতাদের সিংহভাগ ছবি টেলিভিশনের অর্থায়নে তৈরি হয়েছে। ফ্রান্সের কানাল পুস ও যুক্তরাজ্যের চ্যানেল ফোরের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। চ্যানেল ফোরের অর্থায়নে আশির দশকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। এখানে অনেকেরই হয়তো মনে আছে, চ্যানেল ফোরের কল্যাণে লন্ডনপ্রবাসী বাংলাদেশি পরিচালক রুহুল আমিন *এ কাইন্ড অব ইংলিশ* নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ পেয়েছিলেন।

তবে কোনো দেশেই টেলিভিশনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সরাসরি ও নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় তেমন এগিয়ে আসেনি, তারও কিছু কারণ রয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাণ কেবল আর্থিকভাবে ও কারিগরি তথা আয়োজনের দিক দিয়ে জটিল মাধ্যমই নয়, এর পরিবেশনা, প্রদর্শনব্যবস্থা নিজেই একটি ভিন্ন বিশাল কর্মযজ্ঞ ও বিরাট জগৎ। মাধ্যমটি একক মনোযোগ ও উদ্যোগ দাবি করে। টেলিভিশন ও তার নিজস্ব কর্মকাণ্ডের পরিধি এমনিতেই ব্যাপক। চলচ্চিত্র প্রযোজনার মতো বিশাল যজ্ঞে যোগদান করলে টেলিভিশনের পক্ষে তার নিয়মিত অনুষ্ঠানের মান বজায় রাখা কঠিন। টেলিভিশন একটি পুরোপুরি স্বতন্ত্র বিনোদন ও গণমাধ্যম। আধুনিক সময়ের টেলিভিশন প্রায় সরাসরি নির্মাণ ও প্রদর্শন—এভাবেই চলে। যে অনুষ্ঠানগুলো লাইভ নয়, তা-ও অনেক ক্ষেত্রে দিনেরটা দিনেই শেষ করতে হয়। এর ফলে মান বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে একটি টেলিভিশন চ্যানেল পরিচালনা একক মনোযোগের দাবি রাখে, বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে যখন প্রতি মাসে একটি করে নতুন চ্যানেল আগমনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। এই বাস্তব কারণেই বহির্বিশ্বে টিভি চ্যানেল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে সরাসরি যুক্ত না হয়ে সম্পূরক ভূমিকা পালন করছে।

তবে বাংলাদেশে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলোর সরাসরি চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসার কিছু স্থানীয় বাস্তব কারণ রয়েছে। ২৪ ঘণ্টা সময় পূরণ করতে যেকোনো চ্যানেলেরই নিজেদের নির্মিত অনুষ্ঠান যথেষ্ট নয়। স্থানীয় চলচ্চিত্রশিল্পের তরফ থেকে পর্যাপ্ত চলচ্চিত্র সরবরাহ করার ব্যর্থতাই এই তাগিদ সৃষ্টি করেছে। অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো গোড়ার দিকে ঢালিউডের খুবই নিকৃষ্ট মানের ছবির নিম্নমানের টেলিসিনে ভিডিও দেখিয়ে সময় পূরণ করত। সে সময় ঢালিউড থেকেই একধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। ঢালিউডের মুমূর্ষু ছবির মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর জন্য তারা ব্যাপকভাবে বেসরকারি টেলিভিশনে 'বাংলা সিনেমা' প্রদর্শনকে দায়ী করেছিল। মজার ব্যাপার, আজ ঢালিউডভিত্তিক চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি টিভি চ্যানেলের চলচ্চিত্র প্রযোজনার মধ্য দিয়েই পুনরুজ্জীবিত বোধ করছে। যদিও চ্যানেল প্রযোজিত বেশির ভাগ ছবি ঢালিউডের নিজস্ব অবকাঠামো (চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার ল্যাব সুবিধাদি) ব্যবহার করছে না।

টিভি প্রযোজনার এই নতুন প্রবাহের ভালো দিকগুলোর পাশাপাশি কিছু সমস্যার দিকে আলো ফেলতে চাই। টিভি নাটকের তুলনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের আয়োজন, সময় ও বাজেট আলাদা হতে বাধ্য। টেলিভিশনের অর্থায়নে তৈরি ছবিগুলোর নির্মাতারা যথাযোগ্য প্রস্তুতির সময় ও বাজেট পাচ্ছেন না বলে নালিশ আছে। দেশীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক হোক, সৃজনশীল হোক, নতুন জোয়ার আনতে হলে ঢালিউডের বস্তাপচা ফর্মুলা ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে। মজার বিষয়, চ্যানেল কর্তৃপক্ষ নাটকের ক্ষেত্রে যেসব ফর্মুলা ভেঙেচুরে অনায়াসে নতুন প্রতিমা গড়ে তুলেছেন, ছবি নির্মাণে এসে তাঁদের ড্রামার চার দেয়াল ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে তারা মেলোড্রামায় নেমে আসছেন। এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার যে, চ্যানেলগুলো তাদের নাটকের মধ্য দিয়ে একরাশ নতুন তারকা সৃষ্টি করলেও ছবি বানাতে গিয়ে সেই তারকাদের ওপর অনেক সময় তারা ভরসা করতে পারছেন না। কখনো কখনো পরিচালকদের কাঁধে তারা চাপিয়ে দিচ্ছে ঢালিউডের মেলোড্রামাসর্বস্ব নায়ক-নায়িকাদের। আত্মবিশ্বাসের এই চরম অভাব সত্যিই পীড়াদায়ক। ঢালিউড তারকাদের শুধু ক্যামেরার সামনে নয়, ক্যামেরার পেছনেও ব্যবহার করছে তারা। তারকা দিয়ে ছবি বানালে ভালো প্রচার আর ভালো বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, কিন্তু সিনেমা হলে দর্শক পাওয়া যায় কি না, আমার জানা নেই। আরেকটি ব্যাপার, কেবল অর্থলগ্নিই চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজ নয়।

পরিচালনার মতো এটিও একটি সৃষ্টিশীল দায়িত্ব। পরিকল্পিত আয়োজন, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রযোজক ও প্রযোজনা সংস্থার। কিন্তু বাস্তবে টেলিভিশন প্রযোজিত ছবির ক্ষেত্রে পরিচালককে শিল্পী, কলাকুশলী নির্বাচন ও পরিচলনার কাজটি ছাড়াও কার্যত প্রযোজকের দায়দায়িত্বও পালন করতে হয়, যা চলচ্চিত্রটির জন্য ক্ষতিকর।

চ্যানেল প্রযোজিত ছবির ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতাটি হচ্ছে, করপোরেট অর্থনীতি বা বিজ্ঞাপন-নির্ভর পরিবেশনা। সব দেশেই বিজ্ঞাপনের বিরতি সহ্য করেই টেলিভিশনে চলচ্চিত্র দেখতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে চলচ্চিত্র বিরতি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেখতে হয়। এর কারণ, চলচ্চিত্রটি পুরোপুরি বিজ্ঞাপন অর্থায়নের ভিত্তিতে নির্মিত। বিজ্ঞাপনে ক্ষত-বিক্ষত যে চলচ্চিত্রটি টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয়, তার পুরোটা দেখার ধৈর্য কোনো দর্শকেরই থাকে না। এ ক্ষেত্রে টিভি প্রিমিয়ার নিজেই একধরনের বিজ্ঞাপনের কাজ করে মাত্র। বিজ্ঞাপন-নির্ভরতা কমাতে টিভি চ্যানেলকে চলচ্চিত্র নির্মাণে পেশাদার অর্থায়নের পথ খুঁজতে হবে।

সাংস্কৃতিক অর্থে চলচ্চিত্রের মানে হলো 'তুলনামূলকভাবে একটি বড় আকারের অন্ধকার ঘরে একত্রে অনেকের অথচ নিঃশব্দ একাকিত্বের সঙ্গে বড় পর্দার কাছে আত্মসমর্পণ'। ইংরেজি শব্দ 'সিনেমা'র সবচেয়ে ব্যবহৃত অর্থ প্রেক্ষাগৃহ। চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি ও সংস্কৃতির পাদপীঠ হচ্ছে সিনেমা হল। সিনেমা হলের সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে বাইরে রেখে চলচ্চিত্র শিল্পকে চাঙা করা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্র অর্থনীতিরও প্রাণকেন্দ্র প্রেক্ষাগৃহ। এখানে জনগণের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। এখানেই দর্শকেরা প্রতিটি টিকিটের ৬০ শতাংশ টাকা প্রমোদ কর হিসেবে দিয়ে চলচ্চিত্রশিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এখানেই সরকার চলচ্চিত্র থেকে আয় করছে। চলচ্চিত্রশিল্পের বাকি সব খাতেই সরকার ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। চলচ্চিত্রশিল্পের প্রযোজনায় যাঁরা লগ্নি করেন, তাঁরা অসুবিধা দেখলেই তাঁদের পুঁজি অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারেন। চলচ্চিত্রের প্রদর্শনব্যবস্থায় যাঁরা অর্থ লগ্নি করছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলেই প্রেক্ষাগৃহের জমিসহ সব স্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তি নগদ টাকায় স্থানান্তরিত করে হঠাৎ সরে পড়তে পারেন না। ছবি দেখতে দর্শককে যদি সিনেমা হলেই না আনা গেল, সিনেমা হলের শিল্পই যদি চাঙা না হলো, তাহলে সেলুলয়েডে শুটিং করা কেন? বিজ্ঞাপনের টাকায় টিভি প্রিমিয়ারের মাধ্যমে বিনিয়োগ তুলে ফেলে একটি বা দুটি হলে প্রতীকী মুক্তি দিয়ে চলচ্চিত্রশিল্পের আরাধ্য মুক্তি সম্ভব নয়। তার চেয়ে ডিজিটাল ফরম্যাটে অনেক অল্প বাজেটে যত্ন নিয়ে

সত্যিকারের ভালো টেলিফিল্ম তৈরি করা নয় কেন? দুঃখজনক হলেও সত্য, টিভি চ্যানেলের প্রযোজনায় নির্মিত ভালো টেলিফিল্মের সংখ্যা নেই বললেই চলে। যে কয়েকটি উন্নত মানের টেলিফিল্ম তৈরি হয়েছে, তার প্রায় সব কটিই ব্যক্তি-উদ্যোগে নির্মিত। অন্যদিকে গত কয়েক বছরে *ব্যাচেলর* ছাড়া অন্য যে দুটি ছবি (*মনের মাঝে তুমি* ও *মোল্লা বাড়ীর বউ*) সর্বাধিক ব্যবসায়িক ও দর্শকসাফল্য পেয়েছে, সে দুটি ছবিই চ্যানেল প্রযোজনার বাইরে নির্মিত হয়েছে। আজকের আলোচনায় টেলিভিশন চ্যানেলের চলচ্চিত্র প্রযোজনার নৈতিক একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। টেলিভিশন কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি সংবাদমাধ্যমও। অন্যান্য সংবাদের মতো চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্র সংস্কৃতির ও ইন্ডাস্ট্রি-সংক্রান্ত সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা একান্ত জরুরি। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজনা, পরিবেশনা ও বিপণনে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়লে পক্ষপাতিত্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। কোন ছবিটি গণমাধ্যমে কতটুকু পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে, তা ছবিটির মান নির্ধারণ না করে চ্যানেলের সম্পৃক্ততার ওপর নির্ভর করবে। কোনো ছবি অযৌক্তিকভাবে সেন্সরের শিকার হলে সংবাদমাধ্যম হিসেবে একটি চ্যানেল যেভাবে দর্শক ও নির্মাতার অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে, চলচ্চিত্র ব্যবসায় যুক্ত হয়ে পড়লে তাদের পক্ষে সে রকম শক্ত অবস্থান নেওয়া সম্ভব হবে না, এমনকি ছবিটি তাদের নিজেদের ব্যানারে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও। চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক স্থবিরতা, চলচ্চিত্র সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অব্যবস্থার ব্যাপারে চ্যানেলগুলো তখনই সোচ্চার ও সাহসী প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে, যখন তারা চলচ্চিত্র স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত নয়। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, কেবল সংখ্যার দিকে ধাবিত না হয়ে এবং তাড়াহুড়ো না করে আরেকটু নির্বাচিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি টেলিভিশন চ্যানেল চলচ্চিত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

ক. গত পঞ্চাশ বছরে নির্মিত সৃজনশীল, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বা বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জনকারী ছবিগুলোর ভিডিও ও সম্প্রচার স্বত্ব কিনে নিয়ে ডিজিটাল ও লিকুইডগেট ট্রান্সফার করে তার মানসম্পন্ন সম্প্রচার করা।

খ. চ্যানেলগুলো নির্মাণাধীন ছবির টেলিভিশন প্রচার স্বত্ব অগ্রিম কিনতে পারে। এতে করে যেমন উপকৃত হবে ছবিটির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান, তেমনি কম দামে স্বত্ব কিনে লাভবান হতে পারে চ্যানেলগুলোও।

গ. বেসরকারি চ্যানেলের উদ্যোগে আধুনিক টেলিসিনে যন্ত্র ক্রয় ও স্থাপনের ব্যবস্থা করা। দুঃখজনক হলেও সত্য, বিটিভিসহ একটি চিভি চ্যানেলেরও ন্যূনতম মানসম্পন্ন টেলিসিনে সিস্টেম নেই। শুধু টিভি সম্প্রচার নয়, ডিভিডি ও ভিসিডির প্রয়োজনে আধুনিক একটি টেলিসিনে যন্ত্রের বাণিজ্যিক যথার্থতা রয়েছে। প্রতিবছর নির্মিত ছবিগুলোর মধ্যে যেসব নির্মাতা ন্যূনতম মানের টেলিসিন করতে চান বা করেন, তাঁরা বিদেশি মুদ্রা খরচ করে এবং অনেক হাঙ্গামা করে ভারত থেকে তা করিয়ে আনেন।

ঘ. টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তাদের পরিচিত কারিগরি অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে উচ্চমানের ডিজিটাল ফরম্যাটে টেলিফিল্ম বানিয়ে তা পরবর্তী সময়ে যথাযথ পরিবেশকের আগ্রহ সাপেক্ষে ৩৫ মিলিমিটারে রূপান্তরিত করে সিনেমা হলে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে।

ঙ. টেলিভিশন চ্যানেলের চলচ্চিত্র উদ্যোগে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রযোজক ও পরিবেশকদের যৌথ প্রযোজক হিসেবে যুক্ত করতে পারে এবং প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশনার দিকটি চলচ্চিত্র পরিবেশকদের হাতে ছেড়ে দিতে পারে।

চলচ্চিত্রশিল্প চূড়ান্ত বিচারে নির্মাতার মাধ্যম। নির্মাণপ্রক্রিয়ার যাবতীয় সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েও প্রতিভাবান নির্মাতারা তাঁদের নিজেদের প্রকাশ করার পথ খুঁজে পাবেন। চ্যানেল আইসহ টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যে নির্মাণপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে, তা অবশ্যই আমাদের চলচ্চিত্রকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাবে। সব সীমাবদ্ধতার পরও চলচ্চিত্রনির্মাতাদের দায়িত্ব এই নতুন ধারার ও ধরনের সংযোগকে কাজে লাগিয়ে চলচ্চিত্রের এই নতুন জয়যাত্রা অব্যাহত রাখা।

ডিজিটাল মাধ্যম ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের একাডেমিক অঙ্গনে সিনেমা শব্দের পরিবর্তে 'মুভিং ইমেজ' শব্দটি প্রবর্তনের জোরালো তাত্ত্বিক আওয়াজ তোলা হচ্ছে। মনে হচ্ছে, চলচ্চিত্রের বৃহত্তর সংজ্ঞা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। লক্ষ করার বিষয়, 'মুভিং ইমেজ' শব্দটি বাংলা 'চলচ্চিত্র' শব্দের আক্ষরিক অর্থের অনেক কাছাকাছি। চলচ্চিত্র কোনো দ্রব্য বা পদার্থের নাম নয়, এটি একটি শিল্পমাধ্যম। দৃশ্যকে সেলুলয়েডে ধারণ করলেই তা চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে না, যেমন টেলিভিশনে কোনো ধ্রুপদি ছবি সম্প্রচার করলেই তা টেলিফিল্ম বা নাটক হয়ে যায় না। কারিগরি অর্থে সিনেমার সংজ্ঞা বারবার বদলেছে। মাধ্যমটির আকার-প্রকারের সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধনে 'গেল গেল' রব উঠেছে। কিন্তু বোদ্ধাজনের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে, সিনেমার মৃত্যু ঘটেনি।

সিনেমা প্রযুক্তির ফসল। নতুন উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এটা সত্য, নির্বাক যুগের বাঙ্ময় ছবিতে আমরা 'শিশিরের শব্দ' শুনতে পেতাম, আর আজকের ছবি সারাক্ষণ বকবক করে। তাই বলে এত কাল পরে মাধ্যমটির কণ্ঠ রোধ করা বোধ হয় ঠিক হবে না। বহুকাল সাদা-কালোর আলো-ছায়া ছিল চলচ্চিত্রের মূল বিশেষত্ব। তাতে রং লাগলে 'সর্বনাশ' হয়ে যাবে বলে তখনকার ডাকসাইটে নির্মাতারা আশঙ্কা করেছিলেন। এখন অবশ্য *অশনিসংকেত* দেখে আমরা মেনে নিয়েছি, দুর্ভিক্ষেরও রং আছে। ৩৫ মিলিমিটারের সঙ্গে ১৬ মিলিমিটারের পার্থক্য মূলত মাত্র ১৯ মিলিমিটারের—এ কথা মানতে অনেক চলচ্চিত্রপণ্ডিতই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ষাট-সত্তর এমনকি আশির দশকের প্রথম সারির অনেক নির্মাতাই তাঁদের মাস্টার পিস তৈরি করেছেন ১৬ মিলিমিটার ফরম্যাটে। শুধু

তা-ই নয়, প্রখ্যাত জার্মান চলচ্চিত্রকার ফাসবিন্ডারের *আলেকজান্ডার প্লাস* নামক বায়ান্ন পর্বের টিভি সিরিয়াল মাস্টার পিস হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশেও তার উদাহরণ রয়েছে—তানভীর মোকাম্মেলের *চিত্রা নদীর পাড়ে* ও মোরশেদুল ইসলামের *চাকায়*।

কেউ কেউ ধর্মাচারের সঙ্গে চলচ্চিত্র সংস্কৃতির মিল খুঁজে পান। ধর্মের দুটো দিক আছে—অনুশাসন ও সংস্কৃতির দিক। তেমনি চলচ্চিত্র মাধ্যমেরও আছে আকার, আকৃতি ও প্রকার, প্রকৃতির দিক। অর্থাৎ কারিগরি ও সংস্কৃতির দিক। সিনেমার সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি, 'তুলনামূলকভাবে একটি বড় আকারের অন্ধকার ঘরে অনেকে একত্রে অথচ নিঃশব্দ একাকিত্বের সঙ্গে বড় পর্দার কাছে আত্মসমর্পণ করা।' রিমোট আর মোবাইল টেপার ফাঁকে, লোডশেডিং আর বিজ্ঞাপন বিরতির আগে-পরে, ফোন আর বাচ্চা সামলানোসহ যাবতীয় গার্হস্থ্য কাণ্ডকারখানার মাঝে মাঝে কেব্‌ল ও ডিভিডির কল্যাণে আমরা টিভির মিনি পর্দায় যা দেখি, তা দেখা নয়, 'তাকানো', চলচ্চিত্র নয়, 'চলমান চিত্র' মাত্র।

আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে ডিজিটাল চলচ্চিত্র এখন আর তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় বা ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। এটি ইতিমধ্যেই একটি বাস্তবতা। বিখ্যাত-অখ্যাত, প্রবীণ-নবীন, বড় বাজেট-ছোট বাজেট, উন্নত দেশ-অনুন্নত দেশ, কাহিনিচিত্র-প্রামাণ্যচিত্রনির্বিশেষে নির্মিত হচ্ছে ডিজিটাল ফিল্ম। বিচিত্র কারণে নির্মাতারা ঝুঁকছেন এই ফরম্যাটটির দিকে। অভিন্ন কয়েকটি কারণ অবশ্য ধারণা করা যায়, যা ফরম্যাটটিকে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। নির্মাতার স্বাধীনতা, কারিগরি সুযোগ-সুবিধা, আর্থিক সাশ্রয় ও সৃজনশীল নিয়ন্ত্রণ তাদের অন্যতম। তবে সৃজনশীলতার সুবিধার দিকটিই হয়তো প্রধান কারণ, যা ভিম ভেন্ডারস, আব্বাস কিয়েরোস্তামি বা ডগমা ধারার নির্মাতা থেকে শুরু করে মাইকেল ম্যুর ও হলিউড ব্লক বাস্টার *ওপেন ওয়াটারের* পরিচালককে একত্র করেছে। ২০০০ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে ডিজিটাল চলচ্চিত্রবিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিখ্যাত অনেক নির্মাতার সঙ্গে আব্বাস কিয়েরোস্তামি ও সামিরা মাখমলবাফ অংশগ্রহণ করেন। এখানে সামিরার লেখা নিবন্ধের কিছু অংশের অনুবাদ তুলে ধরছি :

'ঐতিহাসিকভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণের সৃজনশীল প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক, আর্থিক ও কারিগরি—এই তিনটি নিয়ামক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। ...*চাকা*কে যদি বলা যায় মানুষের পায়ের গতি সঞ্চালন, তাহলে নির্মাতার জন্য ক্যামেরা তাঁর চোখের সম্প্রসারণ। গত শতাব্দীতে ব্যবহৃত ক্যামেরার

অতিরিক্ত ওজন, এটি চালানোর জটিলতা এবং যে পরিমাণ যান্ত্রিক জ্ঞানসম্পন্ন জনবল দরকার হতো, তাতে করে চলচ্চিত্রনির্মাতার আবেগ ও চিন্তার জন্য এই চোখ আসলে একটা বোঝা ছিল। কিন্তু আজ ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আমরা ক্যামেরাকে কল্পনা করতে পারি এক জোড়া সরু কাচের চশমা কিংবা এক জোড়া লেন্সের সঙ্গে, যা চোখের কর্নিয়ায় সংযোজিত হবে অথচ বোঝাই যাবে না।

'...ডিজিটাল বিপ্লবকে আমি কারিগরি জ্ঞানের সর্বশেষ অর্জন হিসেবে দেখি। তবে এই বিপ্লব সিনেমার বিরুদ্ধে নয় বরং সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির কিছু পেশাদারি কাঠামো ও চরিত্রের বিরুদ্ধে। ডিজিটাল সিনেমার কারণে আমরা চলচ্চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু—চিত্রনাট্য, দৃশ্যায়ন, সৃজনশীল সম্পাদনা, অভিনয়সহ কোনো কিছুই হারাব না। ডিজিটাল ছবি যা বদলে দেবে তা হলো চিত্রগ্রহণের ধরন, আলোর আয়োজন, পোস্ট প্রোডাকশন ল্যাবের কাজ ইত্যাদি। চলচ্চিত্র উৎপাদনযন্ত্রের এই কারিগরি বিপ্লবের ফলে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে হয়তো চলচ্চিত্রের মৃত্যু হবে, তবে এই বিপ্লব চলচ্চিত্রকে সৃজনশীল শিল্প হিসেবে বরং বাঁচিয়ে দেবে।'

এবার আসা যাক বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ডিজিটাল ফরম্যাটের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে। প্রথমত, আমাদের দেশে ৩৫ ও ১৬ মিলিমিটারে চিত্র নির্মাণের কারিগরি অবকাঠামোর প্রধান সীমাবদ্ধতা কী কী, সে সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

বিভিন্ন স্পিডের ফিল্ম স্টক বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকা তো দূরের কথা, অনেক সময় তারিখ পার হয়ে যাওয়া স্টক ব্যবহার করতে বাধ্য হন স্থানীয় নির্মাতারা। দরকারি লেন্স ও ভিডিও অ্যাসিস্টসহ একটি ভালো ক্যামেরাও নেই এ দেশে। শব্দ ট্রান্সফারসহ যাবতীয় ল্যাবের কাজ এতই নিম্নমানের যে 'চলচ্চিত্র অবনয়ন সংস্থা'য় বাকি ও ফাঁকিতে নির্মিত বস্তাপচা কিছু ফ্লপ 'বাণিজ্যিক' ছবি ছাড়া সব ছবিই সম্পাদনাসহ ভারতে পোস্ট প্রোডাকশন হয়। ব্যবসাসফল ছবি *মনের মাঝে তুমি* কেবল পোস্ট প্রোডাকশন নয়, প্রোডাকশনও ভারতে হয়েছে। নির্মাতাদের এসব কাজে মাসের পর মাস মাদ্রাজ, মুম্বাই বা কলকাতায় কাটাতে হয়।

বিদেশে রাশ প্রিন্টের অন্য নাম 'ডেইলিস' (Dailies)। অর্থাৎ দিনের শুটিংয়ের ফল দিন শেষেই দেখে কোনো ত্রুটি থাকলে তা পরের দিন শোধরানো যায়। কিন্তু আমরা রাশ প্রিন্টকে 'মান্থলি' (Monthly) নামেও ডাকতে পারি না, কারণ আমলাতন্ত্রের লাল ফিতার গিঁট খুলে দেশের বাইরে

ফুটেজ নিতে নিতে তিন মাস পেরিয়ে যায়। তত দিনে বসে থেকে থেকে এক্সপোজড ফুটেজ তার রং, রূপ, রস—সব হারাতে বসে। এ রকম ব্যাপক কারিগরি বিপত্তির মুখে অসহায় নির্মাতার সৃজনশীলতা হার মানে। তাঁর স্বপ্নের চলচ্চিত্রটি প্রায় পুরোপুরি থেকে যায় তাঁর মনের কোণে, অনেকটা থেকে যায় তাঁর চিত্রনাট্যে, কিছুটা বয়ে যায় চিত্রায়ণের সময় আর সম্পাদনার টেবিলে, যা অবশিষ্ট থাকে তা মেরামত করাই হয়ে দাঁড়ায় সম্পাদকের কাজ। এই কারিগরি সীমাবদ্ধতার কারাগারে থেকে কেবল ছবির শৈল্পিক দিকটাই বিসর্জিত হয় না, রাজনৈতিক বিসর্জনও কম হয় না। নানাবিধ সরকারি অনুমতি, অনুমোদন, অনাপত্তির ঘেরাটোপে সেলফ সেন্সরশিপ এসে পড়ে নির্মাতার অজান্তে। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে ডিজিটাল ফিল্ম।

বেশ কয়েক বছর ধরে দু-একটি কেব্‌ল টেলিভিশনে টেলিফিল্মের বাজেটে ৩৫ মিলিমিটারে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার ছবি বানিয়ে টিভি প্রিমিয়ার করছে। এর সঙ্গে একটি, বড়জোড় দুটি হলে প্রতীকি মুক্তি দিচ্ছে। লক্ষ করার বিষয়, টিভি মাধ্যম থেকে এক ঝাঁক মেধাবী তরুণ নির্মাতা, কলাকুশলী ও শিল্পী বেরিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে, ভিডিও ফরম্যাটে বেশ কিছু প্রতিভাবান চিত্রগ্রাহক ও সম্পাদকসহ অনেক কলাকুশলী দক্ষতা অর্জন করছেন। কিন্তু এই টিভি প্রযোজনা সংস্থাগুলো নিজেদের তৈরি কলাকুশলীদের তাদের প্রযোজিত সিনেমায় ব্যবহার করতে পারছে না। কারণ, তাদের ৩৫ মিলিমিটারের কারিগরি ও যন্ত্রজ্ঞান নেই। তারা নির্ভর করছে তথাকথিত বাণিজ্যহীন বাণিজ্যিক সিনেমার কলাকুশলীদের ওপর। একই সঙ্গে ছোট পর্দার সফল নির্মাতারা বড় পর্দায় কাজ করতে এসে তাঁদের মান বজায় রাখতে পারছেন না। কারণ, ৩৫ মিলিমিটারের অবকাঠামোর স্থানীয় সীমাবদ্ধতা ও মাধ্যমটির কারিগরি জ্ঞানের অভাব। অথচ তাদের ডিজিটাল প্রোডাকশন ও পোস্ট প্রোডাকশনের অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করলে চ্যানেল প্রযোজিত ছবিগুলোর চেহারা বদলে যেত। ছোট পর্দায়, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মেধাবী যেসব নির্মাতা কাজ করছেন, তাঁরা ক্যামেরা থেকে শুরু করে পোস্ট প্রোডাকশনের শেষ কাজটি পর্যন্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে করে অভ্যস্ত। এই তরুণ প্রজন্ম যদি তাদের পরিচিত কারিগরি যন্ত্রাদি ও কৃৎকৌশলকে ভিত্তি করে ছবি বানাতে পারে, তাহলে তাদের নির্মিত চলচ্চিত্রে তাদের প্রতিভার প্রমাণ রাখতে পারবে বলে আমার ধারণা।

ক্যামেরা যত দিন কলমের মতো সহজ ও সস্তা না হবে, তত দিন চলচ্চিত্রশিল্পের সৃজনশীল মুক্তি ঘটবে না—এ কথা এখনো ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকলেও তরুণ প্রজন্মের কম্পিউটার-সাক্ষরতা স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্রে ইতিমধ্যেই ইতিবাচক সুফল ও ফসল নিয়ে আসছে—এবারের স্বল্প ও মুক্ত দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব তার প্রমাণ। এই উৎসবে ১৬৫টি ছবির মধ্যে কয়টি ছবি চলচ্চিত্র ফরম্যাটে তৈরি? কয়টি ছবি চলচ্চিত্র ফরম্যাটে প্রদর্শিত হচ্ছে? দুই মাস আগে নেপালে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে আমার জুরিপ্রধান হিসেবে যোগদানের সুযোগ হয়েছিল। শ খানেক ছবির মধ্যে মাত্র একটি ছবি ছিল ৩৫ মিলিমিটারে তৈরি এবং সেটি ছিল হলিউডের নির্মাতা মিরা নায়ার প্রযোজিত।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্র ফরম্যাটে, এমনকি স্বাধীন ধারায়ও এমন কিছু চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, যা সম্ভবত চলচ্চিত্র হয়ে ওঠেনি। অথচ ভিডিও ফরম্যাটে এমন কিছু ভালো কাজ হয়েছে যে, সেগুলো নিয়মিত ভিডিও ফরম্যাটে না করে ডিজিটাল ফরম্যাটে চিত্রায়ণ করলে তা ৩৫ মিলিমিটারে উন্নীত করে দেশে-বিদেশে বড় পর্দায় পরিবেশনার সুযোগ নেওয়া যেত। এ ক্ষেত্রে অনেকের সঙ্গে স্বাধীন ধারায় নির্মিত নুরুল আলম আতিক ও শামীম আখতারের ভিডিও ফিল্মসহ বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এ রকম ভিডিওচিত্রগুলোর চূড়ান্ত পরিণতি টিভি চ্যানেলগুলোর 'অফ পিক আওয়ার'।

ভারতের মুম্বাইয়ে তুলনামূলক ফরম্যাটের একটি কর্মশালায় আমার যোগদানের সুযোগ হয়েছিল। এটির উদ্যোক্তা ছিল ভারতীয় চিত্রগ্রাহকদের প্রতিষ্ঠান সিনেমাটোগ্রাফারস কম্বাইন। এতে অংশ নিয়েছিলেন কে কে মহাজন ও অনিল মেহতাসহ ভারতের প্রথম সারির বেশ কয়েকজন চিত্রগ্রাহক। জার্মানি থেকে এসেছিলেন একজন নামকরা চিত্রগ্রাহক। জার্মান চিত্রগ্রাহক একই আলোতে ১৬ মিলিমিটার, এইচডি ডিভি ক্যাম—বিভিন্ন ফরম্যাটে একই সঙ্গে তোলা দৃশ্যগুলো ৩৫ মিলিমিটারে রূপান্তর করে কর্মশালায় নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি সেটা প্রদর্শন করেছিলেন। কর্মশালায় অংশ নেওয়া সবাই একমত হন, ১৬ মিলিমিটার থেকে ৩৫ মিলিমিটারে ব্লো আপ করা ছবির তুলনায় উন্নত মানের ডিভি ক্যামে তোলা ডিজিটাল চলচ্চিত্রের পিকচার কোয়ালিটি অনেক ভালো। এইচডি তো অবশ্যই আরও বেশি ভালো।

চলচ্চিত্রের প্রযুক্তি কেবল উন্নতই হচ্ছে না, ক্রমেই সহজ, সহজলভ্য ও সস্তা হচ্ছে। এটি সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তির আগমনের ফলে। ডিজিটাল

প্রযুক্তি চলচ্চিত্রের চিত্রায়ণের প্রকরণ হওয়ার আগেই, চলচ্চিত্র নির্মাণের অন্যান্য কারিগরি দিকগুলোয় কেবল ব্যবহৃত হচ্ছে, তা নয়, অনিবার্যও হয়ে পড়েছে। শব্দ গ্রহণ, শব্দ মিশ্রণ, সম্পাদনা, এমনকি পরিস্ফুটনের ক্রিয়াকর্মও এখন ডিজিটাল ডিভাইসের আওতায়। ডিজিটাল ইন্টারমিডিয়েট (ডিআই) আজকের রক্ষণশীল নির্মাতাদের কাছেও অজানা নয়। হলিউড, বলিউডের প্রথম সারির নির্মাতারা ৩৫ মিলিমিটারে চিত্রায়ণ করেও প্রথাগত অ্যানালগ প্রক্রিয়ায় ফেড-ইন ফেড-আউট থেকে শুরু করে সব ধরনের অপটিক্যাল ইফেক্টের দৈন্য ঢাকতে এই ডিআই প্রক্রিয়া ব্যবহার করছেন। অর্থাৎ ডিজিটাল ফরম্যাটের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

তবে পশ্চিমে, বিশেষ করে স্টুডিওভিত্তিক চলচ্চিত্রে ডিজিটাল ফরম্যাটের ব্যবহারের চরিত্র বেশ ভিন্ন। সেখানে হাই অ্যান্ড এইচডি ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বাজেটের দিক থেকে ৩৫মিলিমিটারে ছবি নির্মাণের চেয়ে সস্তা নয়। তা ছাড়া একাধিক ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে উন্নত বিশ্বে স্বাধীন ধারায় ডিজিটাল ফরম্যাটে যেসব কাজ হচ্ছে, তা অনেকটা প্রোডাকশন পর্যায়ে ১৬ মিলিমিটার ব্যবহার করে পরে পরিবেশক বা তহবিল সংগ্রহ করে ৩৫ মিলিমিটারে ব্লো-আপ করার সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ বড় বাজেটের ছবির ক্ষেত্রে ডিজিটাল ফরম্যাট নির্মাতার বেছে নেওয়া মাধ্যম। স্বাধীন ধারার ক্ষেত্রে এটি এখনো বিকল্প মাধ্যম। কারণ, ফরম্যাটটি সহজ, সুলভ ও সস্তা।

আশির দশকে যেকোনো সৃজনধর্মী নির্মাতার জন্য যখন মূল ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তখন মোরশেদুল ইসলাম ও তানভীর মোকাম্মেলের নেতৃত্বে বেশ কিছু তরুণ ১৬ মিলিমিটারের বিকল্প ফরম্যাটে ছবি বানিয়ে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কম্পিউটার-সাক্ষর নতুন প্রজন্মের জন্য আজ ১৬ মিলিমিটারের সেই বিকল্প ধারার সময়োপযোগী বিকল্প খুঁজে বের করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। গুরুত্বের সঙ্গে হয়তো ভাবতে হবে ডিজিটাল ফরম্যাটের কথা। নতুন প্রজন্মকে বড় পর্দার কাছে, বৃহত্তর দর্শকের কাছে যেতে হবে। বুঝতে হবে, ভিডিওচিত্রের চূড়ান্ত দৌড় টেলিভিশন পর্যন্ত। পরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে, দখল করে নিতে হবে মূল ধারা। মাত্র ১০ বছর আগেও বাংলাদেশের একজন নির্মাতার পক্ষে ইউরোপ, আমেরিকার ছবির কারিগরি মানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু চলচ্চিত্রমাধ্যমে ডিজিটাল ফরম্যাটের আবির্ভাব প্রযুক্তির গণতন্ত্রায়ণ এনে সবাইকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আজ ডিজিটাল বিপ্লবের এই সুযোগকে

আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং শুধু দেশীয় মূলধারা নয়, স্থান করে নিতে হবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের মানচিত্রে।

ডিজিটাল বিপ্লব চলচ্চিত্রমাধ্যমের চরিত্র নষ্ট করবে না বরং চলচ্চিত্র নির্মাণের অতিযান্ত্রিক চরিত্রকে নির্মাতার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। নির্মাতা ও কৃৎকৌশলীর মধ্যকার বিশাল বিভাজন ও দূরত্ব দূর করবে। একজন নির্মাতা সহজেই টেকনিশিয়ানের দায়িত্বের ভাগ নিতে পারবেন। টেকনিশিয়ানরাও নির্মাতাকে কারিগরি অবদান বোঝাতে সক্ষম হবেন। কারিগরি বোঝায় ভারাক্রান্ত না হয়ে জাপানি চলচ্চিত্রকার ওজুর ভাষায় চলচ্চিত্রকার সত্যিকারের কারিগর হয়ে উঠবেন, আর চলচ্চিত্রমাধ্যমকে ইন্ডাস্ট্রির অট্টালিকা থেকে নামিয়ে সাধারণ কুটিরে এনে তাকে কুটিরশিল্পের সৃজনশীলতা ফিরিয়ে দেবেন।

তবে বর্তমানের ডিজিটাল ফরম্যাটই শেষ কথা নয়। একটা সময় হয়তো আসবে, যখন কেবল নির্মাণ নয়, প্রদর্শনও ডিজিটাল হয়ে যাবে। তখন হয়তো ডিজিটাল ফরম্যাটে চিত্রায়ণ করে ৩৫ মিলিমিটারে রূপান্তর করার প্রয়োজন হবে না, বরং ধ্রুপদি চলচ্চিত্রগুলো ডিজিটাল ফরম্যাটেই আমরা দেখব। সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন আমরা আমাদের আজকের এই উত্তপ্ত, উত্তেজিত তর্ক নিয়ে নিজেরাই হাসাহাসি করব।

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রের মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রের ইতিহাস বস্তুত এ দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের যে সংগ্রাম, তার সমান্তরাল। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই যাত্রা শুরু করেছে। সে যাত্রা কতটা মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে, আর কতটা পুঁজি করে অব্যাহত ছিল, সে প্রসঙ্গ পরে। শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যম মুক্তিযুদ্ধের যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল, একটি চলচ্চিত্র তাকে প্রত্যক্ষ পটভূমিতে রূপান্তরিত করল। ছবিটির নাম *জীবন থেকে নেয়া*। জীবন ও যুদ্ধ শুধু কি একাত্তরেরই সমার্থক? আমাদের ছবির ইতিহাস জীবন ও যুদ্ধ থেকে নেওয়া। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের বিজয় সূচিত হয়েছে। *জীবন থেকে নেয়া* সেন্সরে নয়, শুটিং পর্যায়েই বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। *জীবন থেকে নেয়া* কোনো যুদ্ধের ছবি নয়, তবে অবশ্যই মুক্তির ছবি। আবার বৃহত্তর অর্থে যুদ্ধেরও ছবি। ১৯৬৯-৭০-এর ঐতিহাসিকভাবে তাপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর বিবরণে না গিয়ে ছবিটিকে একটি পরিবারের রূপক গল্পে সীমিত করায় ওই সময়ের তাৎপর্যকে সংকীর্ণ করা হয়নি, বরং বৃহত্তর মাত্রা দেওয়া হয়েছে। এই সর্বজনীন মাত্রার জন্যই হয়তো ছবিটি বাঙালির মনে চিরকালীন হয়ে থাকবে।

স্বাধীন বাংলার কাহিনিচিত্রের যাত্রা '৭২-এ শুরু হলেও বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্রের অগ্রাভিযান শুরু হয়েছে একাত্তর সালেই। নির্বাসিত স্বাধীন বাংলা সরকারের উদ্যোগে নির্মিত *স্টপ জেনোসাইড* কেবল বাংলাদেশের নয়, যেকোনো দেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্রের ইতিহাসে ছবিটি কালোত্তীর্ণ হওয়ার কারণ এই না যে, এটা প্রথম প্রামাণ্যচিত্র। মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক কার্যক্রমের তথ্যচিত্র না করে

এতে ওই সময়ের মানবিক দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যাকে বিভিন্ন বা একক ঘটনা হিসেবে নাটকীয় না করে বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। যুদ্ধকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবোধের লড়াইয়ের সীমানার মধ্যে সীমিত না রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে, পেয়েছে বৃহত্তর তাৎপর্য। ছবিটিতে একবারের জন্য হলেও বঙ্গবন্ধুর ছবি বা কণ্ঠ উল্লেখ না করে লেনিনের ছবি ও তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বক্তব্য দিয়ে শুরু হয়। এর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংঘটিত স্বাধীনতার সংগ্রামকে লেনিনের যুগান্তকারী বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত করে মহিমান্বিত করা হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দিকের ছবিগুলো সংগত কারণেই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও প্রামাণ্যধর্মী। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের প্রথম ছবিতে বিজয় উল্লাস-জাতীয় ভাবাবেগ থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু *ধীরে বহে মেঘনা* ছবিটির তাৎপর্য এই তাৎক্ষণিকতার ঊর্ধ্বে উঠে গণহত্যা ও গণনির্যাতনের মানবিক দিক ও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষাই তুলে ধরা হয়েছে। এ ছবিতেও মুক্তিযুদ্ধের মূল রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাপ্রবাহকে উপজীব্য করা হয়নি।

অন্যান্য শিল্পীর মতো একজন চলচ্চিত্রনির্মাতার কাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনালোকিত দিকগুলোর ওপর আলো ফেলা। গুরুতর বিষয়ও গুরুত্বহীন ও বিরক্তিকর হয়ে পড়ে, যখন তা অকারণে ভাঙা রেকর্ডের মতো বাজানো হয়। এ ধরনের একটি বিষয় হচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ধর্ষণ। আমার ব্যক্তিগত ধারণায়, একমাত্র *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* ছবিতেই ধর্ষণের ব্যাপারটি প্রসঙ্গ নয়, বৃহত্তর গল্প কাঠামোর অনুষঙ্গ হয়ে এসেছে—পুঁজি না হয়ে উপজীব্য হিসেবে এসেছে। ছবিটিতে মুক্তিযুদ্ধের মূল ধারাকে ধারণ না করে একটি উপেক্ষিত অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গকে প্রসঙ্গে রূপান্তর করা হয়েছে। বীরত্বের বড়াই নয়, যুদ্ধে না যাওয়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের অপরাধবোধকে বিষয়বস্তু করে তৈরি ছবিটি। এই প্রথম কোনো নির্মাতা কেবল নিজের শ্রেণী নয়, নিজের পেশাজীবী মানুষ, এমনকি নিজেকে সাহস ও সততার সঙ্গে আত্মগ্লানির কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। ছবিতে অভিনেতা আনোয়ার হোসেন একজন যুদ্ধে না যাওয়া, কলকাতায় তাস পিটিয়ে কাটিয়ে দেওয়া অভিনেতার চরিত্রে অভিনয় করেন (উল্লেখ্য নির্মাতা

সুভাষ দত্ত নিজেও একজন অভিনেতা এবং যুদ্ধের সময় কলকাতায় ছিলেন)। যুদ্ধ শেষে অভিনেতা আনোয়ারের দেখা হয় একজন ধর্ষিতার সঙ্গে, ধর্ষিতা তাঁকে শুধু চিনতে পারে তা নয়, তার মনে পড়ে, তারই গ্রামে শুটিং করতে এসেছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা চরিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা আনোয়ার হোসেন। ছোটবেলার সেই নায়ক কি বীরাঙ্গনাকে বিয়ে করে সমাজে পুনর্বাসনের বীরত্ব রাখেন? এটাই ছবির বিষয়বস্তু। অভিনেতা আনোয়ার কি পলায়নপর নবাব সিরাজ? নবাব সিরাজউদ্দৌলা কি যুদ্ধপলাতক আত্মগ্লানিগ্রস্ত অভিনেতা আনোয়ার হোসেন?

আমাদের অনেকের মধ্যেই একটি খেদ লক্ষ করার মতো বিষয় তা হচ্ছে, এত বছর হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র আজও হলো না। আমরা যখন 'পূর্ণাঙ্গ' কথাটি ব্যবহার করি, তখন পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের ছবি বোঝাই। কেবল যুদ্ধের ছবি কি মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ দিক? মুক্তিসংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ দিক কি একটি ছবিতে আনা সম্ভব অথবা খুবই দরকার? যুদ্ধ কেবল ওরা ১১ জনই করেনি, তাই বলে কেন *ওরা ১১ জন*-এর যুদ্ধ সবার যুদ্ধকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না? মুক্তিযুদ্ধের রূপ ও রং এক নয়, যেমন *মেঘের অনেক রং*। মূল প্রসঙ্গের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের এই যে হাজার রঙের দিক, হাজার অনুষঙ্গ, তার কত ক্ষুদ্র অংশই না আমরা ছবিতে আনতে পেরেছি! আমাদের প্রতিটি ছবি যদি মুক্তিযুদ্ধের একটি অনালোকিত প্রান্তিক দিক তুলে আনত, তা হলেই কি সব মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি যথাযথ পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠত না? কাজটা প্রামাণ্যচিত্রের বেলায়ও ঘটে। কারণ, যেখানে নিউজ রিলের কাজ শেষ হয়, সেখানে প্রামাণ্যচিত্রের ভূমিকা শুরু হয়।

গোড়াতেই উল্লেখ করেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধ চলচ্চিত্রের উপজীব্য হতে পারে না, তা মনে করি না। তবে স্বাধীনতার দু-এক বছরের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চলচ্চিত্রের নিছক পুঁজি হিসেবেই ব্যবহৃত হতে শুরু করে। দুঃখজনক হলেও সত্য, পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধ কেবল আর্থিক পুঁজিই না, বিভিন্ন আমলে রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবেও কখনো কখনো ব্যবহার হয়ে আসছে।

আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধই যখন স্থানীয় চলচ্চিত্রের নিছক পুঁজিতে পর্যবসিত হলো, তখন পুরো চলচ্চিত্রশিল্পটি কতটা পুঁজিসর্বস্ব হয়ে পড়েছে, বলার প্রয়োজন নেই। এ রকম পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র তো দূরের কথা, চলচ্চিত্রের মুক্তিসংগ্রাম অপরিহার্য হয়ে পড়ল। চলচ্চিত্রের এই সংগ্রামে আশার আলো নিয়ে এল *সূর্যদীঘল বাড়ী*, *এমিলের গোয়েন্দাবাহিনী* আর

ঘুড্ডি। চলচ্চিত্রের এই ত্রিমূর্তির সঙ্গে যোগ হলো ভারতের পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের দীক্ষা, ফিল্ম আর্কাইভস আর অনুদানের ত্রিভুজ উদ্যোগ। চলচ্চিত্রের ত্রিশঙ্কু অবস্থার অবসান ঘটাবে বলে আমরা সবাই আশাবাদী হলাম। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইতিহাসের চাকা আবার পেছনের দিকে ঘুরতে শুরু করল। বাক্সবন্দী হয়ে পড়ল অনুদানপ্রাপ্ত তিনটি ছবি। মুখ থুবড়ে পড়ল অনুদান প্রথা নিজেই। পুনা প্রত্যাগতরা আশ্রয় নিল বিজ্ঞাপনচিত্রে। জাতীয় চলচ্চিত্র আর্কাইভস ও ইনস্টিটিউট আশ্রয় পেল জাতীয় গণভবনের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে। এদিকে মুক্তিযুদ্ধের উদার আদর্শ আর ইতিহাস গণমাধ্যম থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত—সব জায়গা থেকে নির্বাসিত হলো। চলচ্চিত্র সংসদ নিয়ন্ত্রণ আইনের মধ্য দিয়ে ঝিমিয়ে পড়ল চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন। দেশে শুরু হলো নতুন উপদ্রব—এরশাদের সামরিক শাসন। এমনই সময় *আগামী* আর *হুলিয়া* দিয়ে শুরু হলো এক নতুন আন্দোলন। শুরু হলো স্বল্পদৈর্ঘ্যের দীর্ঘ সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র আর চলচ্চিত্রের মুক্তিসংগ্রাম গড়ে উঠল প্রথমবারের মতো অভিন্ন অভিধায়। গড়ে উঠল ১৬ মিলিমিটারের বিকল্প ফরম্যাট, বিকল্প প্রদর্শনব্যবস্থা। তিন মিনিটের অ্যানিমেশন, প্রায় এক ঘণ্টার প্রামাণ্যচিত্র থেকে শুরু করে দেড় ঘণ্টার *একাত্তরের যীশু*, আড়াই ঘণ্টার *দুখাই*—সব ছবিকেই মানুষ ভালোবেসে ডাকল শর্ট ফিল্ম। সব সুস্থ ধারার অপর নাম হয়ে পড়ল স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি। এসব তৎপরতাই আসলে মুক্তিযুদ্ধের ছবি, চলচ্চিত্রের ক্ষীণ ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে, বাণিজ্যসর্বস্বতা থেকে চলচ্চিত্রকে মুক্তি দিতে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধসহ সৎ ও সুস্থ ধারার চলচ্চিত্রকে তাঁর প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতে দিচ্ছেন না, তাঁরা কি টিকিয়ে রাখতে পারবেন তাঁদের 'রূপমহল' আর 'রংমহল'কে? আকাশ সংস্কৃতির এই কলি কালে, কালো পুঁজিকে পুঁজি করে তাঁরা কি পারবেন এই সাদা হাতি পুষে যেতে? তাঁরা কি পারবেন বিষয়হীন-বস্তুহীন-মূল্যহীন-বোধহীন জংধরা হিজ মাস্টারস ভয়েসের পুরোনো গ্রামোফোন বাজিয়ে যেতে গ্রামীণফোনের যুগে?

তবে আশার কথা, ছোট পর্দার বেশ কিছু নির্মাতা চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসছেন। তাঁদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রজন্মের। ফলে তাঁদের রয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন শিল্পভঙ্গি। মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের মধ্যে রাজনৈতিক যে সংকীর্ণতা রয়েছে, এঁদের অনেকেই তা থেকে মুক্ত। আজ বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতা ও তরুণ সমাজের মন-মানসিকতা মনে রেখে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে নতুন মাত্রা নিয়ে আসবেন।

দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের নেতৃত্ব যদি সত্যি সত্যি এই নতুন সময়ের সংকট ও চ্যালেঞ্জকে অনুধাবন করে, তাহলে আপনাদের রূপমহলের সিংহদ্বার তাদের জন্য খুলে দিন, যারা শুধু মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ-উদ্দীপ্ত তরতাজা ছবি নিয়েই আসবে না, সঙ্গে নিয়ে আসবে সেই সব লাখো দর্শক, যাঁরা বড্ড হতাশা আর অভিমান নিয়ে দীর্ঘদিন প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেছেন। একই সঙ্গে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ-প্রতিশ্রুত শিল্প ও জীবনঘনিষ্ঠ চলচ্চিত্র করতে চাই, দেখতে চাই, আজ তাদেরও দায়িত্ব চলচ্চিত্রশিল্পকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে অগ্রগামী ভূমিকা রাখা। আসুন, আমরা সবাই মিলে আবার ফিরে যাই বড় পর্দার কাছে, রুপালি পর্দার কাছে, জীবনের প্রতিচ্ছবির কাছে—মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতির কাছে।

দুই বাংলার চলচ্চিত্র আদান-প্রদান

১৯৪৭ সালে বাংলা যখন ভাগ হলো, ছবি নির্মাণের পাদপীঠ টালিগঞ্জ পড়ল ওপারে, কিন্তু অধিকাংশ সিনেমা হল রয়ে গেল এপারে। টালিগঞ্জ হারাল এপারের দর্শক, আর এপারের ছবিঘরগুলো হয়ে পড়ল ছবিশূন্য। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিভক্তি ঘটলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দুই অংশের পারস্পরিক নির্ভরতা রয়েই গেল। ফলে রাজনীতির গোলাগুলি ডিঙিয়ে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কোলাকুলি অব্যাহত থাকল। *পথের পাঁচালী*র মাধ্যমে কলকাতা যখন পরিণত হয়ে উঠল, ঢাকা তখন *মুখ ও মুখোশ* দিয়ে তার যাত্রা শুরু করল। ক্ষণস্থায়ী যুক্তফ্রন্টের গণতন্ত্র চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার ভিত্তি স্থাপন করল। কিন্তু সামরিক শাসনের পাঁয়তারা শুরু হতেই '৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ভারতীয় ছবি আমদানি প্রথমবারের মতো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পরের বছরই সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো। সামরিক সরকার ১৯টি ভারতীয় ছবি কিনে স্থানীয় পরিবেশকদের কাছে বিক্রি করে সিনেমা হলগুলোকে বাঁচিয়ে তোলার উদ্যোগ নিল। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে স্থানীয় চলচ্চিত্রশিল্প বিকাশ লাভ করতে শুরু করে উপমহাদেশের চারটি জেঁকে বসা ইন্ডাস্ট্রি বা স্টুডিওর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

ক. উত্তম-সুচিত্রাভিত্তিক টালিগঞ্জের বাংলা ছবি।

খ. রহমান-শবনমকেন্দ্রিক লাহোর স্টুডিওভিত্তিক উর্দু ছবি।

গ. দিলীপ কুমার-সায়রা বানুভিত্তিক বোম্বের হিন্দি ছবি।

ঘ. হলিউডের ইংরেজি ছবি।

মাটির পাহাড়, ধারাপাত, কখনো আসেনি, নদী ও নারী বা *আসিয়ার* মতো ছবির নির্মাণ আটকে রাখতে পারেনি বাইরের ছবির অবাধ প্রবেশ।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ নতুন করে গোল বাধায়। ৬ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরদিনই সামরিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের সম্ভাব্য আক্রমণের মুখে অরক্ষিত রাখলেও পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় ছবি আমদানি ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করল। পাকিস্তান আমলে কিছুদিন পর পর ভারতীয় ছবির বিরুদ্ধে হুংকার যতটা রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরপ্রসূত, ততটা বাস্তবায়নমুখী কখনোই ছিল না। তার প্রমাণ, যুদ্ধকালীন নিষেধাজ্ঞার দু-এক বছর পরই সত্যজিৎ রায়ের *মহানগর* দেখার জন্য বলাকা সিনেমা হলে ঘটে আক্ষরিক অর্থেই 'গেট ক্র্যাশের' ঘটনাটি। আমি তত্ত্ব-তালাশ করে দেখছি, পাকিস্তান আমলেও এই নিষেধাজ্ঞার হুংকার ধারাবাহিকভাবে কার্যকর হওয়ার সুযোগ পায়নি প্রধানত এই কারণে যে, এটির আইনগত ভিত্তি ছিল না।

পাকিস্তান আমলে তৈরি জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* ছবিটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতায় মুক্তি লাভ করে। *জীবন থেকে নেয়ার* পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বাধীনতার পর '৭২ সালেই সূচিত হতে পারত দুই বাংলার চলচ্চিত্র আদান-প্রদানের ভারসাম্যমূলক শুভযাত্রা। এর মধ্যে দিয়ে দুই বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প, বিশেষ করে সিনেমা হল চাঙা হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম প্রহরেই জহির রায়হানের অন্তর্ধানের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর বাংলায় চলচ্চিত্রের অমিতসম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। বাংলাদেশের 'শিশু চলচ্চিত্র'কে ভারতীয় জুজুর ভয় থেকে বাঁচাতে আমাদের চিত্রশিল্পের নাবালক একটি গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে বোঝাতে সক্ষম হলো, আমাদের চিত্রশিল্পকে সুস্থ প্রতিযোগিতার আলো-বাতাসে বাড়তে না দিয়ে বনসাই করে রাখাই উত্তম। ফলাফল হলো, পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে যে ইন্ডাস্ট্রিটি মহীরুহের রূপ নিয়েছিল, সত্তরের দশকের শুরুতেই তা মুমূর্ষু হয়ে পড়ল। মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য নয়, পুঁজি করে বন্দুক-কামানের গর্জন আর ধর্ষণসর্বস্ব ছবি দিয়ে কূল না পেয়ে যৌথ প্রযোজনার মাধ্যমে শ্যাম রাখার চেষ্টা হলো। *রক্তাক্ত বাংলায়* ধীরে বইল মেঘনা! পরবর্তী সময় *রংবাজ*-এর পথ ধরে কিছুটা এগোনো গেলেও একই দশকের শেষের দিক থেকেই মধ্যবিত্ত দর্শক প্রায় পুরোপুরি সিনেমা হল ছাড়তে শুরু করল।

পাকিস্তান আমলের মতো বাংলাদেশ আমলেও ভারতীয় ছবির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত কোনো আইন বা বিধি আমি অনেক অনুসন্ধান করার পরও পাইনি। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে *পথের পাঁচালী*, *নিমন্ত্রণ*, *অতিথি*, *কাবুলিওয়ালা*সহ বেশ কিছু ছবি সিনেমা হলে এবং পরে বাংলাদেশ

টেলিভিশনে দেখার সুযোগ হয় বাংলাদেশের দর্শকদের। তবে ১৯৭৪ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি গেজেটের সন্ধান পাওয়া যায়, যাতে সত্যজিৎ রায় নির্মিত *অপরাজিত* এবং *দীপ জ্বেলে যাই*সহ পাঁচটি ছবির বাণিজ্যিক প্রদর্শন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। লজ্জার বিষয় হলো, যে পাকিস্তান ভারতীয় ছবি নিষিদ্ধ করেছিল, সেই পাকিস্তানই ভারতীয় ছবি তাদের দেশে মুক্তি দিতে শুরু করেছে এবং তার বিনিময়ে পাকিস্তানি ছবি *খামোশ পানি* ভারতে বক্স অফিস হিট করেছে। অথচ আমরা এখনো সেই পুরোনো পাকিস্তানের উত্তরাধিকারের লেজ ধরে বসে আছি।

যৌথ প্রযোজনার মধ্য দিয়ে এই অলিখিত অথচ অমোঘ নিষেধের বেড়াজাল ভেদ করার নিয়মিত উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। মমতাজ আলীর *রক্তাক্ত বাংলা* ও আলমগীর কবিরের *ধীরে বহে মেঘনার* পর রাজেন তরফদারের *পালঙ্ক* ও ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম* সরস্বতীর সন্ধান পেলেও লক্ষ্মীর লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে কলকাতার তৃপ্তি মিত্রকে নায়িকা করে উর্দু ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি*কে হাইজ্যাক করে *জাগো হুয়ে সাভেরার* মধ্য দিয়ে যৌথ প্রযোজনার যে ক্ষীণ ধারা সূচিত হয়, পরবর্তী সময় গৌতম ঘোষের *পদ্মা নদীর মাঝির* মাধ্যমে তা সফল পরিণতি লাভ করে। উল্লেখ্য, এ ছবিগুলোর শতভাগই মূলত বাংলাদেশি অর্থায়নে নির্মিত এবং হাবিব খান ও সানওয়ার মোর্শেদের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চলচ্চিত্র উদ্যোক্তাদের কল্যাণে সম্ভব হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয়, ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনার ইতিহাস বাংলাদেশের পরিচালক দিয়ে হলেও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কোনো সৃজনশীল নির্মাতাদের সুযোগ ঘটেনি যৌথ প্রযোজনার ছবি নির্মাণের।

ভারত-বাংলাদেশের আন্তদেশীয় চলচ্চিত্র পরিবেশনার প্রক্রিয়াকে সবল ও সফল করতে যৌথ প্রযোজনা কেবল রণকৌশল নয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবানুগ রোডম্যাপ হিসেবে দেখা দরকার। সারা পৃথিবীতে আঞ্চলিক যৌথ প্রযোজনা চলচ্চিত্রের বৃহত্তর বাজার ও দর্শক সৃষ্টির কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আশির দশকের গোড়ায় *কেয়ামত সে কেয়ামত তাক*-এর মাধ্যমে 'কপিরাইট সিনেমা'র যে বিকৃত হাস্যকর মেধাহীন সংস্কৃতি শুরু হয়েছে, তা কখনোই স্বাভাবিক আন্তদেশীয় চলচ্চিত্র বিনিময়ের বিকল্প হতে পারে না। ভিডিও পাইরেসি, ডিভিডি-ভিসিডির বিস্তার, আকাশ সংস্কৃতির অগ্রাসন, কেবল টেলিভিশনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার প্রতিকূলে চলচ্চিত্র সংস্কৃতি ও ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখতে ভারসাম্যমূলক প্রতিযোগিতার খোলা আকাশের

কাছে চলচ্চিত্রমাধ্যম ও শিল্পকে মুক্ত করে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। চলচ্চিত্রশিল্পের সবচেয়ে ব্যাপক ও স্থাবর বিনিয়োগ হচ্ছে সিনেমা হল। এই সিনেমা হল থেকেই সরকার কর লাভ করে (চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার কল্যাণে সরকার বরং প্রতিবছর ছবি নির্মাণ খাত থেকে লোকসান দিয়ে আসছে)। এই সিনেমা হলের মাধ্যমেই জনগণের চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্টতা। অথচ প্রতি মাসে একটি করে সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তা ঠেকাতে কী করা যায় সরকারকে এখনই ভাবতে হবে।

নেপাল সরকার ভারতীয় সিনেমার ওপর দ্বিগুণ কর বাড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় সিনেমার কর ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে ইদানীং। এমনকি পশ্চিম বাংলা সরকারও বলিউডের ছবির জন্য কর বাড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় ছবির ওপর কর শুধু কমিয়েছে তা-ই নয়, নতুন সিনেমা হল নির্মাণের জন্য এবং পুরোনো হল সংস্কার করার কাজে উদ্যোগী হওয়ার জন্য পাঁচ বছর কর মওকুফ করেছে। আমরা প্রতিবেশী দেশগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দ্বিগুণ কর আরোপ সাপেক্ষে প্রতিবেশী দেশের ছবি প্রবেশ করতে দিয়ে স্থানীয় ছবির ওপর কর লাঘব করে মৃতপ্রায় শিল্পকে চাঙা করে তোলা সম্ভব।

এখন সময় এসেছে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার। চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীদের সঙ্কীর্ণ মনমানসিকতা ও স্বার্থ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিশ্বায়নের সুযোগ কাজে না লাগালে আমরা নিজেরাই বিশ্বায়িত হয়ে পড়ব। হলিউড আর বলিউডের প্রকোপ থেকে আঞ্চলিক, বিশেষত বাংলা সিনেমাকে বাঁচাতে দুই বাংলার চলচ্চিত্রজনদের ইগো ও সেন্টিমেন্টের উর্ধ্বে উঠতে হবে। সবশেষে একটি সুখবর দিয়ে শেষ করি। প্রায় দেড় বছর আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ছবি *মাটির ময়না* ভারতীয় জাতীয় সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র পেয়েছে। আগামী ১১ জুলাই (২০০৭) কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি হল বাণিজ্যিকভাবে ছবিটির মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আশা করি, এই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি ছবির ভারতের বাজারে প্রবেশের শুভসূচনা ঘটবে। একই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের ছবির মুক্তি পাওয়ারও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জুন, ২০০৭

ভারত-বাংলাদেশ চলচ্চিত্র বিনিময়

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-বাণিজ্যের ইতিহাস বিতর্ক ও অধারাবাহিকতায় ভরা। ছবির যৌথ প্রযোজনা ও বিনিময়ের ব্যাপারে একটি যথাযথ নীতি প্রণয়নে সরকারের অপারগতা খুবই স্পষ্ট। একটি শক্তিশালী চলচ্চিত্রনীতিতে স্থির থাকার ব্যাপারে বাংলাদেশের ব্যর্থতার তদন্তই সম্ভবত বর্তমান পরিস্থিতিকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরপরই কোনো আঞ্চলিক চলচ্চিত্রশিল্পের অস্তিত্ব ছিল না, যেহেতু বোম্বের হিন্দি এবং কলকাতার বাংলা ছবি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক পরিসরে মুক্তি পেত। নিজস্ব একটি চলচ্চিত্রশিল্প কাঠামোর সূচনা খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৫৬ সালে তৈরি আবদুল জব্বারের *মুখ ও মুখোশ* ছবিটির মধ্যে। এর পরের বছরই পাকিস্তান সরকার ভারতীয় ছবির আমদানি নিষিদ্ধ করে। তার পরও এক বছরের মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান যৌথ উদ্যোগের একটি নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝির* ওপর তৈরি করা পাকিস্তানি ছবি *জাগো হুয়া সাভেরাতে*। বিষয়টি প্রাসঙ্গিক কেবল এ কারণে নয় যে এটি একটি ভারতীয় উপন্যাসের ওপর নির্মিত পাকিস্তানি ছবি, বরং এ কারণেও যে এই ছবির একটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন বিখ্যাত ভারতীয় অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র।

১৯৬০-এর দশকের শুরুতে লাহোর, বোম্বে ও কলকাতা থেকে আসা উর্দু, হিন্দি ও ভারতীয় বাংলা ছবির তীব্র প্রতিযোগিতার মুখেও অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই দেশি চলচ্চিত্রশিল্প আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তান সরকার ১৯৫৭ সালের ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান থেকে ১৯৬৩ সালে ১৯টি ভারতীয় ছবি আমদানি করে এবং দেশি পরিবেশকদের কাছে বিক্রি করে। ১৯৬৫

সালের ৬ সেপ্টেম্বর ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয় এবং তার পরদিন থেকেই ভারতীয় ছবির বাণিজ্যিক প্রদর্শন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে সত্যজিৎ রায়ের *মহানগর* ও *স্ত্রীর পত্র* একটি চলচ্চিত্র উৎসবের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে মুক্তি পায়। ছবি দুটো সুপারহিট হয় এবং টিকিটের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়া দর্শক বিখ্যাত 'বলাকা সিনেমা হল'-এর গেট পর্যন্ত ভেঙে ফেলে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও 'দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্প রক্ষা'র খাতিরে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে। আবারও বিদ্যমান নীতির ব্যত্যয় ঘটে পরের বছরই, যখন একটি চলচ্চিত্র উৎসবে বাণিজ্যিকভাবে *অতিথি*, *নিমন্ত্রণ*, *অপু ট্রিলজি* এবং আরও কিছু ছবি প্রদর্শিত হয়। পরে জাতীয় টেলিভিশনেও ছবিগুলো প্রচারিত হয়। পরের দুই বছরে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় একাধিক ছবি তৈরি হয়। এগুলোর মধ্যে আছে আলমগীর কবিরের *ধীরে বহে মেঘনা* এবং ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম*। *তিতাস একটি নদীর নাম* ছবিটি একজন বাংলাদেশি প্রযোজকের প্রযোজনায় নির্মিত এবং বাংলাদেশে চিত্রিত।

১৯৭৫ সালে একটি সরকারি ঘোষণা পাঁচটি ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী বাতিল করে, এগুলোর মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের *অপুর সংসার*ও ছিল। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি ভারতের 'পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট' বাংলাদেশি ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া শুরু করে। বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি পুনেতে যান এবং দেশে ফিরে সত্তরের দশকের শেষাশেষি বেশ কিছু ভালো মানের ছবি তৈরি করেন। ভারতীয় জাতীয় মহাফেজখানায় কর্মরত পি কে নায়ার এবং সতীশ বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র আর্কাইভস প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রথম স্বাধীনতা-উত্তর চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে, যেখানে সত্যজিৎ রায়ের *হীরক রাজার দেশে*সহ বেশ কিছু ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হয়। ১৯৮০-র দশক 'কপিরাইট ছবি'র জন্মের সাক্ষী, যা কিনা সীমানার ওপারে মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয় ছবির প্রতিটি দৃশ্যের পুনর্নির্মাণ। বাংলাদেশ ও ভারতে বেশ কিছু ছবি এভাবে তৈরি হয়েছে। কিছু 'কপিরাইট ছবি'র উদাহরণ হলো *কেয়ামত সে কেয়ামত তাক* (বোম্বে), *বেদের মেয়ে জোসনা* (বাংলাদেশ) এবং *শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ* (পশ্চিমবঙ্গ)। ১৯৮৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বাধ্যবাধকতাসহ বাংলাদেশি ছবির ক্ষেত্রে যৌথ প্রযোজনার নীতি ঘোষিত হয়। দুই বছর পর এই একই নীতি সংশোধিত

হয়। মোরশেদুল ইসলামের ছবি *আগামী* ১৯৮৪ সালে দিল্লির আইএফএফআইয়ে 'সিলভার পিকক' পুরস্কার জেতে। এটি বাংলাদেশের মুক্তধারার চলচ্চিত্র বিপ্লবকে আরও উজ্জীবিত করে। তখন থেকে অনেক বাংলাদেশি ছবি বিভিন্ন ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলো অগণিত পুরস্কার ও সম্মাননাও পেয়েছে। একই সময়ে ভিডিও পাইরেসি ইতিমধ্যেই ভগ্নদশাগ্রস্ত চলচ্চিত্রশিল্পকে আরও দুর্বল করে ফেলে। ১৯৮৮ সালে এক সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্রনীতি গৃহীত হয়। এই নীতির উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো, যৌথ প্রযোজনার আইন সংশোধন এবং সীমিত আকারে ভারতীয় ছবি আমদানি। নীতি প্রণয়ন কমিটিতে ছিলেন ওবায়েদ-উল হক, আলমগীর কবির এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের অন্য জ্যেষ্ঠ সদস্যরা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং একটি বাংলাদেশি বেসরকারি প্রযোজনা সংস্থার যৌথ ব্যবস্থাপনায় ১৯৯২ সালে নির্মিত হয় গৌতম ঘোষের *পদ্মা নদীর মাঝি*। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় এবং দেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের আত্মপ্রকাশ দেশি চলচ্চিত্রশিল্পের ভেঙে পড়াকে আরও ত্বরান্বিত করে। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে সিনেমার টিকিটের করকে ১২০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে নামিয়ে এনে বাংলাদেশ সরকার চলচ্চিত্রশিল্পকে চাঙা করার একটি অসফল উদ্যোগ নেয়। দেশে চলচ্চিত্রের নির্মাণ-পরবর্তী সুবিধাদি ও অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে ১৯৯০-এর দশকের শেষ থেকে বাংলাদেশের প্রায় সব মুক্তধারার ছবিনির্মাতা এবং ছবির মান সম্পর্কে সচেতন বাণিজ্যিক নির্মাতারা নিজেদের ছবির নির্মাণ-পরবর্তী কাজ ভারতে গিয়ে করতে থাকেন। সাম্প্রতিক কালে কিছু বাণিজ্যিক ছবির চিত্রায়ণও ভারতে করা হয়। যেমন, *মনের মাঝে তুমি*।

২০০৪ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভারতীয় ছবির প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে একটি গেজেট প্রকাশ করে। সরকারি নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী অবস্থান থেকে পরের বছরই একটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার চলচ্চিত্র উৎসবে বিভিন্ন সিনেমা হলে বেশ কিছু ভারতীয় ছবি বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শিত হয়।

চলচ্চিত্রশিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো সিনেমা হল। চলচ্চিত্রশিল্পের এই অংশের সঙ্গে জনসাধারণ ও সরকার সরাসরি জড়িত। সিনেমা-শিল্পকে বাঁচাতে হলে এই শিল্পের স্থাবর কাঠামো সিনেমা হলকে বাঁচাতে হবে। বাণিজ্যিক চাহিদা আছে, এমন ছবি দিয়ে আমরা সিনেমা হলকে বাঁচাতে পারি, সে ছবি যেখান থেকেই আসুক না কেন। দেশীয় সিনেমা-শিল্প

ও হলগুলোকে বাঁচানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো টিকিটের ওপর কর ১০০ শতাংশ থেকে অনেক কমিয়ে আনা। টিকিটের ওপর এই কর সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশি। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য ভারতীয় ছবির ওপর উচ্চ করারোপ করা যেতে পারে, যেমনটি করেছে নেপাল ও পশ্চিমবঙ্গ (হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, গত পাঁচ বছরে সারা বাংলাদেশে দুই শরও বেশি সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে। আরও কয়েক শ সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে।

বাংলাদেশি ও ভারতীয় চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে সহযোগিতার একটি দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাস আছে, যাকে কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না। একটি কার্যকর যৌথ প্রযোজনানীতির প্রয়োগ এবং সে নীতিতে স্থির থাকা দেশীয় সিনেমা-শিল্পে বহুল আকাঙ্ক্ষিত উদ্দীপনা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে। এটি দেশে তৈরি ছবির মানোন্নয়ন ঘটাবে এবং ভারতীয় ছবির সঙ্গে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার জায়গা তৈরি করবে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছবির আন্তদেশীয় পরিবেশনা ত্বরান্বিত করার একটি উপায় হচ্ছে যৌথ প্রযোজনাকে উৎসাহিত করা। যৌথ প্রযোজনা সীমানার ওপারে ছবির বাজার সম্প্রসারণের একটি সহজতম উপায়। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে প্রায় ২৫টি ছবি তৈরি করেছে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ছবিগুলো খুব দায়সারাভাবে বানোনো। এগুলো বাণিজ্যিকভাবেও সফল নয়, চলচ্চিত্র সমালোচকদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। বাণিজ্যিক সফলতা নিশ্চিত করতে এসব ছবির বিষয় ও গল্পকে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর দর্শককে উদ্দেশ করে নির্বাচন করতে হবে। ছবিগুলো যেন এই অঞ্চলের মানুষের মিলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে। এই উদ্যোগ আমরা যদি নিতে চাই, সে ক্ষেত্রে উভয় সরকারকেই জড়িত হতে হবে। যেমন, ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর ভারতীয় সহপ্রযোজক ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যৌথ প্রযোজনার ছবির সাফল্যের অভাবের জন্য বিদ্যমান আইনকানুন দায়ী নয়। বাংলাদেশ সরকারের আমলাতন্ত্রই সবচেয়ে বড় বাধা।

পরিহাসের বিষয়, যে দেশের কাছ থেকে বাংলাদেশ 'নিষেধাজ্ঞা'কে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে, তারা নিজেরাই সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞার নীতি তুলে নিয়েছে এবং ভারতীয় ছবি পাকিস্তানে মুক্তি পেতে শুরু করেছে। ভারতীয় ছবির ওপর বাংলাদেশের তথাকথিত নিষেধাজ্ঞার কোনো আইনি ভিত্তি নেই; এ পর্যন্ত কোনো সংসদীয় আইন পাস হয়নি,

রাষ্ট্রপতির কোনো অধ্যাদেশও নেই। ভারতেও এমন কোনো লিখিত আইন নেই, যা বাংলাদেশি ছবির মুক্তি বাধাগ্রস্ত করতে পারে। একটা ভুল ধারণা চালু আছে যে এই নিষেধাজ্ঞা দেশি সিনেমা-শিল্পকে রক্ষা করছে। আদতে সরকার এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সিনেমা-শিল্পের পতনকে কেবল ত্বরান্বিতই করছে না, একটি বড় অঙ্কের রাজস্ব থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এই নিষেধাজ্ঞা অপরিণামদর্শীর মতো ভারতীয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন ও ভিডিও পাইরেসিকে উৎসাহিত করছে। ভারতীয় ছবির আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। যৌথ প্রযোজনার ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছে—আমদানি করা ছবির সংখ্যা সীমিত করে দেওয়া যেতে পারে। পাকিস্তান ঠিক এ কাজটাই করেছে। আমদানিযোগ্য ছবির ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করা যেতে পারে, ১৯৮৮ সালের সংশোধিত নীতিতে যেমন উল্লেখ ছিল, আমদানি করা যেকোনো ছবিকে অন্তত একটি আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কার জিততে হবে। সীমিত আমদানির ক্ষেত্রে একটি বড় কারণ এই অনুমান যে দিল্লি কেবল ভারতীয় বাংলা ছবি রপ্তানিতে উৎসাহিত না-ও হতে পারে।

এ সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে সমন্বিতভাবে বাংলা ও অবাংলা ছবি আমদানি করা। দেশি দর্শকের জন্য অবাংলা ছবিগুলো আংশিকভাবে ডাব করা যেতে পারে। ভারতে রপ্তানি করা বাংলা ছবিগুলোকেও আংশিকভাবে ডাব করা যেতে পারে অথবা ভারতের বিস্তৃত আকারে মুক্তি দেওয়ার জন্য ইংরেজি সাবটাইটেল জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, বাংলাদেশি চ্যানেলগুলোয় যদিও কিছু ভারতীয় ছবি প্রচারিত হয়েছে, বাংলাদেশি ছবি ভারতের কোনো চ্যানেলে প্রচারিত হওয়ার কোনো নজির নেই। ছবির বিনিময় কখনোই একপক্ষীয় করা যাবে না। প্রতিবছর বাংলাদেশে অনেকগুলো ভালো ছবি তৈরি হয়, যেগুলোর মান অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট। ভারতীয় ছবি বাংলাদেশে আমদানি করার অনুমতি দিলে বাংলাদেশের নির্মাতাদের জন্যও একটি উপায় তৈরি হবে তাদের ছবিকে ভারতে বাজারজাত করার। এটা বাস্তব যে ভারতের সিনেমা-শিল্প অনেক বড় হওয়ায় বাংলাদেশ যতটুকু পারবে ভারত হয়তো তার তুলনায় বেশিসংখ্যক ছবি রপ্তানি করতে সক্ষম হবে। মুক্তবাজারের পৃথিবীতে চাহিদার অসমতার কারণে ভারত হয়তো বাড়তি সুবিধা ভোগ করবে। এই সত্যকে মেনে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে অবশ্যই বাস্তবতা বোধসম্পন্ন হতে হবে। অন্যদিকে বেশি লাভের অংশীদার হওয়ার কারণে ভারতও বাংলাদেশকে কিছু উদার ছাড় দিয়ে একটি উদ্যোগী ভূমিকা নিতে পারে। এই পথে ইতিমধ্যে একটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে

গেছে—*মাটির ময়নাকে* সম্প্রতি ভারতীয় সেন্সরবোর্ড ভারতে প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছে। আশা করি, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে ভারত ও বাংলাদেশে দ্বিপক্ষীয়ভাবে ছবি মুক্তির দরজা খুলে দেবে।

বাংলাদেশের নির্মাণ-পরবর্তী সুবিধাদির কথা মাথায় রেখে ভারত বাংলাদেশে একটি পূর্ণ আঙ্গিকের ফিল্ম ল্যাব নির্মাণ করতে পারে, যা এ দেশের সিনেমা-শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হবে। যত দিন বাংলাদেশে এ ধরনের মানসম্পন্ন ল্যাব বাস্তবায়িত না হয়, তত দিন দেশীয় নির্মাতারা যাতে ভারতে গিয়ে সেখানকার কারিগরি-সুবিধা ব্যবহার করতে পারে, সে ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক রীতিনীতিকে শিথিল করাটা গুরুত্বপূর্ণ। দেশে যেহেতু কোনো চলচ্চিত্র কিংবা টেলিভিশন ইনস্টিটিউট নেই, পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশের আগ্রহী ছাত্রদের আবার বৃত্তি দেওয়া চালু করতে হবে। খুবই হতাশার ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের খুব কাছে হওয়া সত্ত্বেও এসআরএফটিআইয়ে (সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট) কেবল বৃত্তিরই যে অভাব আছে তা-ই নয়, বাংলাদেশ-ভারত আন্তসরকার আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে কোনো ছাত্রের ভর্তি হওয়ার সুযোগটুকুও রাখা হয়নি। এই পরিস্থিতির বদল দরকার। পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাধীন প্রতিষ্ঠান 'রূপকলা কেন্দ্র' সীমিত মাত্রায় বাংলাদেশি ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ দেয়। এই সুযোগ আরও বাড়ানো এবং এর সঙ্গে বৃত্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিদ্যমান চলচ্চিত্রনীতির নবায়ন এবং সুপারিশকৃত নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করলে তা বর্তমান পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন আনবে।

জাতির স্মৃতি সংরক্ষণের প্রশ্ন এবং জাতীয় চলচ্চিত্র আর্কাইভসের ২০ বছর

একটি জাতির ইতিহাস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধারণ করা থাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। সেই অর্থে আর্কাইভসের কাজ হলো জাতীয় স্মৃতির সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ। অনেকের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে, কালজয়ী ধ্রুপদি চলচ্চিত্রগুলোর সংগ্রহ ও সংরক্ষণই মূলত আর্কাইভসের উদ্দেশ্য। আসলে একটি স্থূলতম বাণিজ্যিক ছবি থেকে শুরু করে বস্তাপচা বিজ্ঞাপন বা নির্লজ্জ সরকারি নিউজ রিল—সবকিছুই আর্কাইভসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ছবির ঐতিহাসিক ও নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যের বিচারক আর্কাইভস নয়। নিকৃষ্টতম কারিগরি মানসম্পন্ন ছবির সিকোয়েন্স একটি হয়তো ৫০ বছর পরের মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, কারণ ঢাকা শহরের যে লোকেশনে ছবিটি নির্মিত হলো, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোনো এক সময় বৃদ্ধি পেতে পারে।

আর্কাইভস প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি পর্ব

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভস যেমন দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠান নয়, তেমনি হঠাৎ আকাশ থেকে একদিন নেমেও পড়েনি। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিক থেকে শুরু হয়ে '৭৮-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রচারণা ও আন্দোলনের ফসল আর্কাইভস। চলচ্চিত্র সংসদের কর্মীদের দীর্ঘ তিন বছরের আন্দোলন ও দাবির সরাসরি ফসল এটি। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় একটু জোরের সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসবিষয়ক বইয়ের সংখ্যা দু-তিনটির বেশি নয়। তার একটিতে লেখা আছে, 'জিয়াউর রহমানের ঐকান্তিক আগ্রহ ও নির্দেশের ফলশ্রুতিতে'

আর্কাইভস গঠিত হয়েছিল। সত্য হলো, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজিত ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আর্কাইভসের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হতে থাকে। কোর্সের পরিচালক পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সতীশ বাহাদুর জাতীয় চলচ্চিত্র আর্কাইভসের ওপর জোর দেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের মুহম্মদ খসরু, বাদল রহমান প্রমুখের উদ্যোগে সতীশ বাহাদুরকে দিয়ে একটি ধারণাপত্র বা রূপরেখা তদানীন্তন তথ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে সতীশ বাহাদুরের আর্কাইভস-বিষয়ক লেখালেখি ও সাক্ষাৎকার এ বিষয়ে জনমত সংগ্রহের প্রয়োজনে প্রচারণার অংশ হিসেবে ছাপানো হয়।

'৭৬-এ আমেরিকান চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ড. মাইক উইভার ঢাকায় একটি চলচ্চিত্র কর্মশালা পরিচালনা করেন। কর্মশালার একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমার মনে আছে, এই কর্মশালার মাধ্যমেও আর্কাইভসের জোরালো দাবি তোলা হয়। প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ এক উৎসবের আয়োজন করে এবং আর্কাইভসের দাবি আন্তর্জাতিক নজরে আনার জন্য উৎসবটি উৎসর্গ করা হয় আর্কাইভস ধারণার জনক ও 'লা সিনেমাথেক ফ্রসেজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা অঁরি ল্যাংলোয়াকে।

১৯৭৮-এ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশনের মাধ্যমে বাদল রহমান ও সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকীর উদ্যোগে তদানীন্তন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের কাছে সতীশ বাহাদুরের রূপরেখাকেই অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পেপার ক্লিপিংসহ পেশ করা হয়। বাদল রহমান, সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকী, জিন্নাত আলী, সৈয়দ বজলে হোসেন, সৈয়দ হাসান ইমাম, এহতেশামুর রহমান ও কলিমুল্লাহ ভূঁইয়াকে নিয়ে সরকার একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে ৭৮-এর ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভস গঠন করে। জনাব এ কে এম রউফকে কিউরেটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

আর্কাইভসের সোনালি সময়

ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি আহসানউদ্দিনের ধানমন্ডির বাড়ি ভাড়া করে '৭৮-এর মে মাসে ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভস শুরু হয়। ফিল্ম সংরক্ষণের ভল্টের ব্যবস্থাসহ ১২০ সিটের ৩৫ মিলিমিটার ও ১৬ মিলিমিটার প্রজেক্টর-সমৃদ্ধ একটি আধুনিক মিলনায়তন তৈরি করা হয়। এ ছাড়া চলচ্চিত্রবিষয়ক বইপত্রের লাইব্রেরি গঠিত হয়। বাংলা ছবির *দেবদাস*-এর হারিয়ে যাওয়া প্রিন্ট, কবি নজরুল ইসলাম

নির্মিত ও অভিনীত ছবি *ধ্রুব* ও *লাস্ট কিসে*-এর স্থিরচিত্রসহ বেশ কিছু মূল্যবান চলচ্চিত্র উদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক আর্কাইভস ফেডারেশনের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ আর্কাইভস। ফলে কেবল প্রিন্টের দাম সরবরাহ করে বিশ্বনন্দিত বিভিন্ন দেশের ধ্রুপদি ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এই সদস্যপদ লাভের কারণে বাংলাদেশ আর্কাইভসের পক্ষে ইউনেসকোসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদান প্রাপ্তি সহজ হয়ে পড়ে। যদিও পৃথিবীর সব আর্কাইভসই ইউনেসকোসহ সমজাতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। তবু বাংলাদেশ আর্কাইভস এ ধরনের সহায়তার সুযোগ গ্রহণে সমর্থ হয়নি। আর্কাইভসের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এক কোটি ত্রিশ লাখ টাকার একটি টেলিসিনে মেশিন বিদেশি সংস্থার অনুদানে কেনার সুযোগ পেয়েছিল আর্কাইভস। কিন্তু বাণিজ্যিক ছবির পাইরেসির অজুহাতে তদানীন্তন সরকার অনুমোদন দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

গোড়ার দিকে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত অনেক দলিল ও বইপত্র আর্কাইভসকে দিয়ে দেয়। ফতেহ লোহানীর লাইব্রেরি, এফডিসির বেশ কিছু নেগেটিভ এর মধ্যে অন্যতম। অনেকেই বিনা পারিশ্রমিকে বা নামমাত্র যাতায়াত খরচের বিনিময়ে চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রবিষয়ক দলিলপত্র, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার কাজ করতে এগিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের কিংবদন্তি পুরুষ মুহম্মদ খসরুর অবদান গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অনেক দুর্লভ ছবি সংগ্রহ ও গবেষণার জন্য আহাদ সাহেবের অবদান গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। দুঃখজনক হলেও সত্য, পরবর্তী সময় এঁদের স্বেছাসেবী ভূমিকাকে কাজে লাগানোর কোনো উদ্যোগই আর্কাইভস নেয়নি।

১৯৮১ সালে আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে আর্কাইভসের বহুল আলোচিত ফিল্ম কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কোর্স থেকেই বিকল্প ধারার প্রথম সারির কয়েকজন নির্মাতা বেরিয়ে আসেন। জন্ম হয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের। এ বছরই ফিল্ম আর্কাইভস হয়ে ওঠে দেশের জাতীয় চলচ্চিত্র সংস্কৃতির পাদপীঠ। একই বছরে জাতীয় পর্যায়ে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজিত হয়। এ ক্ষেত্রে আর্কাইভস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া বিদেশি চলচ্চিত্রকার ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণের মাধ্যমে প্রচুর চলচ্চিত্র সেমিনার, উৎসব ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। চলচ্চিত্রকর্মীদের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে আর্কাইভস প্রাঙ্গণ।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে এ সময়, চলচ্চিত্র সংসদের কর্মীদের উৎসাহ এবং কিউরেটর রউফ সাহেবের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের কেবল দুর্লভ

কিছু সংগ্রহ নয়, সেগুলোর গোপন প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। আমার মনে আছে, আর্কাইভসে মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত ভারতীয় চলচ্চিত্র *ডেটলাইন বাংলাদেশ* দেখে আমি কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। *নাইন মান্থস টু ফ্রিডম* ছবিটিও আমি প্রথম ওখানে দেখি। ১৯৮৮ সালে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রের বিশেষ অধিবেশন আয়োজনের অনুপ্রেরণা আমরা ওখানে থেকেই পাই। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলে রাখি, *মুক্তির গান*-এ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যে ফুটেজগুলো আমরা ব্যবহার করেছি, তার সিংহভাগ ভারতের ফিল্ম ডিভিশন থেকে কেনা এবং এগুলোর সন্ধান পাওয়া কখনোই সম্ভব হতো না, যদি আমি ওই ছবি দুটো আর্কাইভসে না দেখে থাকতাম। আজ বিটিভিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে মূল্যবান ফুটেজগুলো প্রায় প্রতিদিনই দেখানো হচ্ছে, তার প্রায় সব কটিই নিঃশব্দে-নীরবে আর্কাইভসে সংরক্ষিত ছিল এত দিন। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত এ ছবিগুলো মূলত প্রথম কিউরেটর জনাব রউফ সাহেবের উদ্যোগেই উদ্ধার ও সংরক্ষিত হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানে এগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তা আর্কাইভসে সংরক্ষিত না হলে সে সময়ের প্রাকৃতিক নয়তো রাজনৈতিক আবহাওয়ার কারণে হাওয়া হয়ে যেত।

যা হোক, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে সাভারে ভাবা হলেও পরে আগারগাঁওয়ে প্রায় দুই একর জমি আর্কাইভসের জন্য বরাদ্দ করা হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা প্রস্তুত এবং তা পাস করা হয়। এ নকশার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণাগার, একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট, একটি মিনি ফিল্ম ল্যাব ও ফিল্ম সোসাইটি এবং ছাত্রদের ব্যবহারের উপযোগী দুটি ছোট মিলনায়তন, লাইব্রেরি ও ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়।

আর্কাইভসের অধোযাত্রা

আর্কাইভসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও শ্রীবৃদ্ধির সব স্বপ্ন ১৯৮২ সাল থেকে ভেস্তে যেতে থাকে। এ বছর থেকেই আর্কাইভসের ওপর একের পর এক আঘাত আসতে শুরু করে। শুরু হয় আর্কাইভসকে একটি নিষ্ক্রিয় অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সব তৎপরতা। এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এ বছর আর্কাইভসের অন্যতম সফল ও সক্রিয় অংশ ইনস্টিটিউটকে আর্কাইভস থেকে বিযুক্ত করে নিমকোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অজুহাত দেখানো হলো, নিমকো টেলিভিশন ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, তাই ইনস্টিটিউট পরিচালনায় তাদের অধিকার ও

যোগ্যতা বেশি। মজার ব্যাপার হলো, আর্কাইভসের আওতাধীন পর পর কয়েকটি সফল ফিল্ম কোর্স হওয়ার পর নিমকোর অন্তর্ভুক্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইনস্টিটিউটের মৃত্যু ঘটে। সে বছর থেকেই আর্কাইভসের চলচ্চিত্র সংগ্রহ কার্যক্রম কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ সময় পরিসরে এমনকি অফিশিয়াল রেকর্ডেও কোনো সংগ্রহের উল্লেখ নেই। '৯২ সালের পরেও যে কোনো সংগ্রহ হয়েছে, তা নয়।

এরপর আর্কাইভসের ওপর যে আঘাতটি আসে, তাকে বর্তমানের এতিম অবস্থার সূচনা হিসেবে ধরা যায়। ১৯৮৬ সালে আর্কাইভসকে ধানমন্ডির বাড়িটি ছাড়তে হয়। বহু টাকা ব্যয়ে তৈরি করা মিলনায়তন, ফিল্ম ভল্ট পেছনে ফেলে রীতিমতো শরণার্থী হতে হয় গণভবনের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে। এ পর্যায়ে এসে আর্কাইভস নেহাত একটি গুদামঘরে পরিণত হয়। বহু দামে কেনা ৩৫ মিলিমিটার প্রজেক্টরগুলো, এয়ার কন্ডিশনার, ডিহিউমিডিফায়ার, পরবর্তী সময়ে সংগৃহীত একটি অত্যাধুনিক ৩৫ মিলিমিটার ও একটি ১৬ মিলিমিটার এডিটিং মেশিন ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কালক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। দুর্গম জায়গায় অবস্থিত বলে সেই পুরোনো প্রাণচাঞ্চল্য তো দূরের কথা, নিতান্ত প্রয়োজনেও চলচ্চিত্র গবেষকেরা সেখানে যেতে নিরুৎসাহী হয়ে ওঠেন।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশ আর্কাইভসের প্রথম কিউরেটর এ কে এম রউফ সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন। একটু রূঢ় শোনাবে, কিন্তু সত্য কথা হলো, এর পর থেকে যাঁরাই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁদের কারোরই আর্কাইভস বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান, আগ্রহ ও দায়িত্ববোধ ছিল না। এ কে এম রউফের প্রস্থানের মধ্য দিয়ে আর্কাইভস আরও নিরর্থক নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাঁর জায়গায় যাঁরা এলেন, তাঁরা আর্কাইভসের উন্নয়নের বদলে নিজেদের পদমর্যাদা বাড়াতে সক্রিয় হলেন এবং সম্মানজনক কিউরেটর পদবির পরিবর্তে মহাপরিচালক পদবির জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। ভেবে দেখুন, ফরাসি আর্কাইভসের অঁরি ল্যাংলোওয়া বা ভারতীয় আর্কাইভসের পি কে নায়ারকে কোটি টাকার বিনিময়েও কিউরেটরের বদলে মহাপরিচালক পদবি গ্রহণ করানো যেত কি না! আর্কাইভসের ক্ষেত্রে তদানীন্তন সরকারগুলোর উপেক্ষার ফলে জাতির স্মৃতি সংরক্ষণাগার নিজেই বিস্মৃত হতে থাকে। প্রথম কিউরেটর এ কে এম রউফের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক দুর্লভ ছবিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এফডিসি থেকে আনা মূল্যবান নেগেটিভগুলো যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন নষ্ট হয়েছে *নদী ও নারী*র দুর্লভ প্রিন্ট। তদানীন্তন মহাপরিচালকের

আমলে বিটিভি থেকে সংগৃহীত ১৬ মিলিমিটার রিভার্সাল নিউজ রিল ফুটেজ স্থানাভাবের অজুহাতে আয়োজন করে পোড়ানো হয়। আর্কাইভসের কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বলেন, মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়েই পোড়ানো হয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাসে এ রকম অপকর্মের আর কোনো নজির আছে বলে মনে হয় না। দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকা ডিহিউমিডিফায়ার ও এয়ার কন্ডিশনারগুলো মেরামত করার জন্য সরকারি অনুমোদন পেতে আর্কাইভস ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে পুরোনোগুলো নিলামে বিক্রি করে নতুন ডিহিউমিডিফায়ার ও এয়ার কন্ডিশনার কেনার জন্য বছরের পর বছর ধরে চালাচালি করেও তার কোনো সুরাহা হয়নি।

ইতিমধ্যে উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা আর্কাইভসকে আরও অকেজো ও পঙ্গু করার চেষ্টা চালিয়ে যান। ১৯৯৪-এ নূরুন্নবী কমিটি আর্কাইভসকে ডিএফপির অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে, যা আর্কাইভস বিলোপের চেষ্টা মাত্র। এ ছাড়া সরকারি দু-একজন কর্মকর্তা আর্কাইভসকে এফডিসির অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও রাখেন। অন্যদিকে আগারগাঁওয়ে স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবিত প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় বছরের পর বছর ঝুলতে থাকে।

বর্তমান : স্বপ্ন ও সত্য

এমতাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় ফিরে এলে অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মীর মতো চলচ্চিত্র সংসদকর্মীদের মধ্যেও আশার সঞ্চার হয়। চলচ্চিত্র সংসদকর্মী এবং বিকল্প ধারার চলচ্চিত্রনির্মাতা ও কর্মীরা আশা করতে থাকেন, দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত জাতীয় চলচ্চিত্র আর্কাইভস তার যথাযথ মর্যাদা ফিরে পাবে এবং খুঁজে পাবে বহু আকাঙ্ক্ষিত তার স্থায়ী আবাস। চলচ্চিত্রকর্মীদের এই প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম দুই বছরের মধ্যেই স্থায়ী আর্কাইভস ভবন নির্মাণের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে দেয়। কিন্তু সম্প্রতি সব চলচ্চিত্রকর্মীকে অবাক ও হতাশ করে দিয়ে বর্তমান সরকার আর্কাইভসের অনুমোদিত প্রকল্প একরকম বাতিল করে দিয়েছে। দীর্ঘদিনের দেনদরবার, ফাইল চালাচালির চূড়ান্ত ফসল আর্কাইভসের স্থায়ী ঠিকানা বাতিল করে সেখানে তথ্য কমপ্লেক্স করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান সরকার। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম ধাঁচের প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট কমপ্লেক্স ভবনের মধ্যে গুটিয়ে আনতে এই উদ্যোগ। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ডিএফপি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, নিমকো, পিআইডি, সেন্সর বোর্ড, রেডিও, টেলিভিশন—এগুলোর উদ্দেশ্যগত, চরিত্রগত ও কার্যক্রমগত মিল রয়েছে। সে

ক্ষেত্রে এগুলোকে একটি অভিন্ন কমপ্লেক্সের মধ্যে আনার যথার্থতাও রয়েছে। কিন্তু জাতীয় চলচ্চিত্র আর্কাইভস কেবল কার্যক্রম ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়েই ভিন্ন প্রতিষ্ঠান নয়, এটি জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় আর্কাইভস ও জাতীয় জাদুঘরের মতো স্বতন্ত্র অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের অধিকারী প্রতিষ্ঠান।

সরকারি তথ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রবাহ ও প্রচারণা সংক্রান্ত মেশিনগুলোর সমন্বয় সাধনের জন্য তথ্য কমপ্লেক্স সুফল বয়ে আনবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তথ্য কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যে রাজনৈতিক তাৎপর্যের প্রয়োজন, আর্কাইভসের তা নেই এবং থাকা উচিত নয়।

আর্কাইভসকে তথ্য কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্তকরণের এই নাটকীয় সিদ্ধান্ত আসলে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চপদস্থ আমলারা আর্কাইভসকে অন্য প্রতিষ্ঠানের বিভাগ বানানোর যে পাঁয়তারা চালাচ্ছিলেন, তারই অনুসৃতি মাত্র। দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারি মহলে চলচ্চিত্র আর্কাইভসের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্থায়ী অস্পষ্টতা আজও বিরাজ করছে। বাংলাদেশের যে দল বা সরকারের কাছে আর্কাইভসের প্রকৃত তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি থাকা উচিত, সে দলটি এখন ক্ষমতায়। ২১ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার সব চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে বিগত সরকারগুলো। এই প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর ছবিগুলো রক্ষিত হয়েছে এই আর্কাইভসেই। ইদানীং প্রায় প্রতিদিন বাংলাদেশ টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ ফুটেজগুলো দেখানো হচ্ছে। কিন্তু পরিহাসের ব্যাপার, যে অবহেলিত প্রতিষ্ঠানটি এত দিন এই ১৬৭টি ছবি আগলে রেখেছিল, তার পুরস্কারস্বরূপ সরকার এই অনিকেত প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নের ঠিকানা সম্প্রতি হাইজ্যাক করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই মহামূল্যবান ছবিগুলো সুপরিকল্পিত ধ্বংসের হাত থেকে যে বেঁচে গেছে, তার কৃতিত্ব আর্কাইভসের দায়িত্বশীলতা বা সচেতন প্রচেষ্টা নয়; এটা রক্ষা পেয়ে গেছে এই কারণে যে, চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরের মতো আর্কাইভস সরকারের সরাসরি খপ্পরের আওতার বাইরে ছিল। আজ আর্কাইভসকে তথ্য কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সরাসরি সরকারি প্রচারযন্ত্রের নিকটবর্তী করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা ভবিষ্যতে জাতীয় ইতিহাসের উপাদানের নিরাপদ সংরক্ষণে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। কোনো সরকার যে চিরকাল ক্ষমতায় থাকবে, সেই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। ভবিষ্যতে যদি আবার কখনো মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আসে, তখন আর্কাইভসকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছাকাছি পাওয়ার সুযোগের সবচেয়ে

বড় সদ্ব্যবহার তারাই করবে। বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে আজকের সরকারের অদূরদর্শী এই উদ্যোগ।

একপর্যায়ে আর্কাইভস তার এত দিনের শেষ আশ্রয়স্থল গণভবনের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারটিও হারায়। আশ্রয়হীন আর্কাইভস জুলাই থেকে উঠে এসেছে মোহাম্মদপুরের একটি বাড়ির পঞ্চম তলায়। কী দুরবস্থায় উঠে আসতে হয়েছে, এখানে তার একটি প্রমাণই যথেষ্ট হবে আশা করি। ফিল্ম ভল্টের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে র‍্যাক। অতগুলো ভারী র‍্যাক পাঁচতলায় তুললে বাড়ি ভেঙে পড়বে—এই অজুহাতে বাড়িওয়ালা র‍্যাকগুলো ওপরে তুলতে দেননি। সেগুলো নিচেই পড়ে আছে, আর ফিল্মগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ফ্লোরে।

উপরিউক্ত বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো প্রস্তাব আকারে পেশ করছি :

১. ফিল্ম আর্কাইভসকে স্বতন্ত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিয়ে অবিলম্বে তার জন্য স্বতন্ত্র স্থায়ী ভবন প্রতিষ্ঠা করা হোক।

২. অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি আর্কাইভসকে সম্পৃক্ত করতেই হয়, তাহলে ফিল্ম ইনস্টিটিউট বা সাংস্কৃতিক বলয়ের অংশ হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্রকেন্দ্র বা কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৩. জাতীয় জাদুঘর, শিল্পকলা একাডেমী ও বাংলা একাডেমীর মতো ফিল্ম আর্কাইভসকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হোক।

৪. মহাপরিচালকের পদ বাতিল করে কিউরেটরের বিশেষ পদ ফিরিয়ে আনতে হবে। আমলাতান্ত্রিক নিয়োগসাপেক্ষ না করে একজন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও কমিটেড ব্যক্তিকে কিউরেটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হোক।

৫. আর্কাইভসের বর্তমান অবস্থা ও অতীতের ক্ষয়ক্ষতি এবং চলচ্চিত্রগুলোর দুরবস্থা নিরূপণের জন্য জাতীয় পর্যায়ের অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ইভালুয়েশন কমিটি গঠন করা হোক।

৬. চলচ্চিত্র সংগ্রহের জন্য যথোপযুক্ত গবেষক ও সংগ্রাহক নিয়োগ দেওয়া হোক।

৭. আর্কাইভস কর্মচারীদের মধ্য থেকে দু-তিনজনকে চলচ্চিত্র সংরক্ষণের ওপর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানো হোক বা বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক।

একটি সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত

আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের চলচ্চিত্র

বড় কিংবা ছোট, যেকোনো দেশই হোক, তাদের নিজস্ব একটি বাজার আছে। টিকে থাকার জন্য শুধু নিজের দেশ নয়, বাইরের দেশগুলোতেও বাজার তৈরি করতে হবে। অন্যথায় টিকে থাকা দুষ্কর। ভারত বৃহৎ একটি চলচ্চিত্রশিল্পের দেশ। সেই দেশও টিকে থাকার জন্য দেশের বাইরে তাদের বাজার সম্প্রসারণ করছে।

বাংলাদেশের মতো দেশ, যেখানে আমাদের বাজার সবচেয়ে ছোট। আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় সিনেমা হলের স্বল্পতা রয়েছে, টিকিটের মূল্য স্বল্পতা রয়েছে। ইংল্যান্ডে একটি টিকিটের মূল্য ১০ পাউন্ড, যা বাংলাদেশের টাকায় প্রায় এক হাজার টাকা। সে দেশে এক হাজার টাকা টিকিটের দাম এবং সরকারের এক টাকাও কর নেই। ফ্রান্সে সরকারি ভর্তুকিও আছে। সেখানে সিনেমা হলকে উল্টো টাকা দেওয়া হয়। আর আমাদের এখানে টিকিটের ৬০ শতাংশ সরকার পায়। অবশ্য এখন সরকার একটু হ্রাস করেছে। *মাটির ময়না* ছবিটি ইংল্যান্ডে চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশে চালালে কত বছর লাগত টাকাটা তুলতে, ভাবুন। বাংলাদেশের বাজার ছোট। কিন্তু ইউরোপের কোনো দেশে যদি আমাদের ছবি চলে, তাহলে দু-তিন মাসে টাকা উঠে যায়। আমাদের দেশে নির্মাণ ব্যয় বাইরের তুলনায় সবচেয়ে কম, সুতরাং, আমাদের সুবিধা বেশি। হলিউডের কথা বাদ, বলিউডের ছবির কথাই ধরুন, সে তুলনায় কিন্তু আমাদের দেশের ছবির নির্মাণ ব্যয় হাস্যকর রকম কম। আমাদের পুঁজি উঠিয়ে আনা সহজ। আর স্বল্প পুঁজি নিয়ে যদি আমরা বিশ্ববাজারে পৌঁছাতে পারি, আমাদের লগ্নিকৃত অর্থ অনিবার্যভাবে উঠে আসবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, *মাটির ময়না* ছবির বাজেট তিন লাখ ডলার। আমরা ফরাসি সরকারের এক লাখ ডলারের কারিগরি সহযোগিতা

পেয়েছি। ফরাসি ল্যাব, ফরাসি ক্যামেরা, ফরাসি ফিল্মস্টক—তার পরও আমাদের আরও দুই লাখ ডলার খরচ হয়েছে। বাইরের প্রিন্ট ও অন্যান্য খরচসহ মোট তিন লাখ ডলার খরচ হয়েছে। পুরোটাই দেশে করলে হয়তো এক লাখ ডলারের বেশি খরচ করার সুযোগ থাকত না।

বিদেশে *মাটির ময়নার* মতো কালনির্ভর ও বর্ষা-বসন্ত-শীত এমন বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক ছবি নির্মাণ ভীষণ ব্যয়বহুল। বিদেশিদের যদি বলা হয়, *মাটির ময়নার* বাজেট তিন লাখ ডলার, তাদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়—এত সস্তা! আর আমাদের দেশের মানুষ চমকে উঠবে—এত টাকা! বিশ্ববাজারের কথা যদি ভাবি, তাহলে অনেক সস্তায় আমরা ছবি বানাতে পারছি। আবার টিকিটের ৭০ টাকার মধ্যে আমরা (একজন প্রযোজক) পাই মাত্র ১০ টাকা। আর অন্য দেশে ১০ পাউন্ডের জায়গায় ন্যূনতম পেলেও ৫ পাউন্ড পাবেন। তার মানে প্রায় ৫০০ টাকা। ১০ টাকা বনাম ৫০০ টাকা। এখন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে কেন বিশ্বায়ন প্রয়োজন, মনে হয় তার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নটা হলো, কী করে আমরা বিশ্বায়ন করব? বিশেষ করে, স্যাটেলাইট ও টিভির এই যুগে বিশ্বায়ন ছাড়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বাজারই টিকে থাকবে না। বিশ্বায়ন না করলে আমরাই বিশ্বায়িত হয়ে পড়ব। আপনাকে বেঁচে থাকতে হলে বিশ্বায়নে যেতে হবে। আপনি যদি বাজার সৃষ্টি না করেন, আপনি নিজেই বাজারে পরিণত হবেন। আজ যদি আমরা বাংলাদেশের সিনেমাকে বিশ্ববাজারে না পাঠাতে পারি, তাহলে বলিউডই এ বছর না হোক, আগামী বছর বা তার পরের বছর আমাদের বাজার দখল করে নেবে। আমাদের স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রি শেষ হয়ে যাবে। বলিউড আমাদের সিনেমা হলে না এসেই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের এমনই এক অবস্থা! দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছেন, স্থানীয় ছবিকে রক্ষা করবেন, কিন্তু পারবেন না। দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, জানালা দিয়ে ঢুকছে। জানালা বন্ধ করে দিয়েছেন, ঘরের চালের ফুটো দিয়ে ঢুকছে। স্যাটেলাইটের যুগ, এখন দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েও স্যাটেলাইট বন্ধ করতে পারছেন না। শুধু ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর জন্যই নয়, টিকে থাকার জন্যও আমাদেরকে বিশ্বায়নে যেতে হবে। আমাদের নির্মাণ ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে হবে, অথচ নিজের দেশেই আমরা বাজার হারিয়ে ফেলেছি।

বাংলা ছবিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এ দেশে হলিউড-বলিউডের ছবি বন্ধ করতে হবে—এটা আমি বিশ্বাস করি না। এতে আমাদের সিনেমা হলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গত দুই বছরে প্রায় ১০০টি সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে। পুরো

চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির একটি বিরাট দিক সিনেমা হল। সব রকম রাজস্ব সিনেমা হল থেকে আসে। প্রশ্ন হলো, ইন্ডাস্ট্রি কেন দরকার? বড় লোককে বড় করার জন্য? সিনেমা হল থেকে সরকার ট্যাক্স পাবে। সেটা জনগণের পেছনে ব্যয় হবে। আজ যদি বলিউডের সিনেমা এখানে রিলিজ হতো, সিনেমা হলগুলো চাঙা হতো। হলের পরিবেশ ভালো হতো। আয় বেশি হতো। সিনেমা হলকে বাঁচাতে হলে দরজা-জানালা খুলে দিতে হবে। তা না হলে স্যাটেলাইট এসে সব সয়লাব করে ফেলবে, আখেরে আমাদের প্রডাকশনকেও খেয়ে ফেলবে। এর থেকে মুক্তির উপায় হলো বিশ্বায়ন। তবে আমাদের বিচারের বিষয়, বিশ্বায়নের ধরনটা কেমন হবে?

প্রথমত, আমরা বাইরের ছবি আসতে দেব না, আবার আমাদের ছবি বাইরে বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পাবে—এটা তো হয় না। আপনি গাছেরটাও খাবেন, তলারটাও কুড়োবেন, এটা তো হয় না। এটা করা আকাশকুসুম কল্পনা। আমাদের ছাড় দিতে হবে। ভারতের ছবি এখানে মুক্তি দিলে ব্যবসা ভালো করত। আমরাও লাভবান হতাম। কিন্তু হলো না। কারণ, ভারতের ছবি এখানে চলে না। তাই আমাদের ছবিও ওরা চালায় না। ভারতের ছবি এলেই যে আমাদের ছবি চলবে না, এই মান্ধাতার আমলের চিন্তা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিযোগিতায় গেলে আমাদের লাভ না ক্ষতি, এটা চিন্তা করতে হবে। আমাদের লাভই বেশি। শিখতে পারব, যৌথ প্রযোজনায় যেতে পারব। ভারত এখন আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভর করে। তাদের ছবির টাকার বেশ কিছুটা বাইরে থেকে আসছে। তাদের সিনেমা হলগুলো অনেক উন্নত। কেন? কারণ, তারা বিভিন্ন দেশের ছবি চালায়।

দ্বিতীয়ত, কী করে আমরা বাইরে যাব? তার জন্য আমাদের ছবি দরকার। যে দেশের বাজার সীমিত, সে দেশে বছরে প্রায় ১০০টি ছবি বাহুল্য—এই সংখ্যা কমাতে হবে। সংখ্যা কমিয়ে ছবির মান বাড়াতে হবে। এখানে ৯০টি ছবির মধ্যে ৮০টিই ফ্লপ করে। বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত আসে না। এটা একটা ভুল অর্থনীতি।

রুচিবোধ নিয়ে আমার কোনো কথা নেই। রুচিহীন ছবি হবে, রুচিসম্পন্ন ছবি হবে। তবে ন্যূনতম মানসম্পন্ন ছবি হতে হবে। কারিগরি গুণটা থাকতে হবে। পাশাপাশি সদিচ্ছা থাকতে হবে। আমাদের দেশে যোগ্য নির্মাতা নেই, তা বলব না, অনেকেই আছেন। অনেকে বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। তাঁরা নাটক করছেন, বিজ্ঞাপন করছেন। কিন্তু কখনোই তাঁদের আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে স্বাগত জানাইনি, তাঁরাও ইন্ডাস্ট্রির কাছে এগিয়ে আসেননি। আমরা

সব সময় সরকারকে দোষ দিই। এটা আমার কাছে সবচেয়ে হাস্যকর বলে মনে হয়।। কারণ, ফিল্ম নিয়ে সরকার ভাববে, তা আশা করাই ভুল। যাঁরা শিল্পপতি, তাঁরা কেন ছবি প্রযোজনা করছেন? আমি মনে করি, সরকার থেকে সবচেয়ে বড় যে সহযোগিতা আশা করতে পারি তা হলো, সরকার যেন কখনো বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আমরা সরকারের কাছে যেটুকু আশা করি তা হলো, একটা সুস্থ চলচ্চিত্র নীতিমালা। অবশ্য এটা সরকার করবে না। চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, সিনিয়র ব্যক্তিত্ব, এ ছাড়া চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, তারা সমন্বিতভাবে এ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। সেটা সরকারিভাবে হোক আর ব্যক্তিগতভাবেই হোক। এমন ছবি তৈরি করতে হবে, যেগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠানো যায়। কিন্তু কেবল কারিগরি মান নয়, আমাদের ছবির গল্প, চিত্রনাট্য, সংলাপ এতই নিম্নমানের যে এর একটা গতি না করে আন্তর্জাতিক বাজারে ছবি পাঠনোর প্রশ্ন অবান্তর, বিশ্বায়নের বিষয়টিও ভাবা নিরর্থক।

সম্প্রতি লন্ডনের জেনেসিস সিনেমা হলের মালিক *মাটির ময়না* ছবিটি চালানোর পর ফোনে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে এ রকম ছবি নির্মিত হলে তাঁরা বাংলাদেশের সঙ্গে একই দিনে লন্ডনেও রিলিজ দেবেন। আমি মনে করি, *মাটির ময়না* আন্তর্জাতিক বাজারের দ্বার খুলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের ছবি নিয়ে যাওয়ার জন্য কতগুলো কৌশল আমাদের বুঝতে হবে, রপ্ত করতে হবে। যৌথ প্রযোজনা একটি অপরিহার্য ও মোক্ষম প্রক্রিয়া। *মাটির ময়না* ছবিটির ফরাসি অংশীদার প্রতিষ্ঠান এমকে-টু। এমকে-টু এ ছবির প্রযোজনায় একটি পয়সাও ব্যয় করেনি। তারা শুধু ফরাসি সরকারের অনুদানের অর্থ—ফরাসি কারিগরি দিকটি দেখাশোনা করেছে। বরং ফরাসি অনুদানের কমিশন খেয়েছে তারা। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিবেশনার খরচাদি ও দায়দায়িত্ব নেওয়ার সুবাদে তারা ছবির ৫০ শতাংশ মালিকানা ভোগ করেছে। শুধু তা-ই নয়, ইউরোপ-আমেরিকার মুনাফাও কার্যত তারাই করায়ত্ত করেছে। কিন্তু এই নামকাওয়াস্তের যৌথ মালিকানা বা প্রযোজনায় না গেলে আজ আমরা *মাটির ময়না*কে বিশ্ববাজারে নিয়ে যেতে পারতাম না। ছবিটি ফ্রান্সে চার মাস ধরে ৪৪টি সিনেমা হলে চলেছে। ইতালি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, কানাডায় গত বছরেই বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পেয়েছে। চলেছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ইংরেজিভাষী দেশগুলোয়।

স্বদেশে *মাটির ময়না* যে দর্শক সমাদর পেয়েছে, সেটাও ইতিবাচক ঘটনা। তিন সপ্তাহ 'মধুমিতা'য় চলার পরও 'বলাকা'য় পুনর্মুক্তি পেয়ে *মাটির ময়না*

চার সপ্তাহ হাউসফুল চলল। এ কৃতিত্ব মূলত দর্শকদের। বাংলাদেশের দর্শকেরা বরাবরই সুস্থ-সৃজনশীল ছবির পৃষ্ঠপোষক, তা আবারও প্রমাণিত হলো। মনে রাখতে হবে, আমাদের পরিচালকদের চেয়ে আমাদের দর্শকেরা হাজার গুণ শিক্ষিত। এই পরম সত্যটিকে আগে আমাদের স্বীকার করতে হবে। তাহলেই আমরা আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে পারব। আমাদের আত্মবিশ্বাসের বড় অভাব। আমি মনে করি, যোগ্য পরিচালক আছেন। কিন্তু তাঁরা ফাঁকি দেন। ফলে তাঁরা নিজেরাই ফাঁকিতে পড়েন। কাজের প্রতি আন্তরিক নন। তাঁরা তৎপর নন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিকভাবে তাঁরা অলস। অর্থাৎ যাঁরা প্রতিভাবান, তাঁরা ফাঁকিবাজ। আর যাঁরা প্রতিভাহীন, তাঁরা তৎপর। এটা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সত্য, আমাদের চলচ্চিত্রের বেলায়ও তেমনি সত্য। ওইখানেই আমরা আটকে গেছি। আমরা চলচ্চিত্রের মাঠটিকে ছেড়ে দিয়েছি চরম কুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের কাছে। তারা ছবি বানানো তো দূরের কথা, নামকরণের ক্ষেত্রে পর্যন্ত মৌলিক চিন্তা করতে পারে না। এদের কাছে আমরা সৃষ্টিশীল কিছু আশা করতে পারি না। কিন্তু আমরা যারা নিজেদের চলচ্চিত্রে শিক্ষিত মনে করি, তারা আপসকামী, সুবিধাবাদী ও অলস। আমি তাদের থেকে আলাদা কেউ নই। তবে আশার দিক হলো, নতুন ধারার ছবি হলে দর্শকপ্রিয়তা পাবে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও পাবে। যেটা কোনো দিন, কোনো কালেও পায়নি সুস্থ ধারার ছবি। সর্বোপরি আশার দিক হলো, যারা অশ্লীল ছবি বানাবে, আজ তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এটা মজার ব্যাপার এবং একটা ইতিবাচক দিক বলে মনে হয়। আমি মনে করি, এটা বড় বিজয়। সুস্থ ছবির নির্মাতাদের জন্য দরজা খুলে দিল ইন্ডাস্ট্রি। শুধু ওপর ও বাইরে থেকে খাটো করে নয়, শুধু গালাগালি করে নয়, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আজ এই ভস্ম থেকে আবার নতুন করে একটা ইন্ডাস্ট্রি ও শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। এটা সম্ভব হবে যদি আমরা আন্তর্জাতিক বাজারকে গুরুত্ব দিই।

প্রতিটি জিনিসের সময় ও সুযোগের ব্যাপার আছে। এখন সময় আসছে, সবাই যদি আমরা সচেষ্ট হই, তাহলে অবশ্যই আমরা শুধু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা পুরস্কারের মালা নয়, এমনকি টাকারও মালা নিয়ে আসতে পারি এবং আমাদের দেশের ইন্ডাস্ট্রিকে তাজা করে তুলতে পারি। আসুন আমরা কাজটা শুরু করি।

স্বপ্নের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রের স্বপ্ন

আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও কারিগরি সুবিধাদিসহ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যে সমস্যাগুলো রয়েছে, সেগুলোর উন্নতি ঘটালেই যে সমগ্র চলচ্চিত্রের পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন হবে, তা নয়। চলচ্চিত্রের নির্মাণ-পূর্ব ও নির্মাণ-উত্তর দুটি প্রক্রিয়া চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন ভালো ছবি নির্মাণের পূর্বশর্তস্বরূপ। অন্যদিকে ইনস্টিটিউট, আর্কাইভস, প্রশিক্ষণের সুবাতাস বইয়ে দিলেই যেমন বিশ্বমানের সৃষ্টিশীল ছবির বন্যা বয়ে যাবে না, তেমনি শহরে হঠাৎ করে ফাস্টফুড শপের মতো শত শত মিনি থিয়েটার গজিয়ে উঠলেই আগামীকাল থেকে হুড় হুড় করে ভালো ছবি নির্মাণ শুরু হয়ে যাবে না। কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য চলচ্চিত্র সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে আনা প্রয়োজন। এ নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় হলো, 'চলচ্চিত্র পরিবেশনা ও প্রদর্শনের সংকট এবং সমাধান'। প্রথমে বিদ্যমান পরিস্থিতির দিকে তাকানো যাক। বাণিজ্যিক হলগুলো বোধগম্য কারণেই স্বল্পদৈর্ঘ্য ও বিকল্প ধারার ছবি প্রদর্শনে আগ্রহী নয়। এ ছাড়া বিকল্প ধারার ছবিগুলো প্রধানত ১৬ মিলিমিটার ফরম্যাটে তৈরি বলে সিনেমা হলের জন্য উপযোগীও নয়। এই ধারার ছবিগুলো প্রদর্শনের জন্য বলতে গেলে একমাত্র পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনটি ব্যবহৃত হয়। ফিল্ম থিয়েটারের প্রধান পূর্বশর্ত হলো প্রজেকশন-সুবিধার ব্যবস্থা থাকা। মজার ব্যাপার হলো, লাইব্রেরি মিলনায়তনে এসবের কিছুই নেই। ফলে নির্মাতাদের বাইরে থেকে প্রজেক্টর, প্রজেকশনিস্ট ও সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া করে আনতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদেরকেই চালাতে হয় প্রজেক্টর। তবু লাইব্রেরি চত্বরের বাইরে, বাকি

দেশের কথা থাকুক, অবশিষ্ট শহরেই লাইব্রেরি মিলনায়তনের এই আধটুকু সুবিধাও নেই। তাই এই বিশাল মরুপ্রান্তরে মিলনায়তনটি মরূদ্যান বিশেষ। তবে মনে রাখা দরকার, প্রদর্শনের জন্য কেবল মিলনায়তনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনব্যবস্থা। ধারদেনা করে একজন বিকল্প নির্মাতা যখন তাঁর ছবি শেষ করে নিয়ে আসেন, তখন তা ডিস্ট্রিবিউট করার মতো প্রাণশক্তি আর তাঁর অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। যাঁদের প্রাণশক্তি কিছুটা বেশি, তাঁদের জন্য শুরু হয় আরেক যুদ্ধ। ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য অর্থ সংগ্রহ, প্রবেশপত্র ছাপানো থেকে শুরু করে হল প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া করা, প্রজেক্টর চালানো ইত্যাদি ইত্যাদি। তথাকথিত বাণিজ্যিক কাঠামোর মধ্যে যাঁরা সুস্থ ধারার ছবি করতে উদ্যোগী হন বা উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য হন (অনুদান), তাঁদের অবস্থাও যে ভালো, তা নয়। ছবির প্রযোজক ব্যক্তি হোক বা সরকার, পরিবেশক ও প্রদর্শক খুঁজে পাওয়ার দায় ও দায়িত্ব নির্মাতার। ভালো ছবি হলের মালিকেরা চালাতে নারাজ। বিশেষ ক্ষেত্রে চালালেও সপ্তাহ না যেতেই নামিয়ে ফেলা হয়। সরকার তার দায়িত্ব অনুদানের মধ্যে সীমিত রাখার ফলে অনুদান পাওয়া ছবিগুলো এমনকি সরকারনিয়ন্ত্রিত হলগুলোতেও চালানো সম্ভব হয় না।

যা-ই হোক, এবার সমস্যাগুলো সমাধানে কী ধরনের চেষ্টা নেওয়া যেতে পারে, তা তলিয়ে দেখি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রতিকূল সময়ে জ্বালিয়ে রেখেছিল স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। তাই এই আন্দোলনটির প্রতি বর্তমান সরকারের একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে। কিছু তরুণ চলচ্চিত্রনির্মাতা ও কর্মী জড়ো হয়ে গড়ে তুলেছিল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের এই বিকল্প ব্যবস্থা। এই আন্দোলনকে আজ জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার দায়িত্ব সবার। পাবলিক লাইব্রেরিসহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় কিছু কমিউনিটি মিলনায়তনকে সংস্কার ও পরিবর্ধন করে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও বিকল্প ধারার ছবি প্রদর্শনের জন্য স্বল্প মূল্যে বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। ঢাকার বাইরে কমিউনিটি ও টাউন হলগুলোয় ১৬ মিলিমিটার ভিডিও প্রজেক্টর সংস্থাপন করে সেগুলোকে ন্যূনতম ফির মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে। দেশব্যাপী স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের এই নেটওয়ার্কের প্রাথমিক অবকাঠামোটি ইতিমধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সরকারের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরকে আরও যুগোপযোগী হতে হবে।

প্রদর্শনব্যবস্থার প্রধান সমস্যা টিকিটের ওপর মাত্রাতিরিক্ত সরকারি কর। কোনো দেশেই এ রকম উচ্চ করের উদাহরণ নেই। আজ সিনেমা হলগুলোর

যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে হবে, করের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। তবে করের সমান্তরালে মুদ্রাস্ফীতি ও বাইরের দুনিয়ার টিকিটের দামের কথা মনে রেখে টিকিটের দাম বাড়াতে হবে। সরকারনিয়ন্ত্রিত হলগুলোর সংস্কার সাধন ও পরিবেশ ফিরিয়ে এনে শিল্পসম্মত ছবি প্রদর্শনের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসব প্রেক্ষাগৃহে বিশেষ বিশেষ ছবির ক্ষেত্রে, যেমন শিশু চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ করমুক্ত ঘোষণা করা প্রয়োজন। তবে বিচ্ছিন্নভাবে প্রদর্শনব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন আনলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সামগ্রিক চলচ্চিত্র অবস্থার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। চলচ্চিত্রবিষয়ক সরকারি সব কার্যক্রমকে একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালনা করা প্রয়োজন। সরকার যে চলচ্চিত্রমাধ্যমকে সাবসিডাইস করছে না, তা নয়। এফডিসির ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি তার উদাহরণ। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে এই ভর্তুকির সুবিধা ভোগ করছে কুরুচিপূর্ণ শত শত তথাকথিত ছবি, যেগুলো প্রডাকশন হিসেবেও লাভজনক প্রমাণ করতে ব্যর্থ। পৃথিবীর যেকোনো দেশে সরকারি অর্থানুকূল্য থাকে মানসম্পন্ন ছবির জন্য এবং তা সুষ্ঠু অনুদানের সীমিত কার্যক্রমের গতির মধ্যে নয়। বহু দেশের উদাহরণ এ ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে। কোনো দেশেই এ রকম ঢালাওভাবে সাবসিডি দেওয়া হয় না। প্রতিবেশী দেশ ভারত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে কুরুচিপূর্ণ বাণিজ্যসর্বস্ব ছবি নির্মিত হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু সেখানে সরকার এফডিসি তৈরি করে ছবির মান-নির্বিশেষে সাবসিডি দিচ্ছে না বা গচ্চা দিচ্ছে না, বরং এনএফডিসি তৈরি করে শিল্পসম্মত ছবি প্রযোজনার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে অনুদান না দিয়ে নিয়মিতভাবে ভালো ছবির নির্মাণই শুধু নয়, তা বিপণন ও পরিবেশনার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। আমি এই নিবন্ধে 'চলচ্চিত্র উন্নয়নের' এই দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মডেল এফডিসি ও এনএফডিসির তুলনামূলক আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। এনএফডিসি কেবল স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউশনেই এগিয়ে আসে না, তাদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত ছবিগুলোর সাবটাইটেল করা থেকে শুরু করে ভালো ছবির ভিডিও ডিস্ট্রিবিউশনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমি সুষ্ঠু জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রস্তাবিত জাতীয় চলচ্চিত্রকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চলচ্চিত্রের সত্যিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান করছি। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সরকার চলচ্চিত্র ব্যবসাকে

নিয়ন্ত্রণ বা প্রটেকশন না দিয়ে বরং পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রযোজনার ক্ষেত্রেও যেমন বেসরকারি উদ্যোগ কাম্য, তেমনি প্রদর্শন ও পরিবেশনার ক্ষেত্রেও বেসরকারি আগ্রহ প্রয়োজন। দেশি-বিদেশি রুচিশীল ছবির দর্শক এ দেশে আছে, তার প্রমাণ বহু রয়েছে। সম্প্রতি কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবের ব্যাপক দর্শানুকূল্য তার একটি প্রমাণ। কুরুচিপূর্ণ ছবি ও পরিবেশের কারণে বাণিজ্যিক সিনেমা হলকে আজ প্রায় বহু বছর হলো মধ্যবিত্ত দর্শক ত্যাগ করেছে। তাদের বড় পর্দার কাছে ফিরিয়ে আনতে যুগোপযোগী ফিল্ম থিয়েটার সৃষ্টির উদ্যোগ প্রয়োজন। বিদেশে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত দর্শকদের জন্য মিনি থিয়েটার গড়ে উঠেছে সম্প্রতি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি ২০০ থেকে ৩০০ সিটের একটি মিনি থিয়েটারও শুরু করেন, তা হলে দেখতে পারেন এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১০০টি মিনি থিয়েটার গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মানের দু-একটি ফিল্ম থিয়েটার শহরে গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের একটি মিনি ফিল্ম সেন্টারের স্বপ্ন দেখছে। এ ক্ষেত্রে ফোরাম সবার সহযোগিতা কামনা করে। পরিশেষে বহু আলোচিত জাতীয় চলচ্চিত্রকেন্দ্র-সম্পর্কিত বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের কিছু বক্তব্য ও প্রস্তাব নতুন করে উল্লেখ করছি। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক বলয় স্থাপনের সিদ্ধান্তের জন্য বর্তমান সরকারকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। এতে নাটক, সংগীত, চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের চর্চা ও পরিবেশনাসহ ব্যাপক সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে বলে আমরা জেনেছি। আমাদের ধারণা, রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এটি ঢাকা তথা সারা দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। কিন্তু এ প্রকল্পে অন্যান্য শিল্পমাধমের ঠাঁই হলেও অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় দেশের আরও অনেকের মতোই আমিও বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছি। নির্মল চিত্তবিনোদন ও সামাজিক সংস্কৃতি বোধের বিকাশ সাধন—এ দুটি কারণেই জাতি প্রত্যাশা করে, প্রস্তাবিত সাংস্কৃতিক বলয়ে একটি চলচ্চিত্র কমপ্লেক্স অন্তর্ভূক্ত করা হবে। ভারতের কলকাতার নন্দন, ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফিল্ম সেন্টার ইত্যাদির

মতো এখানে দর্শনীর বিনিময়ে বা কখনো বিনা মূল্যে বছরের অধিকাংশ দিনই দেশি-বিদেশি উন্নত মানের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। এতে কমপ্লেক্সের নিজের উদ্যোগ বা চলচ্চিত্র সংসদ বা বিদেশি দূতাবাসগুলোর উদ্যোগে আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। দর্শনী এবং প্রেক্ষাগৃহ ভাড়ার আয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকেন্দ্রের পরিচালনা ব্যয়ের একটি বৃহৎ অংশ মেটানো যাবে এবং আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর হবে। এর উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে থাকছে :

১. সমাজের অগ্রসর অংশকে, বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকে সিনেমা হলে বসে সিনেমা দেখার সুযোগ করে দেওয়া। অন্ধকার মিলনায়তনে, বিশাল পর্দায়, শতাধিক মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি বসে চলচ্চিত্র উপভোগের যে আসল আনন্দ-অনুভূতি, সেটিকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া।
২. দেশে এ পর্যন্ত যেসব উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, যা বর্তমানে বাণিজ্যিক সিনেমা হলে দেখার সুযোগ নেই, সেগুলো নতুন করে দর্শকের সামনে নিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩. একসময় ঢাকার সিনেমা হলে উন্নত মানের বিদেশি ছবি দেখানো হতো। এতে করে বিশ্বের চলচ্চিত্র সংস্কৃতিতে এ দেশের মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হতো এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য বিশ্ব চলচ্চিত্রের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হতো।
৪. কেন্দ্রের নিয়মিত বার্ষিক কর্মসূচির মধ্যে থাকবে অন্তত একটি আন্তর্জাতিক উৎসবের আয়োজন করা। এতে শুধু সাম্প্রতিকতম চলচ্চিত্রগুলোর সঙ্গেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রামোদীদের পরিচয় ঘটবে না, উপরন্তু বিশ্ব চলচ্চিত্র সংস্কৃতির অঙ্গনে 'ঢাকা চলচ্চিত্র উৎস' একটি নিয়মিত ও মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম ৯ বছর ধরে দ্বি-বার্ষিক আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে আসছে। সর্বশেষ উৎসব উদ্বোধন করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমাদের প্রত্যাশা, সরকার অবিলম্বে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির আন্তর্জাতিক উৎসবের উদ্যোগ গ্রহণ করুক।

প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র কমপ্লেক্সে যা যা থাকবে

১ নম্বর প্রেক্ষাগৃহ : এর আসনসংখ্যা হবে ৭০০ থেকে ১০০০। এতে প্রধান প্রধান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো নতুন ছবির উদ্বোধন, চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, কোনো চলচ্চিত্রকারের সংবর্ধনা, সর্বোপরি

জনসাধারণের জন্য নিয়মিত দর্শনীর বিনিময়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হবে। এতে ৩৫ মিলিমিটার ও ১৬ মিলিমিটার প্রদর্শনের সুবিধাদি থাকবে।

২ নম্বর প্রেক্ষাগৃহ : অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের প্রেক্ষাগৃহ, যার আসনসংখ্যা হবে ২০০ থেকে ৩০০-র মধ্যে। এতে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি, প্রামাণ্যচিত্র, চলচ্চিত্র সংসদের আয়োজিত প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন করা যাবে। এতে ৩৫ মিলিমিটার, ১৬ মিলিমিটার এবং ভিডিও প্রজেকশনের ব্যবস্থা থাকবে।

সেমিনার রুম : এতে চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত সেমিনার, প্রদর্শনী, আলোচনা অনুষ্ঠান, কর্মশালা ও চলচ্চিত্রের প্রশিক্ষণমূলক কোর্সের মতো কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে।

বিক্রয়কেন্দ্র : এতে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চলচ্চিত্রের ভিডিও কপি, পোস্টার, স্যুভেনির, টি-শার্ট বা চলচ্চিত্রবিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যাবে।

ক্যাফেটেরিয়া : এখানে হালকা খাবার বিক্রি হবে এবং তা চলচ্চিত্রামোদী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতবিনিময় চর্চা ও দেখা-সাক্ষাতের কেন্দ্র হয়ে উঠবে। পরিশেষে নিবন্ধের গোড়ায় যে কথা বলেছিলাম তার পুনরুল্লেখ করছি। বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে দিনে দিনে জমে ওঠা চলচ্চিত্র সংস্কৃতির সংকট সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা। সর্বোপরি জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন।

২০০০, *মুক্তকণ্ঠ*

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র : ব্যতিক্রম ও বিতর্ক

যুদ্ধ মানেই পক্ষ-বিপক্ষ। মুক্তিযুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। শুধু মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, এ কথা যেমন ঠিক নয়, তেমনি আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছি, এটাও ঠিক নয়। নিজেদের সঙ্গে আমাদের নিজেদের একটা যুদ্ধও ছিল। যুদ্ধটা আমরা করতে চাইনি। পাঞ্জাবি ঔপনিবেশিক শক্তি তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। আমাদের একটি অংশ তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ বিতর্কিত বিষয় নয়। তাতে মুক্তিযুদ্ধের মহিমা লাঘব হয়েছে, এমন নয়। আর সে কারণেই যুদ্ধের যেমন ভিন্ন ভিন্ন ন্যারেটিভ বা আখ্যান-উপাখ্যান থাকবে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বয়ান থাকবে। যারা বিপক্ষে ছিল বা পরে পক্ষ বদল করেছে, তাদের আখ্যান ছিল এবং আছে। এই বয়ান সৃষ্টিতে চলচ্চিত্র বড় ভূমিকা রেখেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, ১৯৭১ সালে বাস্তবে কী ঘটেছে, তার চেয়ে এ-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ অনেক গুরুত্ব বহন করে। এই দৃষ্টিকোণ তৈরি হয় আসলে এই আখ্যানগুলো দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান আখ্যান যতটা না স্মৃতিকথাভিত্তিক, যতটা না লিখিত ভাষ্যে এসেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি এসেছে জনপ্রিয় মাধ্যম সিনেমার দ্বারা। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যে উপাখ্যানটি তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে ভাবাবেগে বেশি এসেছে, এসেছে একরৈখিকতা—সেটাই স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা, দ্যোতনার দিকটা, এর ধূসর ভূমির অংশটি, মুক্তির দিকটি না এসে যুদ্ধের দিকটি এসেছে। আমরা সামরিকভাবে পাঞ্জাবিদের চেয়ে শ্রেয়তর ছিলাম বলেই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি—এ রকম আত্মশ্লাঘার ব্যাপারটি বেশি এসেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বড় দিকটি শ্লাঘার নয়, গণহত্যার। সেই ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির দিকটা আসেনি। সংকীর্ণ

অর্থে এসেছে। গুলি করে মারা হয়েছে, ধর্ষণ করা হয়েছে ইত্যাদি। আমাদের অনেকের হাতেই রক্ত আছে। যুদ্ধাপরাধের বিষয় নানাভাবে আসতে পারত, কিন্তু আসেনি। যুদ্ধ মানেই যুদ্ধাপরাধ। নিরস্ত্র নিরীহ জনগণের ওপর যখন কোনো সামরিক শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন যুদ্ধাপরাধের দায়ভার তাদের ওপরই বর্তায়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করিনি, আমরা প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি। প্রতিরোধের সঙ্গে অনেক সময় প্রতিহিংসা জড়িয়ে যায়, ওরা যদি ৯৫ শতাংশ যুদ্ধাপরাধ করে থাকে, আমরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কিছু ভুল করে থাকতেই পারি। এটিকে অস্বীকার করা ইতিহাসের অপলাপ। স্বাধীনতার ৪০ বছরে পৌঁছে আমাদের এই সত্যকে স্বীকার করার সৎ সাহস থাকা উচিত। আমাদের চলচ্চিত্র এই দিকটি পুরোপুরি এড়িয়ে গেছে। স্থানীয় দোসরদের যুদ্ধাপরাধের ব্যাপারটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের গণহত্যার প্রধান শিকার ছিল একটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠী, সে ব্যাপারটিও আমাদের চলচ্চিত্র আখ্যানে সুস্পষ্টভাবে উঠে আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটা প্রধান অংশ হলো মানুষ মানুষকে মেরেছে। কিন্তু এটাও পরম সত্য, একাত্তরে মানুষ মানুষকে বাঁচিয়েছে। একজন বিহারিকে বাঙালি বাঁচিয়েছে, একজন বাঙালিকে একজন বিহারি বাঁচিয়েছে। একজন বাঙালি একজন নিরস্ত্র বন্দী পাকিস্তানি সেনাকে বাঁচিয়েছে। একজন পাকিস্তানি একজন বাঙালিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই বহুমাত্রিক দিকটি কিন্তু সাধারণত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে প্রথম পর্যায়ে খুব একটা দেখি না। কিন্তু তার পরও এই অনালোকিত, অনালোচিত দিকটি মুক্তিযুদ্ধের দু-একটি ছবিতে এসেছে। তার একটি বড় দৃষ্টান্ত *ধীরে বহে মেঘনা*। মুক্তিযুদ্ধের একদম প্রান্তিক বিষয়, প্রতিবেশী দেশের সাধারণ মানুষ, সেনাবাহিনী বা বিমানবাহিনীর লোক, যাঁরা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি, অবদান, আত্মত্যাগের গল্প। তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধকে দেখা, এই ছবিতে এসেছে। একজন ভারতীয় পাইলট, যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখতে গিয়ে নিহত হয়েছেন, তাঁর বাগদত্তা স্ত্রী বাংলাদেশে এসেছেন। বাংলাদেশের প্রেমে পড়ে নয়, এসেছেন দেশটিকে দেখতে, যে দেশটির জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁর বাগদত্তা স্বামীকে তিনি হারালেন। সে দেশটি কেমন? এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের বাকি চিত্রটা ছবিতে উঠে আসে। আমি মনে করি, তখনকার প্রেক্ষাপটেও এটি একটি অত্যন্ত ভিন্ন মাত্রার ছবি। এই অর্থে সৃজনশীলতার মাপকাঠিতে হয়তো তেমন

গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* ছবিটি এই যে গড্ডলিকাপ্রবাহ, তার বাইরে থেকে নতুন মাত্রা এনেছিল। হয়তো ছবিটি সে সময় বিতর্কিত হতে পারত। সৌভাগ্যবশত এটি তখন বিতর্কিত হয়নি। কিন্তু আজ বাংলাদেশে যেমন যেকোনো ছবিই অতি আলোচিত, অতি বিতর্কিত হয়ে ওঠে, হয়তো তখন তেমনটা হতো না। ছবির মূল প্রোটাগনিস্টকে দেখা যায় '৭১ সালে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে তাস পিটিয়ে কালাতিপাত করছে। এখানে পরিচালক শুধু তাঁর নিজের আত্মগ্লানিগ্রস্ত হয়ে নিজের সমালোচনা করেননি। বুদ্ধিবৃত্তিক মধ্যবিত্ত স্ব-শ্রেণীকে কাঠগড়ায়ও দাঁড় করিয়েছেন। 'মুক্তি সংগ্রামী সংস্থা'র শিল্পীদের মতো অনেক শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা যুদ্ধের ফ্রন্টে মেশিনগান নিয়ে যাননি তো বটেই, দেশাত্মবোধক গান নিয়েও যাননি। অনেক চলচ্চিত্রশিল্পীই জহির রায়হান, আলমগীর করিরের মতো ক্যামেরা নিয়ে যুদ্ধের ফ্রন্টে কেন, শরণার্থী শিবিরেও যাননি।

আরেকটি ছবি কিন্তু ওই সময়ই বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ*। মুক্তিযুদ্ধের কোনো ছবি বিতর্কিত হয় শুধু তার বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার জন্যই নয়, ছবিটি নির্মাণের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে নির্মাতার অবস্থান ও উদ্দেশ্যও নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। আমার মনে হয়, *আবার তোরা মানুষ হ* ছবিটির মধ্যে অতি সরলীকরণ করার কিছুটা হলেও সুযোগ ছিল যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সব মুক্তিযোদ্ধা 'পশু' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন তাঁদেরও মানুষ হতে হবে। এর পেছনে একটা অপ্রিয় রূঢ় বাস্তবতাও ছিল। ১৯৭২-৭৩ সালে আসলেই কিছু মুক্তিযোদ্ধা আদর্শচ্যুত হন। তাঁরা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা বটে, তবে এ সময় তাঁরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নয় মাসের অস্ত্রের স্বাদ পাওয়ায় তাঁরা শুধু অস্ত্রের ভাষাতেই কথা বলতে শিখেছিলেন। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, তাঁদের সবাই 'পশু' হয়ে গিয়েছিলেন; তাঁদের ভালোবাসার পাত্রীকেও অস্ত্রের ভাষায় প্রেম নিবেদেন করেছিলেন। যুদ্ধ একটা ভাষা তৈরি করে দেয়, আর সেই ভাষাটি হলো অস্ত্রের ভাষা। এটি আমরা দেখেছি ১৯৭২-৭৩ সালে। ছবিটি সৃজনশীল ছবি হিসেবে না হোক, ওই সময়ের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। ব্যাপারটা আসলে তখনই জটিল হয়ে পড়ে, যখন যিনি নির্মাণ করলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর অবস্থান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল কি না। যখন দেখা যায়, তাঁর অবস্থানটাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বিভিন্নভাবে, মানুষ কিন্তু তখন সে বিষয়ে প্রশ্ন

করে এবং সেই হিসেবে কিন্তু *আবার তোরা মানুষ হ* ছবিটি বিতর্কিত হয়েছিল এবং এর সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

আজকের বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা। মুক্তিযুদ্ধের ছবিতে একাধিক আখ্যান থাকবে এবং পরস্পরবিরোধী বয়ান থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধ মানেই যে ফর্মুলা, যাকে এভাবেই দেখতে হবে, অন্যভাবে বলা বা দেখার কোনো অধিকার কোনো শিল্পীর নেই, এটা ঠিক নয়। আমার মনে হয়, এখন সময় হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে অনেক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার। এটা মনে হয় দর্শকের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, মুক্তিযুদ্ধকে এই ভিন্নভাবে দেখা, যেখানে সব পক্ষকে সমালোচনা করেও ছবি বানানো যেতে পারে। তবে নির্মাতার নিজের উদ্দেশ্য কী? মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নটি থেকেই যায়। ছবির মধ্যে এটি অনেক সময় বোঝা যায়, আবার বোঝা যায় নির্মাতার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও।

চলচ্চিত্রের চোখ : বাংলাদেশকে নতুন করে দেখার জন্য

চলচ্চিত্র সবচেয়ে কম বয়সী শিল্পমাধ্যম। কিন্তু এটা সবচেয়ে বিবর্তিত এবং জটিলও। সব শিল্পমাধ্যমই মূলত জীবনের পুনর্নির্মাণ, কিন্তু চলচ্চিত্রজীবন কিংবা বাস্তবতাকে আরও সরাসরিভাবে পুনরুৎপাদন করে। এটা প্রায় অলীক একটা জীবনই সৃষ্টি করতে পারে। আরেক দিক থেকেও সিনেমা অন্যান্য শিল্প থেকে আলাদা। অনন্যতা ও মৌলিকত্বের ধারণা প্রায় সব শিল্পমাধ্যমেরই মর্মকথা। কিন্তু চলচ্চিত্র স্বভাবগতভাবেই পুনরুৎপাদিত। বৃহৎ দর্শকগোষ্ঠীর জন্য একটি ছায়াছবির অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি করা হয়, যেন নানা জায়গার নানা মানুষ এটা দেখতে পারে। আসলে ছায়াছবি, সামগ্রিকভাবে পুরো দৃশ্য-শ্রুতি মাধ্যমই শিল্পের ধারণাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের জীবনের সবকিছুর ভেতরেই ছায়াছবি ঢুকে পড়তে পারে। কেবল সিনেমা হলেই এটা সীমিত নয়, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমাদের বসার ঘরেও এটা চলে আসে। চলচ্চিত্র সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান।

জীবনকে আক্ষরিকভাবে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা থাকায় জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলোকেও সিনেমা খুব শক্তিশালীভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। ফলত এটা আরও প্রত্যক্ষভাবে সমাজের ওপর নিজের প্রভাব চর্চা করতে পারে। এর কেবল সত্য প্রকাশেরই ক্ষমতা নেই, আছে ঢেকে রাখারও। সিনেমা মানুষকে রূঢ় বাস্তবতা ও সত্যের সামনে যেমন দাঁড় করাতে পারে, তেমনি পারে বাস্তবতার রুক্ষতা থেকে পালিয়ে কল্প-পৃথিবীতে আশ্রয় নেওয়ার রাস্তা দেখাতেও। এ কারণেই সিনেমা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে বিনোদনের প্রধান বাহন হিসেবে, বৃহত্তর বাজারের জন্য পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক শিল্পাগার

হিসেবে। যেহেতু সিনেমায় সমাজ প্রতিফলিত হয়, সিনেমার প্রকৃতি সব সময়ই পরিবর্তনশীল। কিন্তু সমাজের ওপরও সিনেমার একটা প্রভাব আছে। চলচ্চিত্রমাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার গণমাধ্যমের লঘুতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিহীন প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে লড়তে পারে। অন্যদিকে সিনেমায় দেখানো সহিংসতা সমাজে আরও তীব্রতর সহিংসতা উসকে দেওয়ার জন্য হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়। তাই সিনেমার ভালো ও খারাপ—দুই রকম সামাজিক ভূমিকাই আছে। শৈল্পিক কিংবা নান্দনিক উদ্দেশ্যে সিনেমার ভাষা যেমন ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি এর প্রোপাগান্ডামূলক ব্যবহারও রয়েছে। সিনেমা কীভাবে আমাদের নিজস্ব জাতিসত্তার অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটায় এবং কীভাবে সিনেমার দৃষ্টি ব্যবহার করে একটি জাতির বিনির্মাণ সম্ভব—এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। জাতিগত আত্মপরিচয় ও তাৎপর্যের বোধ তৈরিতে চলচ্চিত্র সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ও রাখছে। কিন্তু এ শক্তিকে কতটুকু কাজে লাগানো হয়েছে? জাতি গঠনের উপায় হিসেবে এর কতটুকুই বা সর্বোচ্চ ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে? চলচ্চিত্র জাতীয় স্মৃতির আধার হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। এই স্মৃতি ক্রমান্বয়ে অনাগত প্রজন্মের সামনে মেলে ধরা যেতে পারে। অতীত ও ভবিষ্যৎ, পুরোনো ও নতুনের মধ্যে সিনেমা সেতু গড়ে দিতে পারে। সমাজের উঁচুতলা আর নিচুতলার মধ্যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদ—সিনেমা সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে সেটাও দূর করতে পারে। পারস্পরিক ভাববিনিময় এবং বৃহত্তর বোধোদয়ের ক্ষেত্র হিসেবে সিনেমা কাজ করতে পারে। দেশের অন্তর্গত সৌন্দর্য ও সত্যকে সিনেমা বের করে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে মাধ্যমটিকে আদর্শায়িত করা এবং অতিশায়িত করে এর প্রভাব ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে নস্যাৎ করার ঝুঁকিও থেকে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি জাতীয় পর্যটন খাতের উন্নয়নে খুব সুন্দর একটা ভিউকার্ড বানাতে পারেন, কিন্তু ভিউকার্ডটি যদি সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ না হয়, তাহলে এটি পুরোপুরি এর বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার জন্য এ রকম মোটা মাপের চেষ্টা আমরা যাতে না চালাই, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, এটা ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। বরং সিনেমা আমাদের সমাজের একটি সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে পারে, যার মাধ্যমে জন্ম নিতে পারে সৎ সৌন্দর্য।

একটি জাতির ইতিহাসে প্রকৃত ধারার চলচ্চিত্র কতটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে তার একটি ভালো উদাহরণ হলো *পথের পাঁচালী*। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি রায়বাবুর এই ছবি যখন কান চলচ্চিত্র উৎসবে একটি পুরস্কার

পেল, বলিউডের কিছু বড় তারকা এই বলে ছবিটাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন যে ভারতকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশ হিসেবে উপস্থাপন করে ছবিটা নাম কামাচ্ছে। কী অদূরদর্শীই না ছিলেন তাঁরা! *পথের পাঁচালী* কেবল ১৯৫৫ সালেই ভারতের জন্য সম্মান ও গৌরব বয়ে আনেনি; আধা শতাব্দী পরও এটি ভারতের জন্য স্বীকৃতি বয়ে নিয়ে আসছে এবং দেশটির ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। এটি প্রায় সারা পৃথিবী থেকে রাজস্বও নিয়ে আসছে। কেননা, প্রতি মাসে বিশ্বের কোথাও না কোথাও ছবিটি প্রদর্শিত হয়। কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারটি পাওয়ার পর *পথের পাঁচালী*, এমনকি নিজ শহর কলকাতার সিনেমা হলগুলোয় খুব ভালো চলেনি। তাৎক্ষণিক মুনাফার কথা ধরলে এটাকে বাণিজ্যিকভাবে অসফল ছবিই বলতে হয়। ওই বছরের সব থেকে বাণিজ্যসফল ছবিটি হয়তো সিনেমা হলগুলোয় মাসব্যাপী চলেছিল, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে সেই বাণিজ্যসফল ছবি *পথের পাঁচালী*র মতো আয় করতে পারেনি। বরং *পথের পাঁচালী*-ই বছরের পর বছর দেশের জন্য অর্থ ও সম্মান নিয়ে এসেছে। কখনো কখনো আপাতদৃষ্টিতে অবাণিজ্যিক 'আর্ট ফিল্ম'ও তথাকথিত বাণিজ্যিক ছবির চেয়ে বেশি বাণিজ্য করতে পারে। *পথের পাঁচালী* যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক অনুদানে তৈরি হয়েছিল, এর কপিরাইট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। তাই রাজ্যটির সরকার এই মহান চলচ্চিত্রটি থেকে অর্জিত গৌরবেরই কেবল ভাগীদার হয়নি, এর উপার্জিত অর্থও বছরের পর বছর তাদের কোষাগারেই যাচ্ছে।

২১ শতকে বিশ্বায়ন যখন সব ধরনের আত্মপরিচয় গিলে ফেলার হুমকি দিচ্ছে, বিশ্বের প্রান্তিকতম অঞ্চলগুলোতেও হামলে পড়ছে, জাতির আসল চেহারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা আজ অন্য যেকোনো সময়ের থেকে বেশি জরুরি; জাতির এই অবয়বটি হবে আমাদের একান্ত ভাব-প্রভাবিত, আমাদের নিজ মাটিতে প্রোথিত। বিশ্বায়িত গণমাধ্যমের অতি সরলীকৃত সাদাকালো উপস্থাপনার বিপরীতে এটি আমাদের জটিল ও গভীরতর ছবি আঁকবে। সমস্যা হলো, বিশ্ব গণমাধ্যমের সৃষ্টি সরলীকৃত ভাবমূর্তির প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমরাও যদি নিজেদের সমপরিমাণ সরল সংস্করণ নিয়ে হাজির হই, তাহলে কাজের কাজ কিছু হবে না। মিথ্যা ও ফাঁকিকে সত্য ও খাঁটিত্ব দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু প্রায়ই এমনকি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও লোকে আমাদের নিয়ে কী ভাবছে, তা নিয়েই আমরা বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ি। নিজেদের সম্পর্কে আমরা কী ভাবছি, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আত্মসম্মানের বোধকে নতুন করে উচ্চকিত করতে সিনেমাকে ব্যবহার করা উচিত। যখন মনে হয় যে বাইরে থেকে দেখানো নিজেদের নেতিবাচক চেহারা

আমাদের জর্জরিত করছে, তখন আমরা সম্ভবত এই সত্যটাকে ভুলে যাই যে আমরা নিজেদের দিকে যেভাবে তাকাই, সেটাই আমাদের যন্ত্রণার আসল কারণ। এ সমস্যা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। নিজেদের বোঝাতে হবে যে আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীরও নিজস্ব সৌন্দর্য ও শক্তি রয়েছে। শহুরে মধ্যবিত্তের চিন্তাভাবনার মধ্যেই আসল সমস্যাটা নিহিত। শহুরে মধ্যবিত্তকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে বৃহত্তর প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে আমাদের সুপ্রাচীন লৌকিক সংস্কৃতিতে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে আমাদের ভাবমূর্তি তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করে।

সিনেমা কীভাবে একটা দেশের মোটা দাগের নেতিবাচক ভাবমূর্তিকে বদলে দিতে পারে তার উদাহরণ হতে পারে ইরান। ইরানের সরকার মানোত্তীর্ণ ইরানি ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশনায় সক্রিয় সমর্থন জোগায়। এ ছবিগুলো প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে এবং বিভিন্ন সিনেমা হলে। এসব ছবির মধ্যে অনেকগুলোই ইরানের বিদ্যমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করে। কিন্তু তার পরও ছবিগুলোর নির্মাণে সহায়তা দেওয়া হয়। কেননা, এগুলো দেশটির একটি জটিলতর ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তুলে ধরে। এই ছবিগুলোকে সহায়তা করে ইরানি সরকার উদারপন্থী হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছে। একই সঙ্গে পাশ্চাত্যে ইরানের যে নেতিবাচক ভাবমূর্তি চালু রয়েছে, তাকে মোকাবিলা করার জন্য এ ছবিগুলো হয়ে উঠেছে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ইরানি চলচ্চিত্রকারেরা এই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছেন এবং সারা বিশ্বের সামনে ইরানের মানুষ আর তার সংস্কৃতির ভিন্ন ছবি তুলে ধরতে পেরেছেন।

আমাদের সীমিত সাধ্যে *মুক্তির গান* ও *মাটির ময়না* দিয়ে আমরাও চেষ্টা করেছি তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের আরেকটু ইতিবাচক ছবি ফুটিয়ে তুলতে। আমরা সমাজের সামনে সমাজেরই একটা আয়না মেলে ধরতে চেয়েছি। আমরা বাংলাদেশের মানুষকে তার শক্তির কথা, তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা এবং তার সংস্কৃতির ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছি। একই সঙ্গে এ ছবিগুলো যখন দেশের বাইরে দেখানো হয়েছে, এগুলো আমাদের দেশ সম্পর্কে প্রচলিত গৎবাঁধা ধারণা ভেঙে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধারণা তৈরি করেছে। ২১ শতকে আমাদের দেশের নতুন ছবি আঁকার জন্য শক্তিশালী কিন্তু অবহেলিত এই চলচ্চিত্রমাধ্যম অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন।

রুপালি পর্দায় আশার রুপালি রেখা

প্রাচীন সিনেমা মরে গেছে—সিনেমা দীর্ঘজীবী হোক! আমাদের চলচ্চিত্র-জগৎ নিয়ে আশাবাদী হওয়ার প্রধান ও একমাত্র কারণটি হলো আমাদের সিনেমা-শিল্পের পুরো কাঠামো আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায়। আশা করি, ধ্বংসের ছাই থেকে একটি ফিনিক্সের উত্থান হবে। তথাকথিত 'বাণিজ্যিক ছবি' আর বাণিজ্যিকভাবে সফল নয়। নতুন বোতলে পুরোনো মদ খাইয়ে মানুষকে আর বোকা বানানো যাবে না। এমনকি রিকশাঅলা দর্শকেরাও সিনেমা হলে যাওয়া বন্ধ করেছে। ফলাফল হচ্ছে, এফডিসিতে প্রতিবছর বানানো ৮০টির মতো ছবির প্রায় ৮০ শতাংশ তার মূলধন ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রতিবছর এত ছবি তৈরি হওয়ার একমাত্র কারণ দুর্নীতির মাধ্যমে সিনেমাকে দেওয়া সরকারের অঘোষিত ভর্তুকি। কিন্তু এই অনৈতিক আর্থরাজনৈতিক খুঁটিটি খুব বেশি দিন টিকবে না। এই 'সংরক্ষিত' শিল্পটি যে কেবল ভেতরে ভেতরেই ক্ষয়ে যাচ্ছে তা-ই নয়, একে অনেক বাইরের বিপদও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। একদিকে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের 'আকাশ সংস্কৃতি' ক্রমপ্রসারিত হয়ে সিনেমার বাঁধা দর্শকদের সরিয়ে নিচ্ছে; অন্যদিকে আছে বেসরকারি ও স্বাধীন উদ্যোগে তৈরি সিনেমা, দর্শকেরা যেগুলো সিনেমা হলে গিয়ে দেখতে পছন্দ করছে। তাই সিনেমা-শিল্পের পতন মানেই সবকিছুর শেষ নয়, বরং এটা নতুন আশাবাদের একটা লক্ষণ। চলচ্চিত্রের নতুন করে বেঁচে ওঠার অনেক প্রতিশ্রুতি চোখে পড়ছে।

ছোট পর্দা বড় হচ্ছে

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হলো বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ছবি প্রযোজনার উদ্যোগ। গত বছর কেবল একটি চ্যানেলই প্রায়

এক ডজন ছবি প্রযোজনা করেছে; আরও এক ডজন আসতে যাচ্ছে। বাস্তবিক অর্থে একটি বিকল্প সিনেমা-শিল্প প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। এই প্রক্রিয়ায় বহু পুরোনো প্রজন্মের চলচ্চিত্রকার, যারা হতাশা ও ক্লান্তিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলেন এত দিন, তাঁরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। একই সঙ্গে অনেক তরুণ মানসম্পন্ন নির্মাতা, যাঁরা কেবল টেলিভিশনের জন্য ভিডিও ফরম্যাটের নাটক বানিয়েই তাঁদের চলচ্চিত্র বানানোর পিপাসা মিটিয়ে এসেছেন, তাঁরাও বড় পর্দায় কাজ করার একটা সুযোগ পাচ্ছেন। বাইরের দেশগুলোয় প্রযোজনার ভার নিয়ে ভালো ছবি তৈরিতে সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর গর্বিত ইতিহাস আছে। ১৯৬০-এর দশকে জার্মান টেলিভিশন ভেরনার হেরজগ, ফাসবিন্ডার, ভিম ভেন্ডার্সের মতো চলচ্চিত্রকারদের সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়ে একটি বিশ্বখ্যাত আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু ছবি বানানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বেসরকারি চ্যানেলগুলোর প্রতিশ্রুতিশীল ভূমিকার ব্যাপারে অতি-আশাবাদী হওয়ার আগে কিছু ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। প্রথমত, একটা গল্পকে কেবল সেলুলয়েডে তুলে আনলেই তা সিনেমা হয় না। চলচ্চিত্রকারদের ছবি বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও অর্থ দিতে হবে, না হলে তাঁরা কেবল টিভি ধারাবাহিক অথবা নাটককে বড় পর্দায় রূপান্তর করে ফেলবেন। এর পাশাপাশি প্রযোজনার জন্য ছবি নির্বাচনের বেলায় শক্ত কিছু শর্ত মেনে চলা প্রয়োজন, যেন টেলিভিশন প্রযোজিত ছবিগুলো এফডিসির মেলোড্রামার আরেকটি সংস্করণ হয়ে না দাঁড়ায়।

উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা

একসময়ের প্রথাগত প্রযোজকেরা যখন 'ভালো' সিনেমার জন্য কলকাতার দিকে তাকিয়ে আছেন, আশার কথা হলো নতুন উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বাধীন ছবিতে বিনিয়োগের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। অঞ্জন চৌধুরীর মতো শিল্পোদ্যোক্তা *লালসালু*র মতো মানসম্পন্ন ছবিতে সরাসরি জড়িত হয়েছেন। আরও একধরনের পরোক্ষ বিনিয়োগ আছে, যেমন টেলিভিশনে স্বাধীন ধারার ছবির প্রচারে করপোরেট বিজ্ঞাপন। অবশ্যই উদ্যোক্তারা লাভ চাইবেন এবং আমাদের যত্নশীল হতে হবে যেন এই বাড়তে থাকা আগ্রহ অঙ্কুরে বিনষ্ট না হয়।

নতুন স্পৃহার নতুন প্রজন্ম

ইতিমধ্যে একটি নতুন প্রজন্ম সিনেমা বানাতে আসছে, আশা করা যায় তারা চলচ্চিত্রের অঙ্গনে উজ্জ্বল মেধার দীপ্তি ছড়াবে। প্রযুক্তি তাদের পক্ষে; এক

দশক আগেও ছবি তৈরির উপায়গুলো ছিল ব্যয়বহুল ও দুষ্প্রাপ্য। ছবি বানাতে আগ্রহী তরুণদের সুযোগ ছিল খুব সীমিত। কিন্তু আজ স্বল্প মূল্যের এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল ফরম্যাটের ক্যামেরা এবং ছবি সম্পাদনার জন্য পিসিতে ব্যবহারোপযোগী সস্তা সফটওয়্যার সহজলভ্য হওয়ায় আগ্রহী তরুণদের জন্য ছবি নিয়ে নিরীক্ষা করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। কম্পিউটার-শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম অ্যানালগ উপকরণগুলোর ঝামেলা থেকে মুক্ত, এবং অন্যান্য দেশে যা ঘটছে বাংলাদেশেও তা হচ্ছে—ডিজিটাল ছবি নির্মাণ মূল জায়গাটা দখল করছে।

সিনেমা-কাম-শপিং কমপ্লেক্স

ছবি প্রযোজনায় অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনব্যবস্থার পরিবর্তনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক দশকে সিনেমা-শিল্পের পাশাপাশি সিনেমা হলগুলোর অবক্ষয় ঘটলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আশাব্যঞ্জক পরিবর্তনও ঘটেছে। প্রথমত, স্বাধীন ধারার ছবির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলাফল হিসেবে কিছু পুরোনো ভেন্যু, যেমন 'বলাকা' সিনেমা হল মধ্যবিত্ত দর্শকদের জন্য নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বসুন্ধরায় স্টার সিনেপ্লেক্স উদ্বোধনের মাধ্যমে অন্য দেশগুলোয় খুবই সফল হওয়া শপিং কমপ্লেক্স-কাম-সিনেপ্লেক্সের ধারণা অবশেষে বাংলাদেশেও জায়গা করে নিতে পেরেছে। আশা করা যায়, এটা একটা ধারাবাহিক প্রবণতার শুরু মাত্র। মধ্যবিত্তের সর্বভুক ও বর্ধিষ্ণু চাহিদা মেটানোর জন্য শপিং কমপ্লেক্স তৈরির পাশাপাশি এই দর্শকগোষ্ঠীর বিনোদন ক্ষুধা মেটানোর দিকটাও ভেবে দেখা দরকার।

বর্ধিষ্ণু দর্শক

যদিও রাজধানীর কয়েকটা হলেই এখনো ব্যাপারটা সীমিত, তার পরও দীর্ঘদিনের হল-বিমুখ দর্শকদের বিনোদনের পুরোনো আশ্রয় সিনেমা হলে ফেরার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছু স্বাধীন ধারার ছবির সফলতার পর ছবির পুরোনো পৃষ্ঠপোষক নারী তাঁর পরিবারসমেত অনেক দশকের বিচ্ছেদ কাটিয়ে হলে ফিরছেন। ফলাফল হিসেবে সিনেমা হলগুলো নিজেদের মেরামতে আগ্রহী হয়েছে, যাতে তারা আগ্রহী দর্শকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু কেবল দেশীয় দর্শকই বাড়ছে না, গত কয়েক বছরে বেশ কিছু ছবি বাইরের পৃথিবীতেও ছড়িয়ে পড়েছে, ইউরোপ ও উত্তর

641221
RUCL-Accession No.

আমেরিকার 'আর্ট হাউস' ছবির যথাযোগ্য বাজারেও পা রেখেছে। এই বৃহত্তর সীমানাবিহীন বাজারের কথা মাথায় রেখে প্রযোজকেরা তাঁদের আর্থিক বিনিয়োগের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে আরও আগ্রহী হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ইরানের চলচ্চিত্রের সাফল্য একটি দৃষ্টান্ত।

রাষ্ট্রীয় সহায়তা

এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় যে আমি যে কয়েকটি আশা জাগানো লক্ষণ তুলে ধরলাম, তার একটিও সরকারের তরফের নয়। অনেক দেশেই চলচ্চিত্রকারেরা উৎসাহ ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারের হস্তক্ষেপ কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা সব সময়ই যেন মৃত্যুর চুম্বনের মতো। এফডিসি ও জাতীয় আর্কাইভস তার বড় উদাহরণ। যখনই কোনো সরকার সিনেমাকে উৎসাহিত করতে কিংবা সিনেমা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়তে সক্রিয় হয়েছে, তখনই দুর্যোগ নেমে এসেছে। যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তারা যত্নশীল হতে গেছে, তাদের আগ্রহ সেই প্রতিষ্ঠানের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরানি, ফরাসি কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয় ভর্তুকিপ্রাপ্ত ছবির সফলতার উদাহরণ দিয়ে বাংলাদেশের ব্যাপারটা মাপা যাবে না। এটা বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের অদক্ষতা আর অযোগ্যতা থেকে তৈরি একটি সমস্যা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সরকার সিনেমা থেকে যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল। গত কয়েক বছরে চলচ্চিত্র যতটুকু সম্মান ও গৌরব দেশের জন্য বয়ে এনেছে, পুরোটাই রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের তৈরি প্রতিকূলতা আর বাধা ডিঙিয়ে। আপাত বিরোধী হলেও এই প্রতিকূলতাই হয়তো চলচ্চিত্রকারদের সাফল্যের জন্য আরও বেশি প্রেরণা জুগিয়েছে এবং স্থির সংকল্প করেছে।